

আহমদ ছফা

উপন্যাস

উত্তর খণ্ড

আহমদ ছফা

সংগ্রহ ও সম্পাদনা

নূরুল আনোয়ার

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 978-984-408-008-9

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১

কে এম ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
সমিতা প্রেস ২৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

'উত্তরখণ্ড' প্রকাশ আমার ব্যর্থতারই নামান্তর। দুই হাজার আট সালে 'আমহমদ ছফা রচনাবলি' আট খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল। তখন ধরে নিয়েছিলাম আহমদ ছফা রচনাবলি সীমানা আমরা এঁকে দিতে পেরেছি। এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ওই সময় আমি 'আহমদ ছফা রচনাবলি' সম্পাদনা করতে গিয়ে আমার পরিশ্রমকে আমি একটুও খাটো করে দেখিনি। আমি একটানা এক বছরের অধিক সময় নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে এই রচনাবলি প্রকাশের পেছনে ব্যয় করেছিলাম। আহমদ ছফার রচনা লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলো আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। যেখানে তাঁর রচনা আছে সন্ধান পেয়েছি ছুটে গিয়েছি। খাঁটুনিটা এত বেশি করেছি যে, ওই সময় আট খণ্ডের বাইরের আর কোন রচনা পাওয়া যাবে সেটা একবারের জন্যও আমার মাথায় আসেনি। আহমদ ছফা রচনাবলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পেরেছি এ মর্মে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছিলাম। পরে পরে টের পেতে থাকলাম সন্তুষ্টি লাভ করার মত কাজ অল্পই করেছি। লক্ষ করতে থাকলাম আহমদ ছফার লেখা আরো নানা জায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ সমস্ত লেখা একত্রিত করার মানসে শেষাবধি আমাকে 'আহমদ ছফা রচনাবলি উত্তরখণ্ড' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

'উত্তরখণ্ড' থেকে পাঠক আহমদ ছফা সম্পর্কে একটা অন্যরকম ধারণা লাভ করবেন। আহমদ ছফার লেখকজীবনের প্রথম এবং শেষের দিককার লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা অপূর্ব সুযোগ এই খণ্ডে পাওয়া যাবে। তাঁর মাঝামাঝি সময়ের কোন রচনা এ খণ্ডে তেমন একটা নেই বললেই চলে। আমরা কমবেশি জানি, আহমদ ছফার প্রথম লেখা প্রকাশ পেয়েছিল অধ্যাপক শাহেদ আলী সম্পাদিত 'সবুজপাতা' পত্রিকায়। লেখাটি ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা একটি ছোটগল্প। নাম 'অপূর্ব বিচার'। গল্পটি 'সবুজপাতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী নিজের নামে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বইটি তিনিই সম্পাদনা করেছিলেন। নিজের লেখা অন্যের নামে ছাপা দেখে আহমদ ছফা ক্ষিপ্ত হয়ে তার নামে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছিলেন এবং তিন হাজার টাকা রয়্যালিটিও তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। আমি আমার 'ছফামৃত' বইয়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। বাংলা একাডেমী লাইব্রেরিতে 'সবুজপাতা' পত্রিকার ভল্যুমটি পাওয়া গেছে। ওখান থেকে 'অপূর্ব বিচার' ছাড়াও 'প্রতিবেশী' এবং 'মহান প্রতিশোধ' নামে আরো দুটি গল্প উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম।

মূলত 'সংবাদ' পত্রিকায় আহমদ ছফা লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স বড়জোর বাইশ-তেইশ। সাধারণত এ বয়সের লেখা দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আহমদ ছফার 'সংবাদে'র ওসব লেখা পড়লে ওরকম কিছু মনে হয় না। তাঁর লেখার মধ্যে কাঁচা এবং পরিণত বয়সের ভেদ নির্ণয় করা একরকম কঠিন। 'সংবাদে' প্রথমে তিনি কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তারপর প্রবন্ধ। 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসের দুয়েকটি কিস্তি ওই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সময়টা ছিল উনিশ শ' পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সাল। 'কর্ণফুলীর ধারে' নামের ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি পাঠকদের নজরে এসেছিলেন। 'সংবাদে কিভাবে লেখা শুরু করেছিলেন তারও অনেক ইতিহাস আছে। আমি 'ছফামৃত' গ্রন্থে ওসব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'সংবাদে'র লেখাগুলো উদ্ধার করতে পারব এ আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। যেসব জায়গায় 'সংবাদ' থাকার কথা আমি সব জায়গায় বিচরণ করেছিলাম। কোথাও কেউ আমাকে হদিস দিতে পারেননি। সকলের একটা কথা, একাত্তরে 'সংবাদ' পত্রিকা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কি মনে করে বলতে পারব না, আমি বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরি ঘাঁটাঘাঁটিতে লেগে যাই এবং একসময় পত্রিকাগুলো খুঁজে পেতে সক্ষম হই। তখন আমার মনে হয়েছিল আমি অসম্ভব কিছু আবিষ্কার করেছি, যেটা কোনকালে সম্ভব হত না। 'কর্ণফুলীর ধারে', 'অচলায়তন', 'সংগ্রাম কি এবং কেন', 'গণসাহিত্য প্রসঙ্গে' এই চারটি প্রবন্ধ ছাড়া 'রক্তের স্মারকলিপি' ও 'বেতারে খবর ঝরে' শিরোনামের দু'টি কবিতা 'সংবাদ' থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, এসব লেখার বাইরে 'সংবাদে' তিনি আর অন্যকোন লেখা লিখেননি।

'সংবাদে'র লেখাগুলো উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথমে ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু তার থেকে পাঠোদ্ধার করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। লেখাগুলো পুনরায় হাতে লিখে কপি করার কথা আমাদের ভাবতে হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে সদ্য এম এ পাশ করা ছাত্র মানিক মিয়া এ কষ্টসাধ্য কাজটি করে দিয়েছিলেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। অস্বীকার করব না, লেখাগুলো তাঁর কষ্টেরই নিদর্শন।

'ঢাকায় যা দেখেছি যা শুনেছি' লেখাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান আবুল মনছুর উদ্ধার করে দিয়েছেন, নইলে এ লেখাটি আমাদের অগোচরে থেকে যেত। 'পাকিস্তানের শিক্ষানীতি' প্রবন্ধটি মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধসংকলন 'রক্তাক্ত বাংলা' বইয়ে ছাপা হয়েছিল। লেখাটিও সম্প্রতি নজরে এসেছে। 'দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক', 'দস্তয়েভ্‌স্কি' এবং 'একটি প্রাতিস্বিক গ্রন্থ' শিরোনামের এই লেখাগুলো এক সময় 'বাঙালি মুসলমানের মন' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে লেখক নিজে ওই গ্রন্থ থেকে রচনাগুলো ছেটে দেন। 'বাঙালি মুসলমানের মন'-এর পুরনো সংস্করণ আমার হাতে ছিল না বলে এই লেখাগুলো 'আহমদ ছফা রচনাবলি'র কোন খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শেষাবধি লেখাগুলো 'উত্তরখণ্ডে' জায়গা করে নিল।

'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ', 'মূলত মানুষ', 'গোতে এবং রবীন্দ্রনাথ', 'গ্যোতে : প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রেক্ষিতে', 'গ্যোতে : জনৈক বাঙালির দৃষ্টিতে' এবং 'টি. ই. লরেন্স- বীরত্বের ওপর পর্যালোচনা' শিরোনামের ছয়টি রচনা 'আহমদ ছফার প্রবন্ধ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেটি স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশ করেছিল। আমার অসাবধানতার কারণে লেখাগুলো আগে 'আহমদ ছফা রচনাবলি'তে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। 'এনজিও প্রসঙ্গে কিছু কথা', বিচারপতি হাবিবুর রহমানের আসল কাজ এবং কিছু প্রসাঙ্গিক বক্তব্য', ফারাক্কা এবং কল্পনা চাকমা প্রসঙ্গে', 'গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা', 'গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব কে নিতে যাচ্ছে', 'তলোয়ার যুদ্ধে হাসিনা-খালেদা যে পারে বিজয়ী হোক', 'বইমেলাটিকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র বানালেন কেউ করলেন খুন' লেখাগুলোসহ 'ভোটের সময় এলে শহরবাসীর কৃষকের কথা মনে পড়ে' সাক্ষাৎকারটি 'বাংলাবাজার পত্রিকা' থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকর্তা জনাব ইলিয়াস মিয়ার সহায়তা না পেলে এ লেখাগুলো উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব ছিল। তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 'একদিন আহমদ ছফার বাসায় আমরা' নামের সাক্ষাৎকারটি কবি ব্রাত্য রাইসুর সুবাদে পেয়েছি। তাঁকে অভিনন্দন।

অন্য লেখাগুলোও আমি কোন না কোনভাবে সংগ্রহ করেছি। ফিরিস্তি দিয়ে এ লেখাটি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সান্নিধ্য এবং ড. সলিমুল্লাহ খানের উৎসাহ না পেলে হয়ত 'আহমদ ছফা রচনাবলি উত্তরখণ্ড' এত অল্পসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার কে. এম. ফিরোজ খানকে, যিনি এ বই প্রকাশে আমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থেকে কাজ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই মিজানুর রহমানকে, অনেক দুর্বোধ্য লেখার পাঠোদ্ধারের জন্য।

আমার দোষ না ঘেঁটে আহমদ ছফার অন্যান্য প্রকাশনার মত এটিও যদি সকলে সদয়চিত্তে গ্রহণ করেন আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

নূরুল আনোয়ার
পিপিআরসি কার্যালয়
ধানমণ্ডি, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

সূচিপত্র

গল্প

অপূর্ব বিচার

সে বহু বহু জমানা আগের কথা। বাদশাহ এবং পয়গম্বর হযরত দাউদ (আ.)-এর জমানা। বাদশাহ্‌র প্রাসাদে বেশুমার লোক কাজ করে। বাদশাহ্‌র প্রাসাদে কাজ তো থাকেই। এক সাঁঝে শাহিমহলে নওকরের দল সারি বেঁধে বসে আছে। সারাদিন তারা কাজ করেছে। এখন তাদের খাওয়ার সময়। সকলে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে খানার জন্য। শাহি খেদমতগার এসে একেকজনের পাতে একেকটা সিদ্ধ আণ্ডা পরিবেশন করে গেল। নওকরদের একজনের নাম রায়হান। সকালবেলা সে পেটের অসুখের জন্য কিছুই খেতে পারেনি। এখন পেটের নাড়িভুঁড়ি ভুখে চোঁ চোঁ করছে। আণ্ডাটা হাতে নিয়ে সে টপ করে খেয়ে ফেলল। লোকগুলো হাঁ করে চেয়ে রইল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল— রায়হান ভারি পেটুক।

অবশেষে একসময় রুটি এল। সকলে আণ্ডা দিয়ে রুটি খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু রায়হান পড়ে গেল ভয়ানক শরমে। সে এদিক-ওদিক তাকায় কেবল। হঠাৎ পাশের লোকটির দিকে তার নজর গেল। সে তার আণ্ডাটা এখনো খায়নি। সত্যিই সিদ্ধ ডিমটা তার পাতে এখনো পড়ে আছে। তার জিভ বেয়ে পানি এল। লোকটিকে সে বলল—

: ভাই, আপনার আণ্ডাটা বেচবেন?

: হ্যাঁ, আমার আণ্ডাটা বেচব।

: তবে আমাকে দেন না ভাই আণ্ডাটা। ন্যায্যমূল্য যা আসে পরে দিয়ে দেব।

: তা দিচ্ছি, তবে একটা শর্ত আছে।

: কি শর্ত ভাই?

: আমি যখন চাইব, তখন আমার আণ্ডার ন্যায্যদাম সুদে-আসলে শোধ করে দিতে হবে।

: তা দেব আর কি, একটা আণ্ডার আর কতই-বা দাম হবে?

হাজের লোকদের উদ্দেশ্যে সে বলল : আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আমার আণ্ডাটা রায়হানের কাছে বিক্রি করছি। বিক্রির শর্ত এই যে, যখন আমি দাবি করব, তখন রায়হান সুদে-আসলে আণ্ডার ন্যায্য দাম পরিশোধ করবে।

হাজের সকলেই সাক্ষী হয়ে রইল।

লোকটি ছিল সুদখোর এবং হাঁড়কেপ্পন।

এরপর তিন বছর চলে গেছে। শাহিমহলে আণ্ডা কেনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল রায়হান। হঠাৎ একদিন সে লোকটা এসে বলল : রায়হান আমার আণ্ডার দামটা?

রায়হান বলল : হ্যাঁ ভাই, আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম বেমালুম। কত দাম আণ্ডার?

লোকটি ভারি গলায় জবাব দিল : আমার আণ্ডার দাম সুদে-আসলে ছয় শ' টাকা। তবে তুমি একান্ত দোস্ত মানুষ কিনা, তাই তোমাকে সব দিতে হবে না, তোমার কাছে অর্ধেকই চাইছি। সুতরাং তিন শ' টাকা দাও।

রায়হান তাজ্জব বনে গেল, একটা আণ্ডার দাম তিন শ' টাকা?

লোকটি বলল : তবে শোন, সে হিসাব আমি তোমাকে দিচ্ছি। একটা আণ্ডা থেকে একটা বাচ্চা হত। আর সে বাচ্চাটা বড় হলে দশটা আণ্ডা দিত। দশটা আণ্ডা থেকে দশটা বাচ্চা হত, আর সে দশটা বড় হলে এক শ'টা আণ্ডা দিত। এক শ'টা আণ্ডা থেকে এক শ'টা বাচ্চা হত। এমনি করে হিসাব কর— তিন বছরে কত হত! সুদ তোমার কাছে দাবি করছি না, আর আসলও সবটুকু চাই না। কারণ তুমি দোস্ত মানুষ কি না, তাই তিন শ' টাকাই দাও।

লোকটির এ হিসাব শুনে রায়হান বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ পর সে হুশ ফিরে পেয়ে বলল : ভাই, অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই; সুতরাং তুমি বাদশাহ্র দরবারে নালিশ কর।

হযরত দাউদের দরবারে নালিশ দায়ের করল সেই সুদখোর লোকটা। দাউদ (আ.) পেয়াদা পাঠিয়ে রায়হানকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। রায়হান কাঁপতে কাঁপতে দরবারে হাজির হল। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি এ লোকটির টাকা দিচ্ছ না কেন?

রায়হান বলল : সত্যি হুজুর, এই লোকটার কাছ থেকে আমি একটা আণ্ডা কিনেছিলাম— ও বলছে এর দাম তিন শ' টাকা— আমি দিতে পারব না। হুজুর, অত টাকা আমার নেই।

বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন : আণ্ডা কেনার সময় তোমাদের শর্ত কি ছিল?

অভিযোগকারী লোকটি বলল : হুজুর মেহেরবান, এই লোকটি আণ্ডা কেনার সময় কতকগুলো সাক্ষীর সামনে ওয়াদা করেছিল— আমি যখন চাইব তখনি সেও সব দাম সুদে-আসলে চুকিয়ে দেবে। কিন্তু এখন টাকা দিচ্ছে না; তাই হুজুরের দরবারে হকবিচারের আশায় নালিশ করেছি।

বাদশাহ্ পুছলেন : তোমার আণ্ডার দাম তিন শ' টাকা কেমন করে হল? লোকটা রায়হানকে যেভাবে হিসাব দিয়েছিল সেভাবে বাদশাহ্কেও হিসাব দিল। হযরত দাউদ (আ.) অগত্যা কি করেন— লোকটিকে তিন শ' টাকাই ডিক্রি দিলেন। রায়হান কাঁদতে কাঁদতে বাদশাহ্র কাছে আরজ করল : হুজুর, আমাকে ছয় মাসের সময় দিন।

দাউদ (আ.) ছয় মাসের সময় মঞ্জুর করলেন।

রায়হান কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরছিল, রাস্তায় শাহ্‌জাদা সুলায়মান খেলা করছিলেন। রায়হানকে কাঁদতে দেখে শাহ্‌জাদা জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কাঁদছ কেন?

রায়হান বলল : তোমার মত ছোট ছেলেকে সেকথা বলে আমার দুঃখ যাবে না, সুখও আসবে না, বলে লাভ কি?

শাহ্‌জাদা বললেন : হ্যাঁ ভাই, বল না— দুঃখও যেতে পারে, সুখও আসতে পারে।

রায়হান তখন শাহ্‌জাদার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলল। তখন সুলায়মান রায়হানকে বললেন : ও এই কথা! আগামীকাল শাহি ফৌজ তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাবে তুমি এক হাঁড়ি ভাত ভিটে মাটিতে ছড়াতে থাকবে। তারা তোমাকে ভাত ছড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে, গরিব মানুষ ধান কম পড়বে— তাই দুটো ভাত ছড়াচ্ছি। তারা তোমাকে বাতুল মনে করে বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির করবে। বাদশাহ্ ভাত ছড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তুমি আমার কথা বলবে।

রায়হান চলে গেল।

পরদিন বাদশাহি ফৌজ চলছে রাজপথে কুচকাওয়াজ করে। পথের বাঁকে তারা দেখে, একজন লোক ভিটেমাটিতে ভাত ছড়াচ্ছে। লোকটিকে তারা বলল : তুমি ভাত ছড়াচ্ছ কেন?

রায়হান বলল : ভাই গরিব মানুষ, ধান ফুরিয়ে গেছে, তাই দুটো ভাত ছড়াচ্ছি, সকাল সকাল ধান পাব বলে, সেপাইরা তখন লোকটাকে পাগল মনে করে শাহি দরবারে নিয়ে গেল।

বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি জমিনে ভাত ছড়াচ্ছিলে কেন?

রায়হান উত্তর দিলেন : হুজুর, শাহজাদা সুলায়মানই আমাকে এ বুদ্ধি দিয়েছে।

তখন দরবারে সুলায়মানকে তলব করা হল। সুলায়মান দরবারে এলে বাদশাহ্ গোস্‌সা হয়ে বললেন : সকলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলে; আর তুমি কিনা এ লোকটিকে ভাত ছড়াতে বলেছ? এ বুঝি তোমার বুদ্ধির পরিচয়? ভাত থেকে কখনো ধানের চারা গজায়?

শাহ্‌জাদা ধীরে ধীরে বললেন : হুজুর, সিদ্ধ আণ্ডা থেকে যদি বাচ্চা হয় তাহলে ভাত থেকে কেন ধানের চারা গজাবে না?

বাদশাহ্‌র তখন খেয়াল হল, তিনি ভুল করেছেন। রায়হানের দণ্ড মওকুফ করা হল, দরবারে বালক সুলায়মানের বিচারের জন্য ধন্য ধন্য সাড়া পড়ে গেল। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান সকলের মুখে ওই এককথা— অপূর্ব বিচার।

সবুজপাতা, প্রথমবর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৬৩

প্রতিবেশী

শহর বাগদাদ। আব্বাসীয় খলিফার গৌরবের রাজধানী। মধ্যযুগের দুনিয়ার সবচেয়ে খুবসুরুত নগরী, বেশুমার দোকানপাট, বেশুমার মানুষ আয়নার মত তকতকে ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যায় আসে। সাঁঝের বেলোয়ারি লণ্ঠনের রোশনাইয়ে দশদিক আলোকিত হয় বাগদাদ শহরের। সাজান-গোছান শহর বাগদাদ পরির মুল্লুকের মত সুন্দর দেখায়। সারি সারি উট, গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার পিঠে সওদা চাপিয়ে দেশ-বিদেশ হতে সওদাগরেরা ফিরছে শহরের সদর দরজা দিয়ে। দেশ-বিদেশের সুলতান, শাহ্জাদারা খলিফা হারুন-উর-রশিদের শাহি দরবারে খেলাত উপঢৌকন নিয়ে আসে। মসজিদ মুসল্লিতে ভরপুর। মুসল্লিদের লেবাস থেকে ছড়িয়ে পড়া আতর গোলাপের খোশ্বুতে রাস্তাঘাট একেবারে মাত। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে রূপালি ধারায় লাল দরিয়ার পানে তাইগ্রিস নদী।

সে লাল দরিয়ায় ভেসে আরব সপ্তডিঙা মধুকর চলে যাচ্ছে সাগরের ওপারের দেশে।

দৌলতের শহর বাগদাদ। জৌলুসের বাগদাদ। আব্বাসীয় খলিফাদের সুরম্য অট্টালিকা, দরদালান, দশমহলা পাঁচমহলা বালাখানার বাগদাদ। চারদিকে খুশি, চারদিকে আনন্দ, খোদার দুনিয়ার আনন্দের পীঠস্থান এ বাগদাদ নগরী। আরব্যরজনীর খোশগল্পে মাতোয়ারা এ বাগদাদ স্বপ্ন-বাস্তবের অদ্ভুত মিশ্রণ, কিন্তু এ লোকটি আনন্দের জলসা হতে ফারাক কেন? মানুষ খাচ্ছে-দাচ্ছে, আমোদ করছে। কিন্তু ওঁর সেদিকে খেয়াল-খবর নেই। কারণ তিনি জানেন, এ দুনিয়ার জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন নয়, দু'দিন বাদে সবাইকে আবার ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্তায়ালার কাছে। আল্লাহ বান্দাকে তাঁর ইবাদত এবং মানুষের খেদমত করতে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কর্তব্য ভুলে গিয়ে হাসি-খুশিতে সময় কাটিয়ে দিলে পরকালে শরমিন্দা হতে হবে আল্লাহ্র কাছে। তাই ওঁর চোখে নিদ নেই; মুখে আনন্দ নেই। পরম সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য তিনি সারাদিন রোজা রাখেন, সারারাত ইবাদত-বন্দেগি করেন, মানুষের কল্যাণ চিন্তা করেন। দুনিয়াবী কোন জিনিসের প্রতি তাঁর লোভ নেই। খলিফা কতবার ওঁকে উজির বানাতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। তিনি আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাজ করবেন না। পরম সৃষ্টিকর্তার নাম ভুলেন না তিনি। এমনিভাবে সারাজীবন তিনি সাধনা করে আসছেন।

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা জাহেলের কাজ করে নিজের এবং পরের ক্ষতি করে। ওঁরও একজন জাহেল-প্রতিবেশী ছিল। তিনি যখন সালাতে দাঁড়ান তখন জাহেলটি শরাব খেয়ে নানারকম অশ্লীল কথা বলে তাঁকে বিরক্ত করে। তিনি বিরক্ত হন না। মনে মনে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করেন, হে আল্লাহ্ তুমি অবুঝকে বোঝ দাও, অজ্ঞানের হৃদয়ে রোশনাই দাও— যাতে কেউ তোমার রাজত্বে বাস করে তোমার সাথে নাফরমানি না করতে পারে এমন জ্ঞান দাও।

আব্বাসীয় খলিফার প্রতাপে বাঘ-ছাগ এক ঘাটে পানি খায়। ন্যায়বান খলিফার রাজত্বে এমন শরাবখোর বদলোকের ঠাঁই হবে কেন? একদিন সাঁঝের বেলায় নগর কোতোয়াল সেই শরাবখোর লোকটিকে কয়েদ করে নিয়ে গেল। দরবেশ জানতে পারলেন না যে লোকটিকে কয়েদ করে নিয়ে গেছে। সাঁঝের বেলায় পড়শির সাড়া না পেয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করলেন। তাহলে কী লোকটার অসুখ? সকালবেলা খবর নিয়ে জানতে পারলেন, বাদশাহ্‌র লোক তাকে কয়েদ করে নিয়ে গেছে। দরবেশ সোজা দিলেন ছুট বাদশাহর দরবারে।

খলিফার দরবারে উজির-নাজির, পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্করে ভরতি। কাতারে কাতারে লোক আসা-যাওয়া করছে। দারোয়ান তাজিমের সাথে সালাম করে পথ ছেড়ে দিল। দরবারিদের মধ্যে রব উঠল ইমাম আবু হানিফা সাহেব খলিফার দরবারে তশরিফ এনেছেন। খলিফা মস্‌নদ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত দরবারের লোক দাঁড়িয়ে দরবেশকে ইজ্জত করলেন। খলিফা হাত জোড় করে ইমাম সাহেবকে বসতে অনুরোধ করলেন। ইমাম সাহেব বললেন—

"আমি দরবারে বসতে আসিনি। গতকাল সন্ধ্যায় আপনার কোতোয়াল আমার এক পড়শিকে কয়েদ করে এনেছে। আমি তার খালাসের আর্জি নিয়ে আপনার দরবারে এসেছি। আপনি কি মেহেরবানি করে তাকে খালাস দেবেন?"

খলিফা হুকুম দিলেন কয়েদখানার সমস্ত কয়েদিকে খালাস করে দিতে। তখনই হুকুম তামিল করা হল। সে শরাব খেকো লোকটি খালাস পেয়ে দৌড়ে এসে ইমাম সাহেবের পদতলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাফ চাইল। ইমাম সাহেব তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "আমি তোমাকে মাফ করার কে? আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাও। তিনি রহমানুর রহিম, একমাত্র তিনিই তোমাকে মাফ করতে পারেন।" লোকটি ইমাম সাহেবের হাতে হাত রেখে আর কখনো শরাব খাবে না বলে তওবা করল। খলিফা এবং দরবারের সমস্ত লোক লোকটির পরিবর্তনে খুব খুশি। দরবারে নিনাদিত করে শব্দ হল : নারায়ে তক্‌বীর—আল্লাহু-আকবর।

সবুজপাতা, প্রথমবর্ষ, নবম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৬৩

মহান প্রতিশোধ

কনকনে ঠাণ্ডা, আসমানের গা বেয়ে ধারায় যেন ঠাণ্ডা নেমে আসছে। উঃ! বাইরে দোর মেলে তাকানো যায় না। বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যেতে চায়। এ লোকটি অমন ঠাণ্ডায় এ কবরস্থানে কী করছে? লোকটার কি ঠাণ্ডা মালুম হয় না? অবাক কাণ্ড! ঘরে ঘরে সবাই গরম লেপের তলায় ঘুমিয়ে আরাম করছে। আর লোকটি কিনা একা কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে কিসব বলছে, আর অঝোরে তাঁর চোখের পানি ঝরছে। আকাশে অষ্টমীর চাঁদ জ্বলছে, চাঁদের রুপালি রুশনিতে এক এক ফোঁটা চোখের পানি মুক্তাবিন্দুর মত দাঁড়ি বেয়ে ঝরছে। আহা, মায়া হয়! লোকটা অমন করে কাঁদছে কেন? তার মনে কিসের দুঃখ? ভাত না জুটলে মানুষকে ভাতের কথা বলবে। কাপড় না থাকলে সেও মানুষকে বলবে। তবেই তো ভাত-কাপড়ের জ্বালা ঘুচবে। অথচ কবরস্থানে মরা মানুষের কাছে কী বলছে ও? আর মরলে তো মানুষ মাটির সাথে মিশে যায়। সুতরাং কবরস্থানে মরা মানুষের দেশে কনকনে শীতের রাত্তিরে যে মানুষ কাঁদাকাটি করে সে নিশ্চয়ই পাগল।

না, মরলে মানুষের সব ফুরিয়ে যায় না, পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করেছে, মৃত্যুর পর তারা সুখে-শান্তিতে ভালভাবেই থাকে। আর যারা বদ্ কাজ করেছে তাদেরকে বেশি বেশি দুঃখ যন্ত্রণা সইতে হয়।

এ লোকটি কিন্তু ভাত-কাপড়ের ফকির নয়, ঠাণ্ডা-গরম তার মালুম নেই। কবরে যারা দুঃখ-কষ্টে আছে তাদের জন্য হরহামেশা আল্লাহতা'লার দরবারে দু'হাত তুলে ইনি মোনাজাত করেন—"আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্গার বান্দাদেরকে কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দাও! তুমি সব করতে পার, আল্লাহ্! তুমি নিশ্চয়ই দয়ালু ও ক্ষমাশীল।"

লোকটি কে জান? একজন দরবেশ, দরবেশের কাজই তো মানুষের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কাঁদাকাটি করা, আর মানুষকে সৎ-নসিহত দেয়া। মানুষ মানুষের উপর জুলুম করলে মানুষকে পরকালে আজাব ভুগতে হয়। এজন্য দরবেশ নসিহত দিয়ে বেড়ান মানুষের কাছে। দরবেশটি কে জান? তাঁর নাম এ দেশের সকলের কাছে সুপরিচিত, তিনি হচ্ছেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামি।

নিশিরাত। দরবেশের মোনাজাত শেষ হয়েছে। তিনি ঘরে ফিরেছেন একা একা। পথের ধারে একা একা বসে এমন গালাগাল দিচ্ছে কেন এ লোকটা? আবার

মাঝে মাঝে বাঁশিও বাজাচ্ছে। বোধহয় লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। নয়ত এ হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় একা একা গালাগালি করবে কেন? মাথা খারাপ না হলে কি কেউ এমন রক্ত জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় বাঁশি বাজায়? দরবেশ ভাবলেন, দেখি কাছে যাওয়া যাক। যা মনে করেছিলেন তা নয়। লোকটির মুখ দিয়ে ভুরভুর করে শরাবের বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই লোকটা-শরাবের নেশায় চুর হয়ে আছে। শরাব পান করলে ভালমন্দ-বোধ থাকে না। এ ত খুবই খারাপ কাজ। দরবেশ মনে মনে ভাবলেন— দেখি লোকটাকে শরাব খেতে মানা করে দেখি।

: 'আচ্ছা ভাই, তুমি নিশ্চয়ই শরাব পান করেছ, কোরআনে শরাব খাওয়াকে হারাম বলেছে। কারণ ও খেলে মানুষের বোধ থাকে না। সেজন্য শরাবখোরদের ভীষণ ভীষণ অসুখ হয়; মানুষের উপর বেড়ধক জুলুম চালায়। আল্লাহ্ জালিমদেরকে কঠোর আযাব দেন ইহকাল ও পরকালে। সরাবখোরের মারাত্মক রোগ হয়, তাদেরকে সবাই ঘেন্না করে। এ তো এ দুনিয়াতেই; পরকালের শাস্তির খবর একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি শরাব খাওয়া ছেড়ে দাও।

নেশায় চুর লোকটির কিন্তু দরবেশের এ উপদেশ ভাল লাগল না, হাতের বাঁশিটি দিয়ে দরবেশের মাথায় আঘাত করতে শুরু করল। দরবেশ কিছুই বললেন না, নীরবে সয়ে যান শরাবখোরের জুলুম। শেষ পর্যন্ত দরবেশের মাথা ফেটে লোহু বেরিয়ে এল আর বাঁশিটিও ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মাথার লোহু মুছতে মুছতে দরবেশ হযরত বায়েজিদ বোস্তামি ঘরে ফিরে এলেন। আসার সময় আসমানের দিকে দু'হাত জোড় করে মোনাজাত করলেন,

আল্লাহ এ মাতালকে সুমতি দাও।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় খেয়াল হল— তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। একে একে গত রাতের সব ঘটনা তাঁর মনে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তাঁর মালুম হল যে শরাবখোরের বাঁশিটা ভাঙ্গার জন্য তাঁর নিজের মাথাটাই দায়ী। তৎক্ষণাৎ তিনি বাজার থেকে একটি নতুন বাঁশি কিনে আনলেন এবং সে সঙ্গে কিছু মিঠাইও। একখানি চিঠি লিখে লোক মারফৎ পূর্ব রাতের সে শরাবখোরের ঘরে মিঠাই এবং বাঁশিটা পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটা এরকম—

"জনাব, গত রাতে আপনার ভয়ানক গোস্‌সা ছিল, সেজন্য আপনার হুশ ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি, আমার মাথাটাই আপনার বাঁশিটা ভাঙ্গার জন্য দায়ী, সেজন্য নতুন একটি বাঁশি পাঠালাম। আর এ মিঠাইগুলো খেয়ে আপনার গোস্‌সাটাও একটু কমবে। আমি না জেনে আপনার সাথে বেয়াদবি করেছি। সেজন্য আপনার কাছে আমি খুব শরমিন্দা, আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়াত করুন।"

চিঠি পেয়েই শরাবখোর জোড়হাতে হযরত বায়েজিদ বোস্তামির সামনে এসে খাড়া হল। তিনি হাসিমুখে তাকে ঘরে নিয়ে বসালেন। লোকটি গতরাতের সব ঘটনা খুলে বলে দরবেশের কাছে মাফ চাইল। বোস্তামি বললেন—

"ভাই, আমার কাছে নয়, আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাও, যিনি তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমার কোন নালিশ নেই তোমার বিরুদ্ধে।" লোকটি থ' বনে গেল।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামির হাতে হাত রেখে তওবা করল সে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে লোকটির তওবা কবুল করার জন্য মোনাজাত করলেন। লোকটি সেদিন থেকে একজন সৎ মানুষ হয়ে গেল।

তোমার উপর যে জুলুম করে, তাকেও সত্যপথ দেখানোর নাম মহান প্রতিশোধ এবং ইসলামের শিক্ষাই এই।

সবুজপাতা, প্রথমবর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ১৯৬৩

প্রবন্ধ

কর্ণফুলীর ধারে

কর্ণফুলীর আরেক নাম সোনাছড়ি। স্থানীয় লোকেরা বলে কর্ণফুলীর বুকে ফি বছর শুধু পলিমাটির সোনা নয়— বাঁশ, কাঠ, ছন, বেত, তরিতরকারি আরো কত রকমারি সোনা ভেসে ভেসে দূর-দূরান্তের দেশ হতে বিদেশে চলে যায়। বারবার হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে মালের যেমন কদর বাড়ে, তেমনি বাড়ে মুনাফার অঙ্ক। পার্বত্যচট্টগ্রামের সবটুকু ছোট-বড় পাহাড়-পর্বতে ঘেরা। এসব পাহাড়ে মগ-চাকমা এবং অন্যান্য আদিবাসীরা 'জুম' চাষ করে। সমতল ভূমিতে রোপণ করে ধান, সর্ষে, কচু ইত্যাদি। এছাড়া সমগ্র-পার্বত্য অঞ্চল বাঁশ, গাছ, ছন, বেত আরো কত বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

প্রায় এক যুগ হতে চলল সরকারি কর্তৃপক্ষ বনজসম্পদের সদ্ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করা এবং জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য পার্বত্যচট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রঘোনায় কাগজের মিল স্থাপন করেন, যে কাগজের কলকে সরকারি নথিপত্রে এবং স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এশিয়ার বৃহত্তম কাগজের কল বলা হয়ে থাকে। কাগজের কলে বাঁশ পেষাই করে নানারকমের যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যদিয়ে নানারকম কাগজ বানানো হয়। এখন কথা হল এশিয়ার বৃহত্তম পেপার মিলের উদর পূর্তির জন্য যে পদ্ধতিতে বাঁশ আমদানি করা হয় তাই নিয়ে। পদ্ধতিটা রয়ে গিয়েছে অতীতের অন্ধকার গর্ভে। মিলের অন্তত তিরিশ চল্লিশ মাইলের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বাঁশের বন নেই। গভীর পার্বত্য অঞ্চল— পাহাড়ি পথে মিলের থেকে যেসব এলাকার দূরত্ব এক শ' মাইলেরও বেশি, অনেক সময় প্রতিবেশী দেশের বর্ডারের কাছাকাছি সেসব অঞ্চলেই নিবিড় বাঁশের বন। একেকটা বাঁশ ইয়ামোটা— আশি, এক শ' ফুট লম্বা। পাটের বনের চেয়েও বাঁশের বন ঘন। বাঁশের পাতার আড়াল দিয়ে রাতের কুয়াশা মাটিতে পড়ে না, সকাল নয়টা-দশটার আগে ঠিকমত সূর্য দেখা যায় না। পাহাড়িয়া জন্তু, হাতি, ভালুক এমনকি বানরও এসব বাঁশবনে বাস করতে পারে না। চারদিকে শুধু বাঁশ-বাঁশ আর বাঁশ।

মিল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বাঁশের ঠিকাদারেরা কুলি দিয়ে বাঁশ কাটায়। বাঁশ কাটাবার সময় আগাগোড়া দু'দিকে ফেলে দিয়ে শুধু মাঝের অংশটুকুই নিয়ে থাকে। এতে করে একটি বাঁশের তিন ভাগের দু'ভাগ অপচয় হয়। একটা কাঁচা বাঁশের দু'দিকে দুটো পুরনো বাঁশ না থাকলে ঝড়ের সময় সবগুলো বাঁশের আগা ভেঙ্গে যায়। ঠিকাদারেরা এবং মিলের কর্মচারীদের কর্তব্যের অবহেলার দরুন অনেক

বাঁশের বন ইতোমধ্যেই আগা ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সে যা হোক, কুলিরা বাঁশ কেটে আঁটি বেঁধে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে হাজার হিসেবে জমা করে। এসব কাটা বাঁশকে নিকটবর্তী ছড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে ছোট ছোট ছড়ার তীর পর্যন্ত রাস্তা কাটা হয়।

এ রাস্তা তৈরির কন্ট্রাক্টর যারা, তারা প্রায় সকলেই স্থানীয় লোক নয়। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় যেসব অঞ্চলে পার্বত্য অধিবাসী মগ-মুরুংয়েরাও কোনদিন যায়নি ওসব জায়গায় মাটিকাটার জন্য কিভাবে কুলি সংগ্রহ করে এবং কুলিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে তাই-ই আমার বলার বিষয়। তার আগে বাঁশ কিভাবে চন্দ্রঘোনায় গিয়ে পৌছে সে বিবরণটুকু দিচ্ছি।

একেকটা রাস্তার দূরত্ব ত্রিশ-চল্লিশ মাইল এবং সময়ে সময়ে আরো বেশি হয়ে থাকে। কন্ট্রাক্টারেরা এক মাইল আধ মাইল করে রাস্তার কন্ট্রাক্ট নেয় এবং কুলিদের দিয়ে রাত-দিন অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে দু' তিন মাসের মধ্যে রাস্তা করে ফেলে। রাস্তা করার সময় মাঝে মাঝে বৃত্তাকার টার্নিংও কুলিদের দিয়ে তৈরি করায়। ওইসব টার্নিংয়ে লোপ লাইন বসিয়ে প্রায় আধ মাইল স্থানের কাটা বাঁশ এক জায়গায় জড়ো করা হয়। এভাবে সমস্ত টার্নিংগুলোতে কাটা বাঁশ জড়ো করা হলে পরে ছয় চাকা বিশিষ্ট ট্রাকগুলো কাটা রাস্তার উপর দিয়ে বাঁশ নিয়ে যায় নিকটবর্তী ছড়ির কাছাকাছি। ঠিকাদারের মাইনে করা মজুরেরা প্রতি বাঁশের আগায় দুটো ফুটো করে ফুটোর মধ্যদিয়ে একটি বাঁশের চাঁদা ফালি ঢুকিয়ে দিয়ে চালি বা ভেলা বাঁধে। তারপর এসব ভেলা ছড়ির জলে ভাসিয়ে ভাসিয়ে মজুরেরা কর্ণফুলীতে নিয়ে যায়। কর্ণফুলীর বুকে ভাসতে ভাসতে যখন কাপ্তাই বাঁধের কাছে ভেলাগুলো পৌছে তখন আবার ভেলা খুলে ফেলা হয়। আঁটি বেঁধে ট্রাকে তোলা হয়। ট্রাকে করে বাঁধ অতিক্রম করার পর নদীর জলে নামিয়ে আবার ভেলা বাঁধবার পালা। এই ভেলা ভেসে ভেসে চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের কাছে এলে ঠিকাদারেরা মিল কর্তৃপক্ষের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভে বাঁশ বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে ঘরে চলে যায়। ভেলা খুলে আবার আঁটি বেঁধে দুটো লোহার হুক লাগিয়ে ঘূর্ণায়মান লোপ লাইনে আঁটি আঁটি বাঁশ তুলে দেওয়া হয়। চোখের পলকে বাঁশের আঁটিগুলো পেষণযন্ত্রের উদরে চলে যায়, তারপর এ-কল, সে-কল এমনি হাজারো মেশিন ঘুরে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে গাঁইট গাঁইট তৈরি কাগজ।

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। সবসময় ঠিকাদারদের বাঁশের চালান চলছে এবং সে সঙ্গে রাস্তাও কাটা হচ্ছে। এ বছর একদিকে রাস্তা কাটলে পর বছর আরেকদিকে, যেদিকে বাঁশের বন আরো নিবিড়, সেদিকেই রাস্তা কাটা হয়, পাহাড়িয়া ভূমির উর্বরতাশক্তি খুবই বেশি, কাটা রাস্তা তিন মাসের মধ্যেই ঝোপ-ঝাড়-আগাছা ইত্যাদিতে ঢেকে যায়। দু'তিন বছর পর আগের পাহাড়ে বাঁশ কাটলেও আবার রাস্তা বানাতে হয়। ঠিকাদারেরা ছুটে আসে এবং ধাপ্পাবাজদের দিয়ে কি জঘন্য পদ্ধতিতে দূর-দূরান্ত থেকে মজুরদের ভুলিয়ে এনে আধমরা করে

ছেড়ে দেয়। এই মজুরদের অনেকে পরিবার পরিজনের মুখও দেখতে পায় না; পাহাড়িয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে কি নিদারুণ দুঃখে ওখানেই প্রাণ হারায় সেকথা এর পরে বলব।

২

ঠিকাদারদের যারা কুলি সংগ্রহ করে দেয় তাদেরকে স্থায়ী পরিভাষায় 'মাঝি' বলা হয়ে থাকে। কুলি যোগাড় করার পূর্বে ঠিকাদার এবং এসব মাঝি অথবা কুলি চালানীদের মধ্যে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক কুলির প্রত্যেক রোজের যা মাইনে তার থেকে চার আনা করে পায়। ঠিকাদারেরা এসব আড়কাঠিদেরকে আগাম টাকা দিয়ে দেয় কুলি সংগ্রহ করার জন্যে।

ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মাঝিরা কুলি সংগ্রহের জন্য কোন গ্রামে যায় না। কেন গ্রামে যায় না তা পরে বলব। তারা টাকা নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে আসে এবং মাদারবাড়ি, নালাপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের সস্তা আট-দশটা ঝুপড়িঘর ভাড়া করে রেখে দেয় এবং ওসব ঘরে সব সময় ঢালাও চাটাইয়ের বিছানা পেতে রাখে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। ওসব ঘরে দিনে এক আধবার ঠিকাদার বা ঠিকাদারের লোক এসে ঘরে খবর নিয়ে যায়, কতজন যোগাড় হল।

মাঝি বা আড়কাঠিরও আবার অনেক চর আছে। তারা সারাদিন সারা শহর চষে বেড়ায়। সুবিধামত কোন মানুষ পেলেই এসব ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে আসে। চার-পাঁচজন অথবা আরো বেশি লোককে একসঙ্গে তারা কখনো কাজের কথা বলে না। ওভাবে কুলি সংগ্রহ করতে গেলে বেশ একটু ঝুঁকি নিতে হয়। তাই তারা একলা মানুষকেই সব সময় প্রলুব্ধ করে বেশি।

চট্টগ্রাম শহর এদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর হওয়ায় কাজের আশায় আশেপাশের কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং আরো কিছু জেলার লোকেরা কাজ-কর্মের অনুসন্ধানে আসে। যারা কাজের অনুসন্ধানে একজন অথবা দু'জন এমনিভাবে আসে তারা গাঁয়ের সরল মানুষ। অনেকে আগে কর্মব্যস্ত শহর কি জিনিস তা কোনদিন দেখেনি। সকলের তো আর চেনাজানা মানুষ শহরে থাকে না। গাড়ি থেকে কাঁথা-বালিশ বগলে, ঝুড়ি-কোদাল কাঁধে এসব মানুষ হঠাৎ যানবাহন, গাড়ি-ঘোড়া, লোক-লস্কর দেখে একদম হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আগের অভ্যাস না থাকায় রাস্তায় ঠিকমত চলতে পারে না। মোটরকার ইত্যাদি যানবাহনের দুর্ঘটনার ভয়ে খুবই সন্তর্পণে রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটে। আড়কাঠির চেলারা তখন এসব মানুষের অনুসরণ করে। তাদের সঙ্গে একেবারে দরদী বন্ধুর মত ব্যবহার করে। রাস্তা চিনিয়ে দেয়। পকেট থেকে বিড়ি বের করে খেতে দেয়। এমনকি চা-নাস্তাও খাওয়ায়। লোকগুলোর মন কৃতজ্ঞতায় যখন ভরে উঠে তখনই সুযোগ বুঝে কন্ট্রাক্টরের গুণপনা বর্ণনা করে। অনুরোধ করে, "চলুন না আমাদের কন্ট্রাক্টর সাহেবের সঙ্গে। তিনি খুবই পরহেজগার মানুষ,

পাঁচবেলা নিয়মিত নামাজ পড়েন, কারো হকের পয়সা কখনো মাটি করেন না। তাদের পরোপকার বৃত্তি এবং ঠিকাদারের মাহাত্ম্যে মোহিত হয়ে ঝুপড়িঘরগুলোতে উঠে আসে। আড়কাঠিরা তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আপনাদের কোনও চিন্তা নেই। এখানে খান আর ঘুমান, কন্ট্রাক্টর সাহেব খুবই দয়ালু লোক। তিনি আপনার গাঁট থেকে আপনাদের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করেছেন।

শুধু গাঁয়ের লোক কেন অনেক শহরচেনা মানুষও দালালদের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে এসব ঝুপড়ি ঘরে এসে উঠে। কেমন করে বলছি। কোন ফ্যাক্টরি, মিল অথবা দোকানের কর্মচারীরা যখন চাকুরি হারায় অনেকের গাঁটে তখন দেশে ফিরে যাবার পয়সা থাকে না। অনেকে আবার শহরের চাকচিক্য ছেড়ে গ্রামে যাওয়াটা মনের দিক থেকে অনুমোদনও করতে পারে না। অথচ তাদের খাবার পয়সা নেই। এসব চাকুরিহারা লোকগুলোর প্রতি ওরা নজর রাখে। চাটগাঁ শহরের লালদীঘির পাড়, স্টেডিয়াম, রেলওয়ে স্টেশন, সদরঘাট ইত্যাদি অঞ্চলে অন্নহীন-বস্ত্রহীন অনেক মানুষ দিনরাতে ক্ষুধিত কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়। দালালেরা অগ্রণী হয়ে এসব মানুষের সঙ্গে আলাপ জমায়। দুঃখে নানারকম সহানুভূতি, সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করে, পানটা বিড়িটা খেতে দেয়। ওসব অভুক্তের মনের অবস্থা এমন তারা একবেলার ভাতের বিনিময়ে যে কোন কাজ করতে রাজি। এভাবে দিনে দিনে বর্ণিত স্থানগুলো হতে নতুন নতুন কাজের মানুষ ঝুপড়িঘরে নিয়ে আসে। তবে তাদের একটা নিয়ম হল, পঞ্চাশের উপরে যাদের বয়স, যারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না অথবা যারা খুবই দুর্বল তাদেরকে দালালেরা প্রলুব্ধ করে না।

এছাড়া আরো আছে, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে এমনি অনেকে মা-বাপের ওপর রাগ করে টাকা-পয়সা চুরি করে শহরে চলে আসে। শহরে এসে অবিবেচকের মত দু'হাতে খরচ করে সব টাকা উড়িয়ে উপোষ করে থাকে। কি খাবে, ঘুমাবে কোথায় ইত্যাদি নানা সমস্যার জর্জরিত অবস্থায় দু'চোখে যখন অন্ধকার দেখে তখনই ওদের সামনে হাজির হয় দালালেরা। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক হাইস্কুলের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রও আমি দেখেছি। স্কুলের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্ররা সাধারণত একটু কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকে। অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানের নেশা তাদের এমনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন একটা ছুতো পেলেই শিক্ষক অথবা অভিভাবকের সঙ্গে ঝগড়া করে অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে শহরে চলে আসে। শহরে এসে তারা সে একই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন দালালেরা তাদের কাছে এসে কেরানি, পিয়ন ইত্যাদি চাকুরির লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে ঝুপড়িতে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন মানুষ বাড়ে, মোটা চাল আর ডাটা জাতীয় তরকারি রান্না করা হয় দু'বেলা। অভুক্তেরা খেতে পেয়ে একটু তাজা হয়ে ওঠে। মজুরেরা কাজ পেয়েছে একথা ভেবে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এতেই শেষ নয়। ওরা ছোট ছোট ছেলেদেরকেও ফাঁদে ফেলে। সুশ্রী, ফর্সা চেহারার ফুটফুটে সুন্দর ছেলেরা যখন অসহায়ভাবে চলমান পথের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন দালালেরা এসে একান্ত আত্মীয়জনের মত পিঠে হাত বুলিয়ে নানাকথা জিজ্ঞেস করে। অনেক গৃহপালানো ছেলে কেঁদে কেঁদে তাদের মা-বাপের কথা বর্ণনা করে। দালালেরা আশ্বাস দেয় তাদেরকে তাদের বাপ-মায়ের কাছে পৌছে দেবে বলে। এটা সেটা কিনে দিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে। তারপর তারা ছেলেদেরকে নির্জন ঘরে নিয়ে রাখে। সাধারণ কুলিরা তো তখনো কিছু জানতে পারে না।

কাপ্তাইয়েরও এক শ' দেড় শ' মাইল ওপরে যেখানে সত্যিকার অর্থে বাঘ-ভালুকও যায় না সেসব নারী-বিবর্জিত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে কিভাবে তাদের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করে সেকথা যথাসময়ে বলব।

মাস পনেরদিনের মধ্যেই ঝুপড়িগুলো ভরে ওঠে মানুষে। যাওয়ার আগের দিন কুলিদের কার পেছনে কত খরচ হল তা আড়কাঠি এবং ঠিকাদারের লোকেরা গোপনে হিসেব করে লিখে রাখে।

তারপর এসব মানুষদেরকে ঠিকাদারের হাতে তুলে দেয় আড়কাঠিরা। ঠিকাদার সবকিছু বুঝে নিয়ে এক সকালে সকলকে নিয়ে লঞ্চে উঠে। কর্ণফুলীর জলে ঢেউ তুলে লঞ্চ উজানের দিকে ছুটে যায় সিটি বাজিয়ে।

৩

লঞ্চ সেদিনই সন্ধ্যায় কাপ্তাই এসে পৌছে। কাপ্তাইঘাটে লঞ্চ থামলে পরে ঠিকাদারের মানুষেরা তাদের আনা মানুষের দিকে কড়া নজর রাখে, যাতে কেউ ফাঁকি দিয়ে নেমে যেতে না পারে। সব যাত্রী নামবার পর গুণে গুণে তারা এসব মানুষদের নামায়। কাজটি এত সতর্কতার সঙ্গে করে যে, কুলিদের কেউ টেরও পায় না। কাপ্তাইয়ের সস্তা কোন হোটেলে কিছু নাস্তা ইত্যাদি খাইয়ে তাদেরকে নিয়ে যায় সামনের পাহাড়ের উপরের পথ দিয়ে।

কেউ কেউ ঠিকাদারের মানুষদেরকে প্রশ্ন করে কাপ্তাই তো এসে গেলাম। এখন আবার কোথায় যেতে হবে? ওরা শুধু বলে, আরে মিয়ারা চল— আসল কথা জানতে দেয় না। ওইদিনই ঘন্টাখানেকের মধ্যে সকলে কাপ্তাইয়ের প্রায় দু'মাইল ওপরে রাইংখং বাজারে এসে পৌছে। টাউটেরা আসল কথা ভুলাবার জন্য তাদেরকে গান গাইতে বলে। নিজেরা নানা কেচ্ছা কাহিনীর অবতারণা করে। পাহাড় দেখেনি দলের অনেকে। একদিকে পাহাড় এবং অন্যদিকে যন্ত্রের কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি দেখে অনেকেরই প্রাণ আপনা-আপনি আনন্দে নেচে ওঠে। গলা দিয়ে হঠাৎ নতুন কিছু দেখার আনন্দে গান বেরিয়ে আসে। যুবকেরা এই মগ-চাকমার আজব দেশের তরুণীদের গল্প করতে করতে মৌজ করে পথ চলে। রাইংখং বাজার থেকে যে হাঁটা দিয়েছে, একটু পরেই ক্ষুধায় তাদের পেট চিনচিন করে ওঠে। আর বিজলিবাতি

নেই। পাহাড়গুলো উঁচু হতে উঁচুতর হচ্ছে। দু'পাশে নিবিড় বন। সরু পথে হাঁটতে তাদের গা ভয়ে ছম ছম করে, বুকে আশঙ্কা দোলা দিয়ে যায়, যাচ্ছি কোথায়? এরকম একটা ভয়ে সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

স্টেডিয়াম, সদরঘাটের সে দরদি বন্ধুদের ডেকে বলে, ও ভাই, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ঠিকাদারের ভাড়াটে টাউটেরা নানারকম তালবাহানা করে আসল কথা এড়িয়ে যায়, এভাবে পাহাড়ের পাশ দিয়ে, সমতল ভূমির উপর দিয়ে, চাকমা পল্লীর ধার ঘেঁসে প্রায় ঘণ্টাতিনেক হেঁটে সকলে ধুল্যাছড়িতে এসে পৌছায়। ধুল্যাছড়ি হল রিজার্ভ ফরেস্টের যাত্রাপথের প্রথম বিরাম স্থল, ওখানে কতকগুলো হোটেল আছে। দোকানপাটও কিছু আছে। হোটেলগুলোও অনেকটা মাচানঘরের মত। এখানে এসে সকলে ভাত খায় এবং সে রাতের মত ঘুমায়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে ভীতি বিস্ফারিত চোখে সমতল ভূমির মানুষগুলো চেয়ে দেখে চারদিকে পাহাড় ঘেরা থমথমে পরিবেশ, কোন মানুষজন নেই তেমন। তাদের মুখের ভাষা মুখেই আটকে যায়। কেউ কেউ অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে, 'আল্লাহ কোন দেশে আইলাম গো'।

ধুল্যাছড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন। পাহাড়িয়া পথে প্রায় দশ মাইল হেঁটে বিলাইছড়ি বাজারে এসে পৌছে। মানুষদের চোখে মুখে তখন যে উদ্বেগ এবং বেদনা আমি দেখেছি— জীবনে তা কোনদিন ভুলব না। তবু তারা অনভ্যস্ত পায়ে পাহাড়িয়া বন্ধুর পথে হোঁচট খেতে খেতে সামনে এগিয়ে যায়।

বিলাইছড়ি বাজারটা অপেক্ষাকৃত জনবহুল স্থান। এখানে যে বাজার তা কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা এবং রাঙ্গামাটি বাদ দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। চাকমা, মগ এবং অন্যান্য আদিবাসিরা এ বাজারে কার্পাস, সর্ষে ইত্যাদি এবং আরো অনেক কিছু বিক্রয় করতে আনে। সেজন্য চট্টগ্রামের অনেক ব্যবসায়ীদের ভীড় এই বাজারে।

বিলাইছড়ি খালে গোসল করে লোকগুলো হোটেলে এসে ভাত খায়, পেটে ক্ষুধা সকলের। তবু কারো মুখে ভাত রোচে না। সকলের চোখে আতংকের আভাস! অচিন চাকমা তরুণীদের উদ্দেশ্যে হাসি-ঠাট্টা করা যুবকেরাও চিন্তার ভারে নুইয়ে পড়ে। ঠিকাদারের লোকেরা আর কতকগুলো লোকের সঙ্গে গলাগলি করে। এসব লোকদের ভাষা এরা বুঝতে পারে না। কারণ ওরা এ দেশের অধিবাসী নয়। এরা ঠিনাদারদের আগের লোকগুলোসহ চাকমাপাড়া থেকে বাংলা মদ আনিয়ে পান করে। সারারাতই মাতলামি করে।

সে রাতে প্রায় চারটের সময় সকলে যাত্রা শুরু করে। বুকের বল দমে গেছে মানুষদের। কোন অদৃশ্য শৃঙ্খল দিয়ে তাদেরকে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন। এবারে জনমানুষের আনাগোনা একেবারে নেই। বিলাইছড়ির কাছাকাছি স্থানসমূহে মগ, মরুং, চাকমা, টিপরাদের বসতি শেষ।

বিলাইছড়ি, ধুল্যাছড়ি এসব জায়গায় বর্তমানে কাপ্তাই বাঁধ দেওয়ার ফলে পানির তলায় ডুবে গেছে; কিন্তু আমার যা বলবার বিষয়, মানে কুলিদের ওপর নির্যাতন এখনো সমানে চলছে।

রিজার্ভড এরিয়া শুরু হয়েছে। পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে। পথ চলার কষ্ট আগের চেয়ে দু'গুণ কি তিনগুণ বেড়ে গেছে। ঠিকাদারদের লোকদের সঙ্গে গলাগলি করা মানুষগুলো বন্দুক কাঁদে আগে পিছে চলেছে, কারো কারো হাতে চিকন পাহাড়িয়া বেতের ছড়ি। বয়সে যারা কচি সমান তালে হাঁটতে পারছে না। ইতোমধ্যে শপাং শপাং তাদের পিঠে আঘাত করতে শুরু করেছে। দলের আর আর সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; হ্যাঁ সত্যি তারা ফাঁদে পড়েছে। সবকিছু দেখে, সব অনুভব করতে পারে। কারো কারো চোখ ফেটে ক'ফোটা পানি নীরবে দু'গণ্ডে গড়িয়ে পড়ে। কিছু বলে না। নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে পথ চলে নিরবে।

একেকটা পাহাড় আধ মাইল এক মাইল উঁচু। সেসব উঁচু পাহাড়ের ধার দিয়ে বয়ে গেছে সরু পায়ে চলার পথ, ছড়ি থেকে ঝোপঝাড়, বাঁশের বন, কাঁটাবন ইত্যাদি ঠেলে চড়াইয়ে উঠতে উঠতে সকলের বুকের রক্ত পয়মাল হয়ে যায়। প্রতিবাদ করার উপায় নেই।

ছড়ির দেশ পার্বত্যচট্টগ্রাম। মৌসুমি বর্ষার শোষিত জল পাহাড় চুঁইয়ে চুঁইয়ে সারাবছরই নির্গত হয়। এই পাহাড় চোঁয়ানো জলে আরো পাহাড় চোঁয়ানো জল মিশে ক্ষীণ স্রোত বয়ে যায়। এমনি পাঁচ সাত, আট দশটা এমনকি আরো বেশি মিলিত হয়ে রচনা করে ছড়ি। এসব ছড়ি নিচের দিকে নিমে এসেছে এবং শেষ গতিতে কর্ণফুলীর বুকে মিশে গেছে।

এভাবে ছড়ির পর ছড়ি পেছনে পড়ে থাকে। তারা এগুতে থাকে সামনে। পিয়াসায় ছাতি ফেটে যায়। ছড়ির জলে তৃষ্ণা মেটায়, পুরোদিন চলার পর তারা আদি পথে এসে একটা বড় গাছের নিচে রাত্রি যাপন করে। পোটলা-পোটলি খুলে কিছু খেয়ে নেয়।

পরের দিন সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় আবার পথ চলা। কত কষ্ট যে এ পথ চলায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। একেকটা উঁচু পাহাড়ে উঠতে গেলে আট দশবার প্রস্রাব করতে হয়। শরীরে ঘামও আর থাকে না বেরুবার। পাহাড়িয়া অঞ্চলে যাবার জন্যে কেউ পথ কেটে রাখেনি। এসব অঞ্চলে আদিবাসীরাও আসেনি আগে। পায়ে চলার পথও সে কারণে সৃষ্টি হয়নি। কোন কোন সময়ে পথের সামনে পড়ে দুর্ভেদ্য বন, তাও অতিক্রম করতে হয়। গা এবং গায়ের বিভিন্ন স্থান বন্যকাঁটার কামড়ে ছিঁড়ে যায়। দরদদিয়ে রক্ত ছোটে। সময় কই লক্ষ করবে। একটু গাফলতি দেখলেই শপাং শপাং কয়েক বেতের বাড়ি পিঠে পড়বে। আগের দরদি বন্ধুদের মুখের আদল তখন কসাইয়ের মুখের মত দেখায়। তাদের মুখের ক্রুর হাসি কেমন শানিত, অথচ কত নিষ্ঠুর!

এভাবে শুক্কুরছড়ি, যমুনাছড়ি, ভাইবইন ছড়ি, চড়াছড়ির, ওড়াছড়ি, ফারোয়া ছড়ি ইত্যাদি শত শত ছড়ি পেরিয়ে সন্ধ্যা সাত-আটটার সময় বর্ডারের কাছাকাছি কর্মস্থলে এসে পৌছে— ঠিকাদারদের লোকেরা এসে সে সদরঘাটের মানুষদের সঙ্গে মোলাকাত করে। আর সব মানুষ পরস্পরের দিকে বোবাদৃষ্টি মেলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক নিস্পন্দ। চারদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে বাঁশের বন।

৪

বাঁশবনে পৌছে প্রথমরাতে কুলিরা কোনরকমে কাটায়। পরদিন সকালে ঠিকাদারের লোকদের চিৎকারে ওদের ঘুম ভাঙ্গা চোখ মেলে তারা চমকে ওঠে। একি দুঃস্বপ্ন দেখছে? কোথায় এল তারা? চারদিকে জঙ্গল। জঙ্গলের বাঁশের পাতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে না আকাশের উদারতা, বাঁশের ঘন বনের কোন্ ওপারে দিগন্তের রোদ ঝলসানো সোনালি রেখা, চারদিকে বিশাল নিবিড় ভয়ঙ্কর নিশ্চুপ আদিম অরণ্য। সৃষ্টির আদি থেকে প্রকৃতির আপন খেয়ালে বাড়ছে। দৃষ্টির অগম্য দূরে তারা ফেলে এসেছে ঘরবাড়ি পরিচিত পরিবেশ। চোখের সামনে সবকিছু ভেসে ওঠে। কিসে যেন কি হয়ে গেল। তখন চোখে পানিও নেই। আছে শুধু বনের, নিশ্ছিদ্র আদিম ভয়াল পরিবেশ। সে পরিবেশের মাঝখানে তারা। সামনে যমদূতের মত দণ্ডায়মান-ঠিকাদারের ভাড়াটে চেলাচামুণ্ডার দল।

সারাশরীর পুঁজে পুষ্ট ফোঁড়ার মত ব্যথাভারে জর্জরিত। এপাশ ওপাশ ফেরার শক্তি কারো নেই। তবু একটা জিজ্ঞাসা সকলের মুখে, এলাম কোথায়?

সেকথার উত্তর কেউ দেয় না। হুকুম করে কনট্রাটারের চেলারা, সকলে ওঠে পড়। সমতল ভূমির মানুষ একে তো পাহাড়িয়া অঞ্চলের উঁচু নিচু পথে হাঁটার অভ্যেস কারো নেই, তদুপরি এই যে দুর্গম পর্বতমালা, একে অতিক্রম করে অতীতে কদাচিৎ মগ-মরুংয়েরাও এসেছে কিনা সন্দেহ। হালের কাজে, মাঠের কাজে যারা অভিজ্ঞ তাদের কথা না হয় বাদ দেয়া যায়, কিন্তু যারা দোকানে কাজ করেছে, শহরে কাটিয়েছে, অথবা যারা মা-বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে স্কুলের পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে বুকিয়ে এসেছে, তাদের অবস্থা? সেকি বলা যায়, না কলম দিয়ে লেখা যায়?

তবু এসব প্রাণহীন মানুষকে উঠতে হয়। জঙ্গলের আড়ালে পায়খানা-প্রস্রাব করে জলের সন্ধান করে। কিন্তু জল কোথায়? পাহাড়ের গাঁ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলের মত একজাতীয় রঙ্গীন তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। তাই দিয়ে চাল ধোয়া, কাপড় ধোয়া, পায়খানা-প্রস্রাবের জল, শৌচ এবং পানীয় জল। এ অবস্থা দেখে কাউকে কাউকে হেসে ওঠতে দেখেছি। কারণ কাঁদবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে। প্রেতের হাসির মত সে হাসি। কত বিবর্ণ, কত করুণ, কত বেদনামাখা মানবসন্তানের জীবনীরসের সে নিদারুণ অভিব্যক্তি।

রহস্যময়ী বনভূমি অনেক কিছুই সৃষ্টির আদি থেকে লোক চোখের আড়াল করে রেখেছে। রহস্যের পর রহস্য। লোকগুলোর চোখে ভাষা ফোটে না, কপালে বলিরেখা পড়ে না, চেতনা তাদের মরে গেছে। মৃত্যুর ওপারে দাঁড়িয়ে তারা যেন ঠিকাদারের মানুষদের হুকুম আদেশ নিরবে পালন করে যাচ্ছে।

এরপর তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে ঘরগুলোতে থাকতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড়ের থলিতে এসব ঘর বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁশের মাচান ঘর। চারধারে বাঁশ দিয়ে ঢাকা ওপরে বাঁশপাতার ছাউনি, শীতের দিনে বনের হিমেল হাওয়া বর্শার ফলার মত সারাশরীরে এসে বিঁধে। বর্ষায় বৃষ্টির ছাঁট অবাধে ঘরে ঢুকে ঘরের মানুষদের আড়ষ্ট করে ফেলে। ফাগুনে বনভূমি আগুন। বঙ্গোপসাগরের অতল প্রশান্তিমাখা সুশীতল দখিণা হাওয়া এ বনের রাজ্যে প্রবেশ করে না। একেকটা ঘরে ত্রিশ থেকে চল্লিশজন মানুষকে থাকতে হয় গাদাগাদি করে। এপাশ থেকে ওপাশে ফেরা যায় না। মানুষগুলো কিছু বলতে পারে না। বলার যে সাহস তা ফুরিয়ে গেছে। অনুভূতি তাদের গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে গেছে। বেঁচে থাকবার আশা-ভরসা, জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ ঝুপড়িঘরের ক'বেলা ডাঁটার তরকারি দিয়ে মোটা চালের ভাতের বদলে সদরঘাটের দয়াল বন্ধুদের কাছে বিক্রি করেছে। এখন সামনে যা আসে নির্বিবাদে তাই-ই মেনে নিতে হবে। বিরতি দিলে চলবে না।

থাকার ঘর দেখার পালা শেষ হয়। সে মাচান ঘরে নিজেদের কাঁথা-বালিশ রেখে দেয় মৃতকল্প এসব মানুষ! বনের এ নিঃসীম রাজ্যেও নিজের একটু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কি আকুল আগ্রহ! ঠিকাদারের মানুষেরা তাদেরকে তারপর রান্নাবান্নার সাজসরঞ্জাম দেখিয়ে দেয়। দু'চারটে হাড়ি পাতিল, একজনের জন্য এক একটা মাটির সানকি ঠিকাদারের তরফ থেকে বরাদ্দ করা। ঠিকাদারের নিজস্ব স্টোর বা দোকান আছে। তাতে নৌকায় করে বিলাইছড়ি বা আরো দূরের রাঙ্গামাটি বাজার হতে চাল ডাল মরিচ ইত্যাদি নৌকা যোগে এনে জড়ো করে রাখে। স্টোর থেকে বাকিতে সব কিছু নিতে হয়। নতুন মানুষেরাও চাল, ডাল এনে মাটিতে গর্ত করে আগুন জ্বালিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয়। ভাত পাক হয়ে গেলে মাড়-ফেনসহ ক্ষুধার তাড়নায় গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। খাওয়ার পর মুখ-হাত ধুয়ে যেই একটু ঘুমাতে যাবে অমনি এসে হাজির ঠিকাদারের লোকেরা।

মিয়ারা চল সকলের কাজ দেখে আসবে। অবিশ্রান্তভাবে ত্রিশ চল্লিশ ঘণ্টা ধরে মানুষগুলো তাদের ছেড়ে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দিকেও ভাল করে নজর রাখতে পারেনি। ওদের কথার জবাব দেবার ভাষা কারো মুখে যোগায় না। শুধু মরা মাছের চোখের মত দৃষ্টি হুকুমদাতাদের আজরাঈলের মত চোখ-মুখের দিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরে। ব্যথা-জর্জরিত শরীর নিয়েও ওদের উঠতে হয়। নিস্তেজ অনিচ্ছুক পাগুলো ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে হুকুমদাতাদের অনুসরণ করে।

সাইট বা কর্মস্থলের দূরত্ব বাসা থেকে এক মাইল, আধ মাইল। সময় বিশেষে আরো বেশি হয়ে থাকে। তারা দেখে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে রাস্তা কাটছে তাদের মত

ভুলিয়ে আনা মানুষ। কেউ মাটি কাটছে, কেউ বাঁশ কাটছে, কেউ কেউ বাঁশ গাছের গোড়া তুলছে। যারা শক্ত সবল তাদের কারো হাতে ছেনি-মার্তুল, কারো হাতে শাবল-গাঁইতি, পাহাড় যেখানে পাথুরে সেখানে আঘাতের পর আঘাত করছে। আঘাতের চোটে পাথর ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ফুলকিতে ফুলকিতে ঠিকরানো আগুন। ঘামে সারাশরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। পিছে ফেরা তো দূরের কথা— একজনের সঙ্গে আরেকজন একটু কথা বলবে তার উপায়ও নেই। ঠিকাদারের এ-দেশিয় ও-দেশিয় চরদের হাতের চিকন কোরকবেত সশব্দে আঁছড়ে পড়ছে পিঠে। সূর্য ওঠার আগে ওরা কাজে গিয়েছে। বারোটার সময় এসে ডালের পানি আর সে ফেনশুদ্ধ ভাত খেয়ে একটার সময় আবার যেতে হয়েছে। সূর্য ঠিক ডুবে গেলে তাদের ছুটি হবে। রিজার্ভ ফরেস্টের কুলিদের কাজ করবার সময় হল। এদিকে সূর্য ওদিকে আকাশে তারা ওঠা এর মাঝখানে শুধু খাবার সময়টুকু ছাড়া সব সময় কাজ করতেই হবে।

নতুন মানুষদের দেখে পুরান মানুষেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, কিছু বলে না তাদের। কেবল নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে রিজার্ভ ফরেস্টে বল-বীর্য-স্বাস্থ্য বলি দিতে এরাও এসেছে।

সাইট দেখান হল। সেদিনই ঠিকাদারের লোকেরা তাদেরকে গাঁইতি, কোদাল, শাবল, কুড়াল দেখিয়ে বলে, যে যেটা চালাতে পারবে সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হাতল লাগাও। ওরা ইতস্তত করে। তখন ঠিকাদারের লোকই বাঁটোয়ারা করে দেয়, যারা অপেক্ষাকৃত সবল তাদের হাতে শাবল অথবা ছেনি, মার্তুল, তার চেয়ে যারা দুর্বল তাদেরকে গাঁইতি, কুড়াল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেরকে কোদাল দেয়া হয়।

যাদেরকে কেরানি, পিয়ন ইত্যাদির চাকুরি দেবে বলে এনেছে তারা যখন সে কথা বলে তখন মুখ ভ্যাংচিয়ে নানারকম টিপ্পনী কাটে যমদূতের মত লোকগুলো। স্কুল পালান ছেলেরা তাদের হাতে পায়ে ধরে বলে আমরা বাপের বাড়িতে শুধু লেখাপড়া করেছি। এসব কাজ কোনদিন করিনি। কে শোনে কার কথা।

কিশোরদের ঠিকাদারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেন পাঠায় তা কারো অজানা নয়। তবু আমি এদের দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করার সময় এই নারী বিবর্জিত রিজার্ভড ফরেস্টের সে বীভৎস দিকটিও ইঙ্গিতে বর্ণনা করব— শালীনতার মধ্যদিয়ে যত কম কথায় পারা যায়।

ওসব মানুষেরা কোদাল, কুড়াল, গাঁইতি, শাবলে হাতল লাগিয়ে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যার মত রান্না করে খেয়ে ঘুমোতে যায়। সামনে যে জীবনের সংকেত তারা দেখতে পেয়েছে তারই তড়াসে অথবা যে ক্লান্তি তাদের শরীরের রোমে রোমে বাসা বেঁধেছে তারই চাপে, মোটা মুলি বাঁশের মাচানে খাঁচাবদ্ধ মুরগির মত ঘুমিয়ে পড়ে।

৫

সূর্য না দেখা ভোরে ঠিকাদারদের মানুষদের ডাকে কুলিরা ঘুম থেকে ওঠে সকলে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে নেয়। দু' একজন শুকনো বাঁশ জোগাড় করে আগুন জ্বালায়। আর দু' একজন পাহাড়ের পাথর-চোঁয়া বরফের মত ঠাণ্ডা জল ভরে। আগেই বলেছি, এ জলেই তাদের শৌচ, রান্নাবান্না, ধোঁওয়ামোছা সবকিছু করতে হয়।

মশুর ডালের পানি আর ফেনমাখা ভাত খেয়ে ওদেরকে সাইট-এ ছুটতে হয়। সেদিনকার মত কাজ শুরু হয়। পাহাড়ের পাথুরে অঙ্গ গাঁইতির আঘাতে আঘাতে মসৃণ করবার শিক্ষা তাদের কই? বিরাট বিরাট শত শত গাছের গোড়া উৎপাটন করার কাজও দেয়া হয়েছে তাদের। কাউকে কাউকে পাথরে সুড়ঙ্গ করে বারুদ দিয়ে পাথর ফাটানোর কাজ শিখাবার জন্য নেওয়া হয়েছে। স্কুলের যেসব ছাত্র কেরানি-পিয়ন বনবার আশায় এসেছে রিজার্ভড ফরেস্টে তাদের প্রতি একটু করুণা করা হয়। তার মানে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের কাজ তারা করে। একটা চটের বস্তার দু'দিকে দুটো ডাণ্ডা লাগিয়ে মাটি ভর্তি বস্তাগুলো পাহাড়ের পাশে পাশে ঢেলে দেয়। দুপুর বারটা বাজলে তারা ডেরায় এসে সেই মশুর ডালের পানি আর ফেনমাখা ভাত খেয়ে আবার কাজে যায়। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে তাদের ছুটি।

এভাবেই কাজ চলে প্রতিদিন। মানুষগুলো অতীষ্ট হয়ে ওঠে। পালাবার কথা তাদের মনে আসে, কিন্তু কেমন করে পালাবে? সারারাত বন্দুক নিয়ে কুলিদের বাসা পাহারা দেয় ঠিকাদারের লোক। আর তাছাড়া এ বিশাল দুরধিগম্য অরণ্যের ওপাশে মানুষের বাসভূমি কোথায় তা কেমন করে খুঁজে নেবে? মানুষগুলো তো এক একজন এক এক জায়গার, বাংলায় কথা বললেও ভাষার বিভিন্নতার জন্য একজন আরেকজনের সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে পারে না। ঠিকাদারের লোকেরা সব সময় তাদের ভেতর এ বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখে। এসব ছাড়াও তাদের পালাতে হলে যে রাস্তা কাটছে সে রাস্তা বেয়েই ছড়িতে নামতে হবে। বিভিন্ন ঠিকাদারেরা এক আধমাইল ভাগাভাগী করে রাস্তার কন্ট্রাক্ট নেয়। রাতের বেলা রাস্তার উপরেও পাহারা বসায়। এক ঠিকাদারের লোক দুয়েকজন পাহারাদারকে ফাঁকি দিতে পারলেও একজন না একজনের হাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। ধরা পড়লে আবার ঠিকাদারদের কাছে পাঠান হয়। কাজ করলে তবু ক'দিন বাঁচার আশা আছে। কিন্তু পালান মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তবু মুক্তিপিয়াসী মানুষকে আমি পালিয়ে যেতে দেখেছি। ধরা তারা পড়েছে, শাস্তিও পেয়েছে।

দেখেছি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মজলিশপুর গ্রামের মফিজ উদ্দিনকে পালিয়ে যেতে। সে চারজন প্রহরীকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। কিন্তু পঞ্চমজনের হাতে ধরা পড়ে আবার তাকে ঠিকাদারের বাথানে আসতে হয়েছিল। কত যে মেরেছিল ওকে। জোয়ান মানুষের তাজা রক্ত পিচকারীর মত ছুটেছিল বেতের ছড়ির আঘাতে। উঃ! গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও আমি দেখেছি। এদের তুলনায় ওরা আরো

নৃশংস, আরো পিশাচ। এতে শেষ নেই, ঠিকাদার বিচার করে রায় দিল, মফিজুদ্দিনকে একটি বিরাট তেরপাল দিয়ে বেঁধে বস্তার মত করে মাচানঘরের তলায় রাখা হবে প্রতি রাতে। শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাক-মুখ খোলা রাখা হবে। তাই-ই তারা করেছিল মফিজুদ্দিনকে। রাতে তেরপাল জড়িয়ে মাচানঘরের তলায় রাখত আর দিনের বেলায় কিছু খাইয়ে কাজে নিয়ে যেত। এভাবে একমাস কেটেছে মফিজুদ্দিনের। তারপর একদিন যখন মফিজুদ্দিনের সারা গায়ে বিষাক্ত ঘা হল তখনই তাকে মাচানঘরে শুতে দেয়া হয়েছিল। সেই সংক্রামক ঘায়ে আক্রান্ত হয়েছিল আরো অনেকে। আমি শুনেছি, আরো আগে নাকি পালাবার অপরাধে একজনের হাত পা গাছের সঙ্গে বেঁধে সারা গাঁয়ে পেরেক মেরে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটা আমাকে যে লোকটি বলছিল সে ঠিকাদারের এক বিশ্বস্ত লোক।

রিজার্ভড ফরেস্টে ফেরারি আসামিদের আড্ডা পাহাড়িয়া দুর্গম পথে কাপ্তাই হতে প্রায় দেড় দু' শ' মাইল ওপরে। পুলিশের কি সাধ্য ওদের নাগাল পায়। এদেরই কেউ কেউ ঠিকাদারদের দক্ষিণ হস্ত। বছরের পর বছর এরা রিজার্ভেই থাকে। ঠিকাদারের তরফ থেকে ওদের জন্য সব রকমের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়। ঘিয়ে ভাজা রুটি খেতে দেওয়া হয়। সকাল-বিকেল দু'বেলা চা খেতে পায়। রাতের বেলা তুলার বালিশে, লেপের ওমের তলে ঘুমোয়। ভুলিয়ে আনা কিশোরদেরকে প্রতিরাতে পালা করে এদের সঙ্গে ঘুমাতে হয়। এসব ব্যাপার রিজার্ভে অহরহ ঘটছে। ছেলেদের করুণ আর্তচিৎকারে কুলিরাও ঘুমোতে পারে না। কিন্তু কি করবে তারা? করবার কি আছে তাদের? এসব বিকৃত রুচির মানুষদের বীভৎস আচরণে রাজি না হলে অরণ্যের হাড় কাঁপানো শীতে তাদেরকে হাত-পা বেঁধে উদোম গায়ে বসিয়ে রাখা হয়।

সব দেখে শুনে একবার আমি ঠিকাদারদের একজনকে বলেছিলাম, তোমরা এভাবে মানুষের উপর এবং বিশেষ করে তোমাদের নিজ সন্তানের মত ওই ছেলেদের ওপর এমনভাবে অত্যাচার কর কেন? এটা কি এমনি যাবে মনে কর? এর কি কোন প্রতিকার নেই? ঠিকাদার আমার কথা শুনে যে জবাব দিয়েছিল তার মানে—'আমরা জঙ্গলকে মঙ্গল বানাচ্ছি। তোমার বয়স অল্প সেজন্য বুঝবে না। আমরা জঙ্গলকে মঙ্গল বানাচ্ছি, তা করতে হলে জীবন যৌবনের কিছু অপচয় অবশ্যই হবে।'

এই-ই তো রিজার্ভড ফরেস্ট। দিনে দিনে মানুষগুলোর হাড়গুলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মাসে একবারও গোসল করতে পারে না। গোসল করার পানি কই? পানির জন্য যেতে হয় বনপথে চার-পাঁচ মাইল। ঠিকাদারের জোরসে কাজ চলছে। সুতরাং তারা গোসল করবে কেন সময় নষ্ট করে? কাপড়ে চুলে একজাতীয় সাদা উকুন বাসা বাঁধে। রোদের তাতে ওসব উকুনের কামড় হয়ে ওঠে তীব্র। হাত পেছনে নিয়ে চুলকাবার সুযোগও পায় না। অমনি কয়েক বেত পিঠের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ে। ঠোঁটগুলো শীতের সময় কুষ্ঠরোগীর মত কেটে ফেটে ছিঁড়ে যায়। সারা শরীর পিচের মত নিকষ কাল হয়ে যায়। মুখমণ্ডলের মাংস চেপে বসে যায়,

নরকঙ্কালের মত দেখায় ওসব মুখের আদল। মরণের ওপারের কোন প্রেতপুরীতে যেন হাওয়ার ঘায়ে এদিক থেকে ওদিকে হেলে যাচ্ছে। হাঁটতে পারে না। শরীরের রক্ত-মাংস-বল-বীর্য সব ঠিকাদারেরা শুষে নিয়েও তাদের নিষ্কৃতি দেয় না। সাইটের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ কঙ্কাল দিয়েই তারা মাটি কাটায়, পাথর কাটায়, গাছের গোড়া উপড়ায়, বারুদ দিয়ে বিরাট পাথুরে পাহাড় ফাটিয়ে মাঝখানে রাস্তা তৈরি করে। কিসের আশায়? কিসের নেশায়?

৬

দিনে রাতে, রাতে দিনে সময় বয়ে যায়, কি বার, কোন মাস, সেকথা কি আর মনে আছে কুলিদের? ঠিকাদারের কাজ শেষ করতেই হবে, যেমন করেই হোক।

প্রতিদিন সকালে জীবিত কঙ্কালগুলো সার বেঁধে মাটি কাঁটতে যায়। পাহাড়ের ধারে ধারে রাস্তা বাঁধার কাজ এগিয়ে চলে। কুলিদের বুকের রক্তঝরা মেহনতে রাস্তার কাজ এগিয়ে যায় তরতরিয়ে। ঠিকাদারের মুখে ধূর্ত শেয়ালের মত কেচকে হাসি ফোটে। কুলিরা হিসেব করে আর কত বাকি মরণের। হ্যাঁ, কুলিরা ওখানে মারা যায়। রাত্রিতে মশার কামড় খেয়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে গায়ে। বাদুড়ের মত বিরাট বিরাট মশার কামড় খেয়ে যে জ্বরে তারা পড়ে, অনেক সময় তাতেই হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক কাঁপুনিটুকু স্তব্ধ করে দিয়ে যায়। এমনি বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছি সন্দ্বীপের আউয়ালকে। উনিশ বছরের ডবকা ছেলে, কালীনাগের মত কাল গায়ের রং, এক মাথা কাল চুল। দাঁতগুলো ধুতরা ফুলের মত সাদা। শ্যামলা মুখের পেলব পেলব ভাবটুকু ছিল মায়াময়। মারা গেল। বেচারি একখানা কাফনও পায়নি। মাটি গর্ত করে তাকে সেখানে চিরদিনের মত শুইয়ে উপরে মাটি চাপা দিয়েছে তার সাথীরা।

যারা মরে তারা বেঁচে যায়। অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু যারা বেচে থাকে? তাদের অবস্থা? সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা দিন গড়ায়, আর এগিয়ে চলে রাস্তা বাঁধার কাজ। গতরের বলবীর্য শুষে নিয়ে পাহাড়ের কোল বেয়ে কাল নাগিনীর মত এঁকে-বেঁকে সামনের দিয়ে বয়ে যায়।

রাস্তা তৈরি হলে ঠিকাদারেরা লাখ লাখ টাকা পাবে। কিন্তু কুলিরা পাবে কি? আর কুলিরা কি খেয়েই বা এ রাস্তা বেধে যায়? আগেই তো বলেছি। ওরা ফেনমাখা ভাত খায়, আর খায় মশুর ডালের পানি। টমেটো, আলু ইত্যাদি তরিতরকারিও ঠিকাদারেরা অনেক সময় বিলাইছড়ি বাজার থেকে কিনে নৌকায় করে এনে স্টোরে মজুদ করে রাখে। কুলিরা স্টোর থেকে বাকিতে চাল-ডালের সঙ্গে তরিতরকারিও খরিদ করে।

সে আরেক কথা। বিলাইছড়ি বাজারের কেনাদরের পাঁচগুণ দাম আদায় করে নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে। টমেটোর দাম নেয় কুলিদের কাছ থেকে এক টাকা চার আনা, কুলিরা কিছুই জানতে পায় না, ঠিকাদারের কেরানি খাতায় হিসেব করে

রাখে। সব জিনিসের দাম এরকমই দ্বিগুণ, তিন গুণ, চার গুণ হয়ে থাকে। কুলিরা জানে না কিছু। যা লাগে দৈনিক স্টোর থেকে আনে। রান্না করে খেয়ে কোন রকমে হাড়সর্বস্ব শরীরগুলোকে সচল রাখে। পঁচিশ টাকা যে চালের মণ বিলাইছড়ি বাজারে, কুলিদের কাছে বাকি বিক্রি করার সময় তার দাম চল্লিশ টাকা, ছয় আনা সের আলুর দাম এক টাকা দেড় টাকা, এমনি করে টাকার হিসেবে খাতা ভর্তি হয়।

রিজার্ভড্ ফরেস্টের নির্বান্ধব অরণ্য। রাতে মশার কামড়। দিনে পোকা-মাকড়, অসহ্য হয়ে ওঠে দিনে দিনে। একটু ধোঁয়া না হলে তাদের চলবে কেন? সেজন্য তারা স্টোর থেকে বিড়ি ম্যাচ খরিদ করে। চার আনা দামের বিড়ি প্যাকেটে নেট বার আনা লাভ করে। এক একজন মানুষের দৈনিক এক এক প্যাকেট বিড়ির প্রয়োজন হয়।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কোদালে পা কেটে যায়, আংগুল ছেঁচে যায়। বারুদের আগুনে ফাটানো পাথরের পাহাড়ে হরহামেশা পাগুলো গুরুতরভাবে জখম হয়, এভাবে জখম হয়ে পড়ে থাকলে কন্ট্রাক্টরের রাস্তা তৈরি হবে না। সেকথা তারা বেশ ভালভাবে জানে। এজন্য প্রত্যেক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে একজন ইনজেকশন ফুঁরতে পারার মত হাতুড়ে ডাক্তার থাকে। আর থাকে নানাজাতীয় কিছু মিকশ্চার এবং ট্যাবলেট। এসব আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার পরে আর বসে থাকতে দেয়া হয় না। দু'আনা দামের একটা ট্যাবলেট কেউ খেলে পরে ঠিকাদারের কেরানি তার নামে ডাক্তার খরচ লিখে রাখে এক টাকা। হরদম চোট লাগছে কুলিদের হাতে গায়ে আর ডাক্তার খরচও বেড়েই চলছে। এতেই শেষ নয়, যারা একটু সুস্থ সবল তাদেরকে কন্ট্রাক্টরের চেলারা তাস জুয়া ইত্যাদি শেখায়। নগদ টাকা ধার হাওলাত দেয়। খেলায় হারলে ক'বছর রিজার্ভে থাকবে তাই নিয়ে বাজি ধরে। নতুন লোকেরা খেলায় হেরে যায় এবং রিজার্ভে থাকতেও বাধ্য হয়।

যারা এভাবে কাজ করে তাদের দৈনিক দেড় সের পরিমাণ চালের ভাত না হলে পেট ভরে না। সে অনুপাতে তরকারিরও প্রয়োজন। সারাদিন পাহাড়ে পাথর কেটে বাসায় এলে পরে তখন তাদের দু'একটা ট্যাবলেটেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কুলিরা কিছুই জানে না, শুধু ঠিকাদারের স্টোর হতে প্রয়োজনের সময় কেরানিকে দিয়ে লিখিয়ে যা লাগে তাই নেয়। ঠিকাদারের হাতুড়ে ডাক্তারকে রোগির শরীরে ইনজেকশনের বিনিময়ে ডিস্টিল ওয়াটার ইনজেক্ট করে দিতে দেখেছি। এক একটা পেনিসিলিন ইনজেকশন যেগুলোর দাম বড়জোর এক টাকা কিংবা বার আনা সে রকম একটা ইনজেকশনের খরচ লিখে রাখে রোগির নামে কমসে কম চার পাঁচ টাকা।

এমনি করে সুখে-দুঃখে সাইটের কাজ শেষ হয়ে আসে। ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের কর্মচারীকে কাজ বুঝিয়ে দেয়। কুলিরা হাড় জিরজিরে শরীরখানা নিয়ে হলেও দেশে যেতে পারবে ভেবে মনে মনে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

তারপর বলে হিসেব নিকেশের পালা। ঠিকাদার মিথ্যা কথা বলে না। ঝুপড়িঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে যে হিসেবে রোজকার মাইনে দেওয়ার কথা ছিল তাই দেয়। দিনে চার টাকা ধরে। সর্বমোট কোন কুলি যদি চার মাস কাজ করে সে ঠিকাদারের কাছে পাওনা হবে চার শ' আশি টাকা। এরপরে ঠিকাদার নিজের পাওনার হিসেব করে। চালের দাম কাটে প্রতি মণ চল্লিশ টাকা করে। ডালের দাম কাটে সের আড়াই টাকা। বিড়ির দাম এক টাকা প্যাকেট। এছাড়া তেল, হলুদ, তরিতরকারি সবগুলোতে ইচ্ছামত দাম ধরে। হিসেবের পরে দেখা যায়, ঠিকাদারের কাছেই প্রত্যেকে বিশ পঁচিশ টাকার বাকিদার হয়ে পড়েছে। ঠিকাদার দুর্বল অক্ষমদের অনেক সময় পথভাড়া দিয়ে দয়া করে। কি বিচিত্র দয়া! তারপরে শক্ত সবলদেরকে নিয়ে নতুন সাইটে লাগিয়ে দেয় কাজে। কুলির আড়কাঠিদেরকে প্রতিরোজ মাথাপিছু চার আনা করে কমিশন বুঝিয়ে দেয় ঠিকাদার। ঠিকাদার লাখ টাকা পেলে আড়কাঠি পায় হাজার টাকা। আবার তারা শহরে এসে বসে। ভাই বন্ধু ডেকে মানুষকে ভুলিয়ে আবার ঝুপড়ি ঘরে তোলে। আবার চালান দেয় লঞ্চে করে কর্ণফুলীর উজানে—যেখানে বন্যজন্তুরা বাস করে না, মগ-মুরংয়েরা যায় না সেই নিভৃতিতে। মানুষগুলো কি হারিয়ে আসে সেকথা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে খুবই সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষে দেশের মানুষের চোখের সামনে আমরা শুধু একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই তা হল আর কতকাল চলবে এ বীভৎস অত্যাচার? আর কতকাল?

সংবাদ, ১০-৩০ জানুয়ারি, ১৯৬৫

অচলায়তন

কাঁচা চোরেরা পাকা চোরের তালিম পায় জেলখানায়। জেলখানা থেকেই ছিঁচকে চোরেরা কোর্টের নির্ধারিত ট্রেনিং অন্তে বেরিয়ে আসে সিঁদেল চোর হিসেবে। কেমন করে তা-ই আমার এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের আলোচনার বিষয়।

কলা চুরি, মুলা চুরি, খুন, রাহাজানি, জালিয়াতি যে কেসেরই আসামী হোক না কেন, কেউ স্বেচ্ছায় আসে না জেলখানায়। সাধারণের ধারণা, স্মরণাতীত যুগ হতে এ জেলখানা চোর-চামারদের কোল দিয়ে সমাজের শান্তি প্রিয় লোকদের প্রভূত উপকার করে আসছে। আগের কথা জানিনে। তবে বর্তমানের জেলখানা যে সমাজের পক্ষে একটি বিষাক্ত ক্ষত বিশেষ সেকথা বলাই বাহুল্য।

রোগ হলে মানুষ স্বেচ্ছায় হাসপাতালে যায় রোগ সারাতে। চুরি, ডাকাতিও মানুষের স্বভাবজাত রোগ। এ স্বভাব রোগের জীবাণুর মত মানবচরিত্রের গভীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি করতে বাধ্য করায় এবং সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মত খুবই শিগগির ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষের এ সংক্রামক স্বভাবের প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করার খাতিরে সুদূর অতীতের সমাজপতিরা জেলখানা তৈরি করেছিলেন। ইতোমধ্যে পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক দূর। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহে কিভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট না হয় সে সম্পর্কে জোর তদবির শুরু হয়েছে। অভাবে স্বভাব নষ্ট। একথা এদেশে নয় সে দেশেও। শুধু এ যুগে নয়, সে যুগেরও একান্ত সত্য কথা। সত্যিকার অর্থে মানুষ যদি মানুষ হিসাবে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা পায় তাহলে স্বভাব নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবীতে মানুষ চায় একমাত্র বেঁচে থাকতে। বেঁচে থাকতে গেলে তাকে কিছু একটা করেই বেঁচে থাকতে হবে। এই কিছু একটা করার সুযোগ যখন সে পায় না তখন সে সদর রাস্তা ছেড়ে চোরাগলির অন্বেষণ করে। সমাজের বিধি-নিষেধের অর্গলে তার চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না, সেজন্য বাঁকা পথে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ বিকৃতি যখন মানসিক হয় তখন মানুষ পাগল হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সমাজের মানুষ ধরে বেঁধে পাগলকে চিকিৎসার জন্য পাগলা গারদে পাঠায়। স্বভাবের বিকৃতি ঘটলে পরেও অনেকে আবার সমাজে বাস করে। কিন্তু সে বিকৃতি যখন অন্য মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় তখন সে মানুষ গ্রহণ করে আদালতের আশ্রয়। আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে পাঠান হয়

জেলে। খুন করা, চুরি করা, জাল-প্রতারণা, জুয়া-চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি স্বভাবের মধ্যে কোনটাই মানুষের আসল মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে না। সেজন্য এরা সমাজে বাস করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কেননা মানুষের সমাজে বাঁচতে হলে একমাত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কিছুকে অবলম্বন করে বাঁচার কথা একরকম অকল্পনীয়। এসব বিকৃত স্বভাবের মানুষের ছোঁয়াচে প্রভাব থেকে সমাজের আর আর মানুষদের রক্ষা করবার জন্যই জেলখানার প্রতিষ্ঠা।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জেলপদ্ধতি আমাদিগকে বর্ণিত সংক্রামক স্বভাবগুলো থেকে কতদূর নিরাপদে রাখতে পেরেছে তা বিচার করার সময় আমাদের সামনে সমাগত। যেহেতু পৃথিবী এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। প্রগতির এ চলমান ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেরকে সমাজের কথা, দেশের কথা ভাবতে হবে, সমাজ বলুন, রাষ্ট্র বলুন, সবই তো মানুষ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকটি জীবন্ত মানুষ আপন আপন রাষ্ট্রের এক একটি ইউনিট বা একক। তাই আমাদের জনসমষ্টির কোন সম্প্রদায় কি করছে না করছে সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি এবং সে সঙ্গে দরদ যদি পরিকল্পনা প্রণেতার না থাকে তাহলে সে পরিকল্পনায় সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কখনো বয়ে আনবে না। তখন আপনারা বিচার করুন। যারা জেলে যায় তারাও আমাদের দেশের মানুষ। বলতে গেলে মানুষই তো রাষ্ট্রের একমাত্র না হলেও অন্যতম মূলধন। শুনেছেন কি কেউ কখনো দশ বছর জেল খাটার পরও কোন চোর সাধু হয়েছে। দুয়েকজন হলেও হতে পারে। কিন্তু আমি বলছি শতকরা পঁচানব্বইজনের কথা। জেলখানা এ পঁচানব্বইজনের ট্রেনিং সেন্টার। কেমনে তাই বলছি। আমাদের দেশে পাকাবাড়ি অথবা মোটরগাড়ির সংখ্যা বেড়েছে বলে অভাব ঘুচেনি। অর্থনৈতিক অন্তর্দাহ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে দিনের পর দিন এবং সে সুযোগে পয়সাওয়ালারা আরো পয়সাওয়ালা হচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে চলছে জনসংখ্যার হার, জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের মাত্রাও বাড়াতে হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে এবং সেসব যন্ত্র নিজের দেশের বিশেষজ্ঞগণ নিজেদেরই কারখানাতে তৈরি করেছেন। যন্ত্রের সাহায্যেই ওসব দেশে প্রায় সবরকমের কাজ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যন্ত্র হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিলাস অথবা শোষণের উপকরণ। কথাটাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হলে, ধরুন, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা যন্ত্রে কার্যকরণশক্তিকে অনেকটা অলোকিত দৃষ্টিতে দেখে। সে সুযোগে ক'জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদেশ হতে কলকব্জাদি আমদানি করে উৎপাদনের খাতিরে নিয়োজিত করেছে। মেসিনের কাজে আমাদের মানুষেরা যে শ্রম দিয়ে থাকে তা তাদের ললাটে কুলি মজুরের দিনগত পাপক্ষয় করার সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। পুঁজিপতিদের মূলধন বাড়ছে। তারা আরো নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করছে। কুলি-মজুরেরা থাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। পরিশ্রম করে হাড় ভাঙ্গা। বেঁচে

থাকা হল তাদের কাছে অনেকটা অপরাধ। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এরা খুবই অল্পদিনের মধ্যে হারিয়ে ফেলে। অথবা বলা যায় মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা কলে-কৌশলে তাদের হৃদয় হতে কেড়ে নেয়া হয়। তখন তাঁদের স্বভাবের মধ্যে বিকৃতি আসে, অনুন্নত দেশসমূহের শিল্প এলাকার মধ্যেই অপরাধ প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যকের অপরাধ যখন তথাকথিত সুখী মানুষদের জীবনে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটায়, তখনই তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয় কোর্টে এবং কোর্টের বিচারে জেল খাটে।

সমাজের মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা বাড়ছে ততই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা এবং অপরাধীদের গুটিকয়েককে ধরে জেলে পাঠান হয়। অপরাধীকে জেলে পাঠানোর পেছনে কোন যুক্তি যদি থাকে তাহলে এ হতে পারে যে, সাধারণ মানুষদেরকে ওদের ছোঁয়াচে স্বভাব হতে রক্ষা করার নিমিত্তেই জেলখানার সৃষ্টি। কিন্তু সত্যি কি, ওদের স্বভাব বিকৃতির সংক্রামক রোগ হতে সমাজ রক্ষা পায়? পায় না। একেকটি জেলখানা বছর বছর জন্ম দিচ্ছে শত শত অপরাধীর।

ধরুন, একটি বার বছরের ছেলে পয়লা পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়ল। পকেট কাটার অপরাধে তার তিন মাস জেল হল। তিন মাস পরে যখন সে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন বেরিয়ে আসে একদম দাগী হয়ে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ, ১৯৬৫

আমাদের সংগ্রাম কি এবং কেন

জীবনে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করতে হয়। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য জীবনীশক্তি অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রাম। সংগ্রামের পালা যার শেষ হয়েছে পৃথিবী তাকে বিদেয় দিয়েছে, অর্থাৎ জীবন্তদের মধ্য হতে বাদ পড়ল তার নাম। যেসব করিৎকর্মা পুরুষদের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের যুক্ত করকপালে উঠে আসে তাঁদেরকে আমরা বলে থাকি সার্থকাম পুরুষ। এই সার্থকাম পুরুষদের বিরাট সৃজনী প্রতিভার কাছে মৃত্যুভীতি আর সব মানুষের অক্ষমতা শ্রদ্ধার আকারে ঝড়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ তাদেরকে ক্ষণজন্মা, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ভয়ার্ত অন্তরের ভীরু পিপাসার স্বাদ মিটায়।

অথচ সব মানুষই সমান। শিক্ষা এবং সুযোগ সে সঙ্গে উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে অনেকে অনেক কিছু করতে পারে, যা সাধারণের দৃষ্টিতে রীতিমত প্রতিভাবানের কর্ম। প্রতিভাবান এবং সাধারণের মধ্যে সত্যিকার কোন তফাৎ নেই; তফাৎটা শুধু চিত্তবৃত্তি এবং সৃজনীশক্তির উৎকর্ষতার। মানুষের সৃজনীশক্তি সব সময়ই মানুষকে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার দ্বারদেশে টেনে নিয়ে যায়— এ কেন এমন হল, কি করে এমন হয় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরের তাগিদে সারাজীবন নিয়োজিত করেন। জীবনের জিজ্ঞাসার কি অন্ত আছে? জীবনের অনুরাগভরা সব উষ্ণ মুহূর্তগুলো বিলিয়ে দিয়েও একজন যা ভাবেন তার কিয়দংশ মাত্র বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারেন। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ভাবনার কিছুরই বাস্তবায়ন হয়ে ওঠে না। অনেক সময় সাধককে অকালে মৃত্যু এসে চুরি করে নিয়ে যায়। মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সাধারণ মানুষ যখন কবরের ভয়ে কবরের সড়ক তৈরি করে, জীবনসাধকেরা মৃত্যুকে ধ্রুব নিশীথে জেনেও জীবনের পথে অগ্রসর হন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। গ্রিসীয় বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মাটিতে নক্সা আঁকার সময় উন্মত্ত জনতার হাতে নিহত হওয়ার আগে জোড় হাতে অনুরোধ করেছিলেন, Kill me, but not my figures (আমাকে হত্যা কর, কিন্তু আমার নকশাগুলো বিনষ্ট কর না)।

এরই নাম জীবনের পথ। যে মহাজিজ্ঞাসার কলি জীবনীশক্তির তোড়ে অন্তরে কাঁপছে তার কিছুটা সমাধান পথের ধুলোতে লিখে রাখলাম, তা তোমরা বিনষ্ট কর না— এ তোদেরই সম্পদ।

উপযুক্ত বিশেষণের অভাবে আধুনিক জগতকে মানুষের সপ্তদিনের সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আধুনিক জগত তাঁদেরই সৃষ্টি যাঁরা জীবনের সমস্ত

আকাঙ্ক্ষা দিয়ে বস্তুজগতের গভীরে প্রবেশ করে প্রয়োজনের তাগিদে তাকে ভেঙ্গেচুরে নতুন রূপ দিলেন। আধুনিক জগত প্রকৃত প্রস্তাবে ক'জন স্থপতির অন্তরের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। জগতের আর সব মানুষের মধ্যে মাত্র অল্প ক'জন এদের বিচিত্র সাধনার দর্শক মাত্র, মাঝে মাঝে তারা ক্রিকেট খেলার দর্শকের মত হাততালি দিয়ে ওঠে। এছাড়া আর সব মানুষ নিস্পৃহ পদ্ধতিতে গতানুগতিকতার মধ্যদিয়ে বেঁচে থাকার দিনগত পাপক্ষয় করে বেড়ায়। আমাদের দেশের তো কথাই নয়, ইউরোপ-আমেরিকারও শ্রদ্ধেয় ক'জন ছাড়া বাকি মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবর্জিত বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বৈজ্ঞানিকেরাই একক সাধনায় মানুষের সম্মুখে মেলে ধরেছেন সম্ভাবনার এক উদার দিগন্ত। এখন পৃথিবীর মানুষ মহাবিশ্বের পানে তার সৃজনীশক্তির পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে উড়াল দিচ্ছে। আজকে না হোক, কালকে না হোক, অদূর ভবিষ্যতের যে কোন একদিন মানুষ পৃথিবীর সংকীর্ণ দিগন্তের মায়া কাটিয়ে এক বিশাল, বিরাট আপাত অকল্পনীয় বিশ্বের আলোকে তার অন্তরের চেতনাকে ঝালিয়ে নিতে সমর্থ হবে।

এই তো গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষেরও কি নেই কর্তব্য কোন? বিজ্ঞানের নব নব বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা সবকিছু বস্তুবিশ্বের সঙ্গে যদি না যাচাই করা হয় তাহলে সে বিশেষ আবিষ্কার শ্রেণীবিশেষের হাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণী, যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ তারা শোষণের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে দু'টি শ্রেণীর মধ্যে একটি মানবেতর এবং অপরটি অতিমানবিক পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা শুরু করে। অথচ দু'টোর কোনটাতেই মানুষের আসল সত্তার বিকাশ হয় না। সে কারণে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দু'শ্রেণীর একটিরও আয়ত্তের মধ্যে আসে না। মানুষকে পৃথিবীতে বাস করতে হলে একমাত্র মনুষ্যত্ব সম্বল করেই বাঁচতে হবে। শক্তিশালী পশুরাজের মত দুর্বলদেরকে হত্যা করে, ধ্বংস করে, উৎখাত করে কোন জাতি চিরদিন বাস করতে পারে না। অত্যাচারের কংসকারায় অত্যাচারিত লাঞ্ছিত সমাজ থেকে জন্ম নেয় অনুরূপ পাশবিক শক্তিসম্পন্ন বিদ্রোহী মানবশিশু। শান্তির সংঘাতে শক্তির পরাজয় জয়। মানবেতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো শক্তির নগ্ন প্রতিযোগিতা এবং প্রতিহিংসার দূরপনেয় কলঙ্কে ভরপুর। পৃথিবীর যে ইতিহাস আমরা পড়ি তাতে লোভ, ক্ষোভ, রক্তপাত এবং প্রতিহিংসার শিখা ছাড়া মনুষ্যত্বের কোন উদার ললিত বাস্তব কোন আবেদনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ একরকম মেলে না বললেই চলে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, True future can only be built upon real past (প্রকৃত অতীতের উপর ভিত্তি করেই সঠিক ভবিষ্যৎ রচনা করা হয়)।

আমাদের সামনে মানবজাতির যে ইতিহাস খোলা আছে তাই যদি আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস হয় তাহলে একজন পাগলও বলতে সমর্থ হবে যে, বর্তমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো অলীক মায়া, ঠিক তেমনিভাবে বৈজ্ঞানিকের মহাশূন্যে উধাও হবার আকাঙ্ক্ষা তার একটা পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়া আর কোন কিছু নয়।

তবে সুখের বিষয়, অতীত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য না করলেও ইতিহাসের যে অনেকগুলো গলি-ঘুঁজি এবং বারান্দা ছিল, যার কথা বলা হয়নি তার সন্ধান মানুষ পেয়ে গেছে। তার নামে বিশেষ ক'জনের লোভ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি মানবেতর প্রবৃত্তি গোটা দেশ, জাতিকে সংক্রামিত করে অপর দেশ, অপর জাতির প্রতি লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষের সৃজনীশক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে আপন ভাই মানুষেরই বিরুদ্ধে। জয়-পরাজয়, হিংসা-প্রতিহিংসা, তলোয়ারের ঝিলিক রক্তের স্রোত, কামানের আগুনের অন্তরালে যে মানুষের হিংসা দেদীপ্যমান, তারা উভয়েই যে মৌলিকভাবে একই জিনিস কামনা করে, যুদ্ধের বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা তারা আরো নিবিড় করে পেতে পারে মানুষের থেকে, মানবতার সে দিগন্তের গতিপথে সবসময় রচনা করা হয়েছে বাধার বিন্ধ্যাপর্বত।

একেকটা মানুষের যা চাওয়া একেকটা জাতিরও ঠিক তাই চাওয়া। মানে, খেয়ে-পরে, সুখে-সন্তুষ্টিতে মানুষ হিসেবে জীবনধারণ করা। প্রকৃতি যখন বাধ সাধল তখন তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য যেখানে জীবনসংগ্রাম অপেক্ষাকৃত সহজ দলবদ্ধভাবে আক্রমণকারী হিসেবে হাজির হল। এইভাবে শুরু হল পরদেশ, পররাজ্য আক্রমণ করে সে দেশের মানুষকে দাস করে, সে দেশের সম্পদ ছিনিয়ে এনে সুখে সন্তুষ্টিতে দিন যাপন করার পদ্ধতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাই-ই ছিল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য। মানুষকে স্থানীয়ভাবে দাস করে রাখার জন্য তারা বিজ্ঞানকে নিল সহায় হিসেবে। আবিষ্কার করল নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, শক্তির দাপটে এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোকে তারা পদানত করে রাখল এবং নিজেরা সেসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যদৃচ্ছা ভোগ করতে লাগল, হয়ত আরো ভোগ করতে পারত, কিন্তু সংঘাত সৃষ্টি হল নিজেদের মধ্যেই। এক জাতির যেমন অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আছে, আরেক জাতির ভাণ্ডারেও ঠিক তেমনি আছে। সে কেন সমান শেয়ার পাবে না? সে কেন একইভাবে অনুন্নত দেশের মানুষকে শোষণ করবে না? তাই শুরু হল মহাযুদ্ধ। এর ফল তো সকলেরই জানা— চক্রশক্তির পরাজয় মিত্রপক্ষের জয়লাভ।

এর পরোক্ষ ফলাফল হল আফ্রিকা এশিয়ার জনসাধারণের চেতনায় তুমুল আলোড়ন, তারা দেশের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াল, বিদেশের সমগ্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করে নিজের দেশের মাটিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করল, তাদের আত্মাহুতি, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং প্রখর দেশপ্রেমের সামনে অত্যাচারী শক্তি বেশিদিন টিকে থাকতে পারল না, বাধ্য হল পাততাড়ি গুটাতে। নবজাগ্রত দেশগুলোকে স্বাধীন স্বীকার করে নিয়েও তারা ভুলতে পারল না তাদের লোভ। তাই তারা অন্যভাবে এসব দেশকে তাদের মুখাপেক্ষী করে রাখবার চেষ্টায় রাতারাতি সচেষ্ট হয়ে উঠল। আরেক উপায় এরা দেশের সমস্ত নাগরিককে শিক্ষা, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির দিক দিয়ে চিরদিনের মত পঙ্গু করে রাখতে চাইল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন জাতি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, সেজন্য সদ্য

স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিপুঞ্জকে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করার জন্যে খেয়ে, না-খেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল। নিজেদের স্বার্থে দেশের একদল প্রভাবশালী লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় মন দিল। এসব পৃষ্ঠপোষকেরা কখনোই দেশপ্রেমিক ছিল না। বিদেশি শাসনামলে বিদেশি শক্তির পা চেঁটেছে, দেশের লোকের মুখের গ্রাস বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছে। সেজন্য বিদেশি সরকার তাদেরকে ইনাম খিলাত দিয়ে সন্তুষ্ট করেছে। বিদেশিদের উৎখাতের ফলে দেশে খাওয়া-পরার দাবিতে যখন ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হল এখন এরা বিদেশি সরকারের শরণাপন্ন হল। বিদেশিরাও দেখল যে, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হলে এ শ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতা করা একান্তই প্রয়োজন। তাই স্বদেশের সুবিধাবাদী এবং বিদেশের অত্যাচারীদের মধ্যে স্থাপিত হল সখ্যতা, স্বদেশ-বিদেশের এ অশুভ আঁতাতের মূল উদ্দেশ্য হল দেশের জাগ্রত গণশক্তিকে দাবিয়ে রাখা, দেশের যারা মাটির সাক্ষাৎ সন্তান তাদের দাবি যদি অবদমিত হয়, তাহলে বিদেশি সরকারের এজেন্ট হিসেবে কদর্যপুঁজিবাদের মাধ্যমে সমগ্র জনগণকে একচ্ছত্রভাবে এ শ্রেণী শাসন-শোষণ দুই-ই চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু গণশক্তি বসে রইল না, তারা জোর আন্দোলন শুরু করল। এ আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য তারা সম্ভাব্য সকল রকমের উপায় উদ্ভাবন করল। বিদেশি অত্যাচারীদের হাত হতে ক্ষমতার বিনিময় হয়েছিল স্বদেশি পুঁজিবাদীদের হাতে। তাই তারা সামরিক শক্তির সাহায্যে নব নব অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জেলে পুরে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে, ধর্মের নামে বস্তাপঁচা প্রাগৈতিহাসিক সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে নিজেদের আসল অটুট রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, প্রয়োজনবোধে বিদেশি শক্তিরও সাহায্য নিল। বিদেশি সরকারও জানে যে, যদি এদেরকে সাহায্য দিয়ে কোন রকমে টিকিয়ে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এসব দেশের জনগণকে আরো অনেকদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে রাখা যাবে। তাই এদের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করে অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে সৈন্যসামন্ত পর্যন্ত সাহায্য দিতে এগিয়ে এল। ভিয়েৎনামের জনসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ক্ষতিটা কিসের? মার্কিন সরকার কেন বোমা বর্ষণ করে আক্রমণকারীর কলংক মাথা পেতে নেবে? বিশ্বের জনমত সম্পর্কে কি মার্কিন সরকার সজাগ নয়? খুবই সজাগ। শুধু মার্কিন কেন; ইঙ্গ-মার্কিন এবং পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ বিশ্বের জাগ্রত গণমতকে, গণঅধিকারকে চাপা দেয়ার জন্য আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে লাওস, ভিয়েৎনাম, ফরমোজা, সাইপ্রাস, কাশ্মির, ইসরাইল ইত্যাদি বিষফোড়ার সৃষ্টি কেন করে রেখেছেন?

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমাদের জনগণের সংগ্রাম কিসের তা যদি কোন দেশপ্রেমিক সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে চান তাহলে ভাবনায় অবশ্যই আমি আহ্বান করব। পয়লা থেকে শুরু করা যেতে পারে মানুষ সংগ্রাম করে কেন? একটা জাতি সংগ্রাম কেন করে? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল বেঁচে থাকার জন্য। সুতরাং আমরাও

চাই যে, আমাদের জাতি বেঁচে থাকুক। কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে থাকা চাই একটা জীবনের লক্ষণ, তা যদি না হয় তাহলে আমাদের অতীত আর বর্তমানের মধ্যে ফারাকটুকু কোথায়? বিদেশির অধীনে থাকার সময় আমরা যেমন ছিলাম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের পরও যদি সে একই খাতে বয়ে যায় আমাদের জীবনধারা তাহলে স্বাধীনতা কি কাজে এল আমাদের? এটা সকলেরই একটা জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

জাতি অথবা দেশ বলতে যা বুঝায় তার সবটুকুই তো দেশ এবং দেশের মানুষ। এখন আমাদের নির্মোহদৃষ্টিতে দেখার সময় এসেছে দেশের মানুষের কতটুকু অধিকার সূচিত হয়েছে। দেশের মাটিতে দেশের মানুষের যদি কোন অধিকার না থাকে তাহলে সরকারি প্রচারযন্ত্রে যতই উচ্চকণ্ঠে উন্নয়নের খসড়া আবৃতি করুক না কেন, সত্যিকারভাবে আমরা যে পশ্চাদগামী এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আধপেটা খেয়ে জীবন কাটায়, এটা খুবই সত্য কথা। অধিকাংশের পরণের বস্ত্র, থাকবার ঘর, নিজেকে চিনবার শিক্ষা নেই, এটাও সত্য কথা। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে গুটিকয়েক বিদেশির বদলে গুটিকয়েক স্বদেশি। তাদের অনেকে ইতোমধ্যে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠেছে। জনগণের মাথাপিছু বরাদ্দ যা হওয়া উচিত ছিল তার সিংহভাগই এদের হিসেবে জমা হয়েছে। সমগ্র দেশের অর্থনীতি গুটিকয়েক বণিকের হাতে কুক্ষিগত হওয়া এটা আমাদের মত দরিদ্র দেশের কক্ষণো সুলক্ষণ নয়।

এরপরে আসে বৈদেশিক প্রভাবের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধনিক-বণিকেরা দেশের মানুষের স্বার্থের তুলনায় নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থকে বেশি করে দেখছে এবং নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য উপনিবেশবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। কঙ্গো, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশের দিকে পূর্বাপর একটু ভেবে দেখেন তাদের কাছে এ ব্যাপার অস্পষ্ট নয়। আমাদের মত সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত অন্যান্য দেশগুলোর ধনিক-বণিক সাম্প্রদায় নিজেদের দেশ এবং দেশের মানুষের স্বার্থকে নিজেদের লাভ-লোভের পরোয়া করে না, তাহলে আমাদের দেশে তারা সৎ হবে কেমন করে?

সংবাদ, ৪ এপ্রিল, ১৯৬৫

গণসাহিত্য প্রসঙ্গে

যাঁরা খুব বেশি রসের সরবরাহ করেন, গণ-সাহিত্যের নামে তাঁরা চমকে উঠেন। এটাই স্বাভাবিক তাদের পক্ষে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে চিত্রিত করলে অন্তরের রসের পুঁজি শেষ হয়ে যাবে এ ভাবনাই তাদের কাছে প্রধান। ফলত তাঁরা অসার বাক্যের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান করেন। জীবনের বিকৃতিটাকেই বড় করে দেখেন, জীবনকে নয়। ধীরে ধীরে একধরনের ইচ্ছা অন্ধতার অন্ধকার আমাদের লেখককুলের চেতনাকে গ্রাস করতে বসেছে। কেন এমন হল, এ প্রশ্নের উত্তর কোন লেখক বিশেষের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তিনি হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে নানাকথা বলবেন, সাহিত্যের বড় বড় মহারথীদেরকে তাঁর স্বপক্ষে টেনে আনবেন। এমন নির্ভীক প্রত্যয় নিয়ে অন্তরঙ্গভাবে আপন সাফাই গাইবেন যে, অনেক বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান মানুষকেও ধাঁধায় পড়তে হবে; কিন্তু কাউকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মধ্যে শক্তি কিংবা সৌন্দর্য সঞ্চারিত হলেও সাধারণত তাতে দু'টি প্রধান উপাদানের অভাব থাকে। সে উপাদান দু'টি হল সত্যতা এবং সরলতা, শিল্পী যদি জীবনের পানে সহজ চোখে চাইতে না শিখল, তাহলে জীবনের কতটুকুই দেখতে পেল। জীবনের ব্যাপকতা এবং গভীরতা সম্বন্ধে কোন ধারণা না দিতে পারাই তো শিল্পীর কাছে চরম চরিত্রহীনতার ব্যাপার। এখন আমাদের পূর্ববাংলার সাহিত্যে এ চরিত্রহীনতা বড় বেশি উলঙ্গভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে।

এ উলঙ্গতা কেন? কেন মানবচরিত্রের রহস্য উৎপাটনের নামে ব্যক্তি বা দল বিশেষের এ স্থূল পরিচয় জাহির করা? অসিহষ্ণু না হয়ে যুগের শিরায় হাত রেখে, ধীমান চিকিৎসকের মতন যুগকে যদি কেউ বিচার করতে চান, তাঁর সবগুলো জবাব অবশ্যই পেয়ে যাবেন। বস্তুত আমরা এক অসুস্থ যুগে বাস করছি। কেননা পুরনো মূল্যবোধগুলো ভগ্নাংশ হতে হতে তখন প্রায় বায়বীয় অবস্থায় এসে ঠেকেছে। যে বিশ্বাসে আগের জীবনধারা আবর্তিত হত, আমাদের যুগে তার বিত্তবিশেষ স্থূল আদর্শের প্রাণহীন, যান্ত্রিক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বাসই হল জীবনের চালিকাশক্তি, কিন্তু আমাদের জীবনের মর্মমূলে স্পন্দিত বিশ্বাসের অজেয় শিখা কই? আমরা কিসে বিশ্বাস করি? ধর্মে? ভগবানে? স্বর্গে? বোধহয় কিছুতেই না। পেশার খাতিরে যাদের বিশ্বাস করতে হয় তাদের কথা আলাদা। দশটা পাঁচটা অফিসের মত এটাও তাদের একটা চাকুরি। জীবিকার উপায়ের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের মন বাঁধা

পড়ে। এ আবদ্ধ মনের প্রাচীরের চারপাশে যদি সংস্কার জমাট বাধে, এক কুসংস্কারকে বিশ্বাস মনে করে মানুষ, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার খুব বেশি অবকাশ নেই। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং অনেক বেশি গভীর। তার দৃষ্টির রেখায় যদি প্রাণময়তা দীপ্ত হয়ে না ওঠে তিনি সংশয়বাদী হবেন; যদি একেবারেই প্রাণের সন্ধান না পান, সংশয় থেকে নৈরাজ্যের নিখিল নাস্তিতে তাঁর মনের উত্তরণ ঘটবে। বাস্তবে আমাদের সাহিত্যে হচ্ছেও তাই। এর কারণ আমাদের অর্থনীতি, আমাদের রাজনীতি, আমাদের সামাজিক অস্যাম্য এবং আমাদের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার অভাব। চারদিকে অসুস্থতার হাওয়া এমন প্রবল যে, শিল্পীর মানসিক চরিত্র রক্ষা করা রীতিমত দুরূহ সাধনার বিষয়। খাঁটি শিল্পী হতে হলেও দুরূহ সাধনার প্রয়োজন। মনের একমুখিতা লেখকের এক পরম সম্পদ। আমাদের লেখককুলের মধ্যে সে একমুখিতার অভাব ঘটেছে। ফলে লেখকরা বাচাল হয়ে উঠছে দিন দিন। দৈনন্দিন নীচতা দুষ্ট জীবন আমাদের লেখকদের। ভালমন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা ক্রমশ লোপ পেতে চলেছে। লেখক যদি কুমারীমনা হয়ে কোন বিষয়কে ভালবাসতে না পারেন, তিনি লিখবেন কি? তাঁর যদি কোন আদর্শ না থাকে তাহলে তাঁর দুঃখের অভিজ্ঞতা কিসের হোমাগুণে পুড়ে মানুষের কাছে সত্যের মডেল হয়ে দেখা দেবে?

আমরা আদর্শের কথাই বলছিলাম। লেখকের একটা আদর্শ থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ভাল লেখক হতে গেলে আদর্শের নামে অনেকে চমকে ওঠবেন। চমকে ওঠারই কথা, কেননা আদর্শের বীজ মনের ভেতর চারিয়ে সৃষ্টির সোনার ধান ফলানো যেনতেন প্রকারের একখানা বই লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করে দু'পয়সা ফাকতালে আয় করার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন এবং কঠোর শ্রম অধ্যবসায়ের কাজ। আদর্শকে এখন লেখক আঁকড়ে ধরছে না কেন? এর সোজা জবাব এককথায় দেয়া যায়, আমাদের লেখকরা অশিক্ষিত বলে। আমি মগজ দিয়ে, মজ্জা দিয়ে, অস্থি দিয়ে, মাংস দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, অভ্যাস দিয়ে কোন কিছুকে আয়ত্ত করার গুরু অথচ আনন্দিত দায়িত্বকেই শিক্ষা বলতে চাচ্ছি। এ শিক্ষা হচ্ছে না কেন? শিক্ষার পরিবেশ নেই যেহেতু চিন্তার দিগন্ত খুবই সংকীর্ণ। আমাদের সংকীর্ণ দিগন্তের মধ্যে আমরা বাস করছি বলে নিজেদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করতে পারিনে। নিজের ক্ষুদ্রতা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভব করতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তার শিখায় তলদেশ অবধি অনুসন্ধান করে আমরা বিশ্বাসগুলোকে পরীক্ষা করে দেখত পারব না। নিজের ভেতরে কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত আপেক্ষিকতার অনুভব না করে লেখক কিভাবে যুগ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সামাজিক মানুষকে বিশ্লেষণ করতে পারবে। এ আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে লেখক যখন অনুভব করেন, আমি জীবনের একটা সত্যে উপনীত হয়েছি, তখনই তার ভেতরে একটা আদর্শবোধের অঙ্কুর জেগে ওঠতে পারে। আদর্শ হল সামাজিক জীবনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখার ফল, জীবনের ভেতর থেকেই গজিয়ে উঠে। বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া কিছু নয়। একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তবীজ থেকে যে

অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছিল আমাদের সাহিত্যে, অনাদর অবহেলা উপেক্ষার খরায় তা কেমন করে শুকিয়ে গেল সমগ্র পূর্ববাংলার সংস্কৃতির জন্য সে এক বেদনা মথিত দুঃসংবাদ। তার মূল্যের তালাশ করলে সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতিতে, রাজনীতি ছেড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রজ চিন্তায় আমাদের নেমে আসতে হয়। কিন্তু তার ফলে একটা লাভ হয়েছে। আমরা গোটা কতেক সাহিত্যের অফিসারকে সংস্কৃতির পুরোভাগে ইমাম হিসেবে পেয়েছি। তাঁরা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ভোঁতা জবানে প্রভুতুষ্টির খোতবা পাঠ করে ওপর থেকে বাহবা এবং নিচের থেকে শ্রদ্ধা দুই-ই দাবি করেছেন। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অত বাজে জিনিস নয়। স্বভাবতই তাঁরা রুষ্ট হয়েছেন, যে তরুণদেরকে হাতে ধরে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আদর দিয়ে, মমতা দিয়ে টেনে আনবেন এমন কথা ছিল ন্যায়ত। তাদেরকে পাঁয়ে ঠেললেন। এর জন্য পূর্ববাংলার সংস্কৃতি অনেকটা বলতে গেলে বন্ধ্যাই রয়ে গেল। তাতে তাদের সুবিধা হল আরো বেশি। নিজের ঢাক কাঁধে বয়ে পেটাবার ভয়ানক একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। চাকুরির নিরাপত্তা এবং শিরোপার মধ্যে সাহিত্যযজ্ঞের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করলেন। আজকে যারা আমাদের সংস্কৃতি সাহিত্যে বেশ হাঁকডাক ছাড়ছেন ভবিষ্যতের পূর্ববাংলার সংস্কৃতির নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখক ফুট নোটেও তাঁদেরকে স্থান দিতে ঘৃণা বোধ করবেন। আজকের সাহিত্যে যে অবক্ষয়ী চিন্তা, আজকের সাহিত্যে প্রাণের চিন্তার, বুদ্ধির মনীষার যে দৈন্যতা অফিসারদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব সঞ্জাত সেকথা বলাই বাহুল্য। একমাত্র প্রাণের স্পর্শে প্রাণ জাগতে পারে। সে স্পর্শের বদলে তাঁরা তরুণ মনে আঘাত করে নিজেদের পানে টানতে চেয়েছেন। তরুণেরাও জেদ করে বিপরীত দিকে ঝুঁকেছে। বিদেশের সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পড়াশোনা করে স্বদেশের সবকিছুকে কুশ্রী বলে অচেতন মনের আঘাতের সে কথঞ্চিৎ ঝাল মেটায়। আর প্রচীনেরা সাদা চুলের দাবিতে প্রভুগোষ্ঠীর পক্ষপটে অথবা চাকুরির মসনদে আত্মরক্ষা করে আখেরি জমানাকে ধিক্কার দেন।

জমানাটা আখেরি তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরা আরো খুশি এ কারণে যে, আখেরি জমানায় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। সাহিত্যের এত পরম মহেন্দ্রলগ্ন, কেননা শিল্পীর যে অন্তঃস্থিত বৃত্ত এ জমানায় সব মানুষের সমবায়ে বিকশিত হয়ে ওঠতে, অন্তত থিয়োরিগত কোন বাঁধা নেই। যারা বুদ্ধিকে বিক্রি করতে করতে হীনবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, মনীষাকে হীন স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে করতে পাটের দালালেরও অধম হয়ে পড়েছে, সেসব চকচকে ভদ্রজীবনের গণ্ডী পেরিয়ে যদি আমরা মাটির সাক্ষাৎসন্তানদের বলিষ্ঠ বেপরোয়া জীবনে পদচারণা করি, তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উল্লাসকে সাহিত্যের উপজীব্য করে নিতে পারি, সত্য অন্ধ মানুষের প্রেমিক মন নিয়ে; তাহলে পূর্ববাংলার সংস্কৃতিতে জীবন আবার ফণা ধরে জেগে ওঠবে। কিন্তু কাজটি অত সোজা নয়। স্থিরীকৃত একটা মতবাদের সঙ্গে জনতাকে তৃতীয় শ্রেণীর মিস্ত্রীর মত পেরেক দিয়ে ঠুকে মুহুর্মুহু বালখিল্যরূপে আপ্লুত

হয়ে জনতার জয়ধ্বনি করলে গণসাহিত্য রচিত হবে এমন প্রত্যাশা করা নিতান্ত অবাস্তব, উদ্ভট এবং হাস্যকর। আজকে আমাদের দেশের লেখকেরা যারা গণসাহিত্য করবেন তাঁদের সামনে অনেক মানসিক, অনেক বাস্তব বাঁধা এবং প্রলোভন বর্তমান। সেগুলোকে চিন্তার আগ্নেয় রশ্মিতে ভস্ম করতে না পারলে জনসাধারণের পোশাকে সামন্ত চরিত্রই আঁকতে তারা বাধ্য হবেন। বিপরীতমুখী যে সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পক্ষাঘাতদুষ্ট ভাবধারা আমাদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করে সংস্কৃতিকে উপদংশ দোষে দুষ্ট করতে চলেছে তার মর্মমূল অনুসন্ধান করে অসারতাটুকু হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বিদেশি স্যাম্পেনের গ্লাসে যাঁরা কলা লক্ষ্মীর নীলাক্ষী দেখতে পান, তাঁদের চোখের বিজ্ঞতার চশমখানা খুলে নিয়ে তাঁরা যে কত বেশি মুর্খ সেকথাও বুঝিয়ে দিতে হবে তথ্য এবং তত্ত্বের মাধ্যমে। আর যারা আদর্শের গোলাম বলে নিজেদেরকে প্রচার করে সে পুটুলি খুলে দেখিয়ে দিতে হবে যে মানুষের জীবনের চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। জীবন শুধু কতিপয় বার্ণিশ করা রেডিওকে কান ভাড়া দেওয়া ভদ্রলোকের নয়, আরো মানুষ আছে যারা সংখ্যায় অনেক। তাদের জীবনে উপাদানের অভাব নেই। মানবিক উপাদান, তাদের চরিত্রে যতবেশি সুলভ ভদ্রলোকের জীবনে ততবেশি দুর্লভ। কেননা জীবনের সত্যিকারের কর্তব্য সংগ্রাম তারা জীবিকার খাতিরে হলেও করে যাচ্ছে। ভাড়া দেওয়া নিশ্চিন্ত নয় তাদের জীবন।

মতের সঙ্গে পথের, আদর্শের সঙ্গে কর্মপন্থার সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। পথ বস্তুত একটাই আছে জীবনের সেটা চরম পথ। এ চরম পথে চলতে হবে যারা গণসাহিত্য করবেন তাঁদের। কথা উঠতে পারে, এ চরম পথ কেন? যেহেতু বাক্যের মোড়কে প্রাণের প্রকাশকে ঢেকে রাখা চলবে না। অভিযানের কাছে মস্তিস্ক বন্ধক দেওয়া চলবে না। নন্দনতত্ত্বের খাতিরে জীবনের প্রকাশকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন করা চলবে না। শুধু প্রাণের গভীরে খনন করে প্রাণের হীরে-মোতিকে প্রাণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের গণসাহিত্য বলতে তেমন কিছু নেই আজও। কিন্তু এ যুগের সাহিত্য, সাহিত্যের ধারা অনুসারে গণসাহিত্য হওয়া উচিত। নন্দনতাত্ত্বিক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান অধ্যাপক, ধূর্ত সমালোচক, চালাক সম্পাদক এবং সর্বোপরি উপাদংশদোষে দুষ্ট তরুণদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে সুস্থ, প্রাণান্ত করতে হলে সাহিত্যকে গণমুখি করা পূর্ববাঙালিদেরই কর্তব্য।

সংবাদ, ২ নভেম্বর, ১৯৬৬

ঢাকায় যা দেখেছি যা শুনেছি

গোটা দেশের মানুষ ব্যাকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার দিকে তাকিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ এগারদিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির প্রধান, একনায়ক আইয়ুবের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো সাহেব এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দও আলোচনার টেবিলে এসেছেন। তাঁরা একাধিকবার পৃথক পৃথকভাবে মুজিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখাশুনা করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন।

পত্রিকাগুলো মাঝে মাঝে বেশ আশাব্যঞ্জক খবর দিচ্ছিল। দেশের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমরাও আশা করেছিলাম মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে যাচ্ছেন। মার্চ মাসের তিন তারিখে অধিবেশন বসার দিন ঠিক করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে তা নাকচ করে দিলেন। তারপরও দেশের মানুষের মনে কোনরকম সন্দেহের উদয় হয়নি। তাঁরা সরলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, ইয়াহিয়া খাঁর ইচ্ছেমত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করেছে, এরপরেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা আসবে না, তা ভাবাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু পঁচিশ তারিখের রাতে এমন কিছু ঘটল যার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেও দেওয়া একরকম অসম্ভব।

মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ সকালবেলা থেকেই আমরা একটি জিনিস সাগ্রহে লক্ষ করেছি, ঢাকা শহরের সমুদ্রতরঙ্গের মত মিছিলগুলোতে কেমন যেন একটা শান্তভাব এসেছে। রাস্তার লোকজন পানের দোকানের সামনে রেডিও শোনার জন্য জটলা করছেন। সকাল সাতটা থেকে দুই তিনবার রেডিওর সংবাদ হয়ে গেল। আলোচনার ফলাফল প্রসঙ্গে কিছুই বলা হল না। ধাবমান মিছিলগুলো কেমন ঝিম মেরে গেল। তখনো কোন কোন মিছিলের জনতা সমস্বরে গেয়ে যাচ্ছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। লোকজনের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে। তাঁরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আঁচ করতে চেষ্টা করছেন।

বিকেল চারটের পর থেকে শহরের অবস্থা একেবারে শান্ত হয়ে এল। কি ঘটতে যাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারে না। ঢাকা শহরের জনগণ সুদীর্ঘ দিন ধরে

সুশৃঙ্খলভাবে অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। তাঁরা এতদিনের সংগ্রামের কি ফল ফলতে যাচ্ছে জানার জন্য ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। জাগ্রত কৌতূহল মেটাবার কোন খোলা পথ নেই। সন্ধের দিকে খবর এল সামরিক বাহিনীর লোক শাদা পোশাকে গিয়ে পাক মটর্সের কাছে দুজন এবং তেজগাঁ ফার্মগেটে তিনজন নিরীহ পথচারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। খবরটি কেউ কেউ বিশ্বাস করল, কেউ কেউ করল না।

এর মাত্র দিনকয়েক আগেও সৈন্যবাহিনী অনেকগুলো এমন সব হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করেছে, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে একেকটি জালিয়ানওয়ালাবাগের তুলনা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে জয়দেবপুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ এমনি বহু হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ৭ মার্চ তারিখে ঢাকা রেসকোর্সের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও সামরিক বাহিনীর নৃশংসতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তবু ঢাকা নগরীর মানুষ পঁচিশ তারিখের বিকেলবেলাতেও বিশ্বাস করতে পারেননি যে সেনাবাহিনীর লোক সাদা পোশাকে নিরীহ পথচারীকে হত্যা করতে পারে। বিশ্বাস না করতে পারার কারণ সকলে ধরে নিয়েছিলেন, এত দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে, তার একটা সুফল নিশ্চয় হবে।

রাত নয়টার দিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে কোন মুহূর্তে সেনাবাহিনী চলে আসতে পারে। সমগ্র শহরে সাড়া পড়ে গেল। রাস্তার গাছ কাটা হতে লাগল। ভাঙ্গাচোরা ট্রাক, ঠেলাগাড়ি, নষ্ট ড্রাম ইত্যাকার জিনিস বহু দূর থেকে ঠেলে নিয়ে আসা হতে লাগল। রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার মানুষ কাজ করছিল। দেখতে না দেখতে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বুক সমান উঁচু ব্যারিকেড তৈরি হয়ে গেল। সমগ্র ঢাকা হয়ে দাঁড়াল একটা ব্যারিকেড নগরী। শক্ত করে ব্যারিকেড তৈরি করার পর শ্রান্ত মানুষ রাস্তার ধারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। সকলেই ভাবছিলেন, দেখি কি হয়।

এর মধ্যে এগারটা বেজে গেল। তারও কিছু পরে ঢাকা নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেনাবাহিনী। সৈন্যরা এল ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে। ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলল। রাস্তার উপর দিয়ে মিলিটারি জিপগুলো ছুটে বেড়াতে লাগল। ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড শব্দ কানে তালা লাগাবার উপক্রম করল। কামানগুলো গুড়ুম গুড়ুম গর্জন করছে, মর্টার থেকে গুলি ছুটছে। দ্রুম দ্রুম আগুনেবোমা ফুটছে আর ঠিকরে ঠিকরে লাল আগুনের লকলকে শিখা বেরিয়ে আসছে। কান পাতলে আওয়াজ— রাইফেলের, মেশিনগানের, মর্টারের, ট্যাঙ্কের। চোখ মেলে তাকান যায় না। ঢাকার আকাশ অজস্র নিক্ষিপ্ত গুলির আগুনে লাল হয়ে উঠেছে। খৈ ফোটার মত ফুটছে গুলি। মাঝে মাঝে ট্যাঙ্কের গুলির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে মহানগরীর আনাচ-কানাচ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঢাকার আকাশে শোঁ শোঁ শব্দে কেবল চলছে গুলি। লোকজন বাড়িঘরের লাইট নিভিয়ে দিয়ে আতঙ্কিত নিশাযাপন করছেন। খবর নেবার উপায় নেই। রাস্তায়

নামার আগে সেনাবাহিনী টেলিফোন যোগাযোগ কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিয়েছে। দরজা খুলে পাশের বাসার লোকজনের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। শোঁ শোঁ করে গুলি এসে প্রবেশ করে।

এরকম অবস্থার মধ্যে রাত অতীত হল। ফুটল দিন। ফুটন্ত প্রভাতের আলোতে আমরা নগরীর চেহারা দেখলাম। চেনাই যায় না। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত, দেয়ালগুলো ক্ষত-বিক্ষত। কালো কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। গত রাতে যেসব বাড়িতে আগুনবোমা ছুঁড়ে মারা হয়েছে, সে সকল বাড়ি এখনো জ্বলছে।

সকাল সাতটার পরে মানুষজনকে রাস্তায় বেরুবার সুযোগ দেওয়া হল। পয়লা কেউ বের হয়নি। সেনাবাহিনীর ঘোষণা বিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা কারো নেই। তবু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিপীলিকার মত পিলপিল করে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এল। আমরাও এলাম। শহরের অবস্থা দেখে দুই চোখ জলে ভরে গেল। হাজারে হাজারে হিংস্র পশু যেন গোটা শহরকে খামচে কামড়ে থাবা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। শহরের ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর চিকন সবুজ পাতাগুলো গুলির আগুনের আঁচে তামাটে হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে মেশিনগানের সংখ্যাহীন গুলির চিহ্ন। তোপখানা রোডে বাসা। বায়তুল মোকারম পর্যন্ত যেতে দুই দুইটি লাশ দেখলাম।

একটু এগিয়ে গুলিস্তান সিনেমার সামনে গিয়ে অবস্থা দেখে মুখের কথা মুখে আটকে গেল। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে অনেকগুলো মানবসন্তান। রক্ত ফুটপাতের উপর জমাট বেঁধেছে। রাতের বেলা যে সকল ফেরিওয়ালা, কুলি, শ্রমিক, ভিখারী এবং ভিখারিণী শ্রেণির মানুষ রোজকার অভ্যেসমত ফুটপাতে ঘুমিয়েছিল, তাঁদের কেউই রেহাই পায়নি।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেলাম। যেতে যেতে দেখতে হল অনেকগুলো মরা। কারো পিঠে লেগেছে গুলি, কারো বুকে। কোন মাথার খুলিতে খুব ছোট একটা ছিদ্র করে ঢুকেছে আর মগজ সমেত খুলির একটা বিরাট অংশ উড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমরা এলাম রেলওয়ে হাসপাতালের পাশে। একটা অতি করুণ দৃশ্য দেখতে হল। একটি মায়ের বাঁ স্তনের পাশে গুলি লেগেছে। তার শিশুটি তখনো জীবিত। আমরা যেন জাতির গোরস্থানের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। ঢাকা হলের সামনে একটি বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। লম্বা দীর্ঘ দাড়ির দুই-এক গোছা বাতাসে একটু একটু নড়ছে। চোখ একটু একটু নড়ছে। তার ওপাশে দুইজন গলাগলি করে মরে রয়েছে। চোখে মরা মাছের মত নিথর দৃষ্টি। এই চূড়ান্ত দুঃসময়েও মনের তলা ভেদ করে একটি প্রশ্ন জেগে উঠেছে, আচ্ছা এরা দুইজন কি সহোদর ভাই ছিল?

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সামনে দিয়ে মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়ে এলাম শহীদ মিনারের পাদদেশে। দেখলাম মিনারটির মাথাটা কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছে। তখনো তারা মিনারটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেনি। মিনারের সোজা

বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউন্ডের প্রাচীরের উপর আমাদের দেশপ্রেমিক শিল্পীরা পশ্চিমা শাসকদের ধারাবাহিক অত্যাচারের যে বর্ণনা তুলি কালির মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, মোটা তেরপলের উপর আঁকা সেই প্রাণবন্ত চিত্রমালার উপর এমনভাবে গুলি করেছে যে, মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড ঝড়ে তা কলাপাতার মত শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

দুই পা এগুতেই উচ্চৈঃস্বরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। নার্স হোস্টেলের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়াটার্স থেকে অবিশ্রাম কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাংলা একাডেমীর সহকারী গ্রন্থাগারিক চীৎকার করে বললেন, এই ব্লকে একজনও পুরুষ মানুষ বেঁচে নেই। আমরা ভেতরে গেলাম। দেখি নিহত হয়েছে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনিরুজ্জামান। ইংরেজি বিভাগের রিডার ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার ড্রাইভার এসে বলল, ড. ঠাকুরতার কাঁধে গুলি লেগেছে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতাও আহত হয়েছেন। দেখতে গেলাম। ছাত্ররা হাসপাতালে নিয়ে গেল তাঁকে। সেখানে বিনা চিকিৎসায় দুদিন পরে এই সহৃদয় প্রাণবন্ত অধ্যাপক মারা যান। কে একজন বলল, অর্থনীতির অধ্যাপক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ড. মফিজুল্লাহ্ কবীরের কোন খোঁজ নেই। পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ড. ইন্নাস আলীও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন শুনতে পেলাম। বেঁচে আছেন কিনা কেউ বলতে পারল না।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের খুনে রাঙা কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের বাড়ির গেটে গেলাম। দেখি অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। কাঁদবার অবস্থাও তখন নয়। এই মানবতাবাদী অধ্যাপক কিভাবে পশুদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন ছাত্ররা অশ্রুসিক্ত চোখে তা বর্ণনা করল। আগের রাতে বর্বর নেকড়ে বাহিনী জগন্নাথ হলের নিরীহ ছাত্রদের বেপরোয়াভাবে মেশিনগানের গুলির আঘাতে হত্যা করেছিল, এই সংবাদ ড. দেবের কানে আসামাত্রই তিনি বেরিয়ে একদম হলে চলে এলেন। তিনি সৈন্যদের নাকি মিনতি করে বলেছিলেন— 'বাবা, তোমরা আমার নিরপরাধ ছাত্রদের মের না, একান্তই যদি মারতে হয়, আমাকেই মার'। সৈন্যরা তাঁকে মেরেছে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে লোকজন সবাইকে মেরেছে। এমনকি ড. দেবের লাশটাও গোপন করে ফেলেছে। তেতো হাসি হাসলাম, ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যরা লাশ গোপন করে অপরাধ গোপন করতে চায়। এই মহান জীবন, এই মহান মৃত্যুর সন্নিধানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। আবার খবর এল— মৃত্যু ছাড়া খবর নেই কোন— ঢাকা হলের ব্যাচেলার্স মেসে যে সাতজন তরুণ অধ্যাপক থাকতেন তাঁদের একজনও বেঁচে নেই।

ড. দেবের বাসা ছেড়ে জগন্নাথ হলের দিকে গেলাম। গেটের পাশেই একজন চেনাজানা ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠে শায়িত সারি সারি লাশ দেখাল। অনেক মৃতদেহ নাকি মাঠে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়েছে। আর কক্ষে কক্ষে ঢুকে যাদের মারা হয়েছে সকলের লাশ

নাকি তেমনি পড়ে রয়েছে। এই নিহত তরুণ ছাত্ররাই একদিন আগে দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান দিয়েছিলেন, ক্ষিপ্র পায়ে মিছিল করেছিলেন, বলিষ্ঠ আশা নিয়ে স্পন্দিত হাতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন লোহিতে সবুজে মেশানো বাংলার নক্সা-আঁকা স্বাধীনতার নিশান। এঁদেরই মধ্য থেকে জন্ম নিত আগামীদিনের নির্ভীক গণনায়ক, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং সহৃদয় শিল্পী সাহিত্যিক। হাতে অল্প সময়। দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে হবে। কত প্রিয়বন্ধু সুহৃদ এবং শ্রদ্ধেয় জনের ঝলসানো মৃতদেহ দেখতে হয়েছে। দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলব সে সময় কই?

সলিমুল্লাহ হলটির সামনে দাঁড়ান মিলিটারি ভ্যান। সৈন্যরা রাস্তায় পায়চারি করছে। বুটজুতোর বিশ্রী আওয়াজ কানে আসছে। ভেতরে গিয়ে দেখার সুযোগ হল না, চেনাজানাদের মধ্যে কে কে বাঁচতে পেরেছে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, প্রতিটি কক্ষে আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। দেয়ালের এখানে সেখানে এবড়ো-খেবড়োভাবে গুলির আঘাত লেগেছে। এই হলটিতে কতজন মরেছে তার সংখ্যা জানা যায়নি। অনেকদিন পর্যন্ত লাশগুলো কক্ষ থেকে বের করা হয়নি।

এই শ্মশানদৃশ্য পার হয়ে প্রায় ৬০/৭০ গজের মত হেঁটে ইকবাল হল ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখি অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনী হলটিকে তিন দিক থেকে বেড়া দিয়ে রেখেছে। সুতরাং সামনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কল্পনা করতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়, গতরাতে এই হলটিতে কি প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। এই হলের ছাত্ররাই ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষ্ঠা-শ্রম দিয়ে অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে দিনে দিনে তিল তিল করে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, সংগঠিত করেছেন— এঁরাই তো প্রথমে তথাকথিত পাকিস্তানের পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন।

১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই হলের দেশপ্রেমিক ছাত্ররাই তো মরিয়া হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি আন্দোলনে এই ইকবাল হলই যুগিয়েছে তেজ শক্তি এবং সাহস। অধিকন্তু এঁরাই তো তথাকথিত পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ইকবালের নাম বদলে হলের নতুন নাম রেখেছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। এই সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন আইয়ুব সরকারের বানানো মিথ্যে আগরতলা মামলার আসামী। বন্দি অবস্থায় জহুরুলকে পাকিস্তানি সৈন্য ১৯৬৯ সালে হত্যা করে। এই হলের উপর সৈন্যদের আক্রোশ বেশি থাকবে— সে তো জানা কথা। তাছাড়া প্রভাবশালী ছাত্রনেতাদের অনেকেই এই হলে থাকতেন। আক্রমণটা নৃশংস হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। কতজন মারা গেছে এবং কে কে মারা গেছে তার সংবাদ আমরা বলতে পারব না।

এবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বেরিয়ে এলাম। ইডেন মহিলা কলেজের পাশ দিয়ে এসে আজিমপুর কলোনির ভেতর দিয়ে হেঁটে পিলখানার দিকে ছুটলাম। ইডেন কলেজের হোস্টেলে যে ছাত্রীরা থাকতেন তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করলাম না,

পাছে একটা বিশ্রী কথা শুনতে পাই। দুই দিন না যেতেই সেই বিশ্রী কথা শুনতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় বিষিয়ে উঠেছে সমস্ত অন্তরাত্মা।

যাহোক, আমরা পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সে এলাম। অন্যান্য দিন এখানে উর্দিপরা ইপিআর বাহিনীর লোকজনে ভর্তি থাকত। আজ কেউ নেই। ছাড়াছাড়াভাবে মেশিনগান হাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা শ্যেনদৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই ক্যাম্পে প্রায় আড়াই হাজার ইপিআর সদস্য থাকত। তাদের ভাগ্যে কি ঘটল জানার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মুখফুটে কারো কাছে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। একজন পানের দোকানদার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, আড়াই হাজারের মধ্যে একজন মাত্র বেঁচেছে। কথাটা সত্য কিনা পরখ করে দেখিনি। হয়ত একজনের স্থলে চার পাঁচজন কিংবা তারও বেশি বাঁচাটা আশ্চর্য নয়। রাতে যখন ইপিআর সদস্যরা সকলে মিলে ব্যারাকে ঘুমাচ্ছিল, তখনই প্রহরী কয়জনকে হত্যা করার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরজা আটকে কামান দেগে সমস্ত ঘুমন্ত মানুষগুলোকে একই সঙ্গে মেরে ফেলে।

বহুকাল আগেই আমাদের চেতনা রহিত হয়ে গেছে। শহর থেকে মানুষ পালানোর হিড়িক লেগে গেছে। সে এক অভাবনীয় করুণ দৃশ্য। চোখে না দেখলে এ দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক তা অনুমান করার উপায় নেই। আমরা ভূতে-পাওয়া মানুষের মত দেখে যাচ্ছি— শুধু দেখে যাচ্ছি। কে একজন বলল গতরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশেরা অর্ধেক রাত ধরে লড়াই করেছে। পুলিশের সঙ্গে টিকতে না পেরে সৈন্যরা ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে। ট্যাঙ্ক থেকে কামান দেগে পুলিশদের ছত্রভঙ্গ করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুলিশেরা পালায়। রাজারবাগের প্রায় হাজারখানেক পুলিশের মধ্যে নাকি শ'খানেক কোনমতে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে। বাকি সবাই বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গিয়েও দেখি সেই একই বীভৎস দৃশ্য। শাদা শাদা অট্টালিকাগুলোর দেয়াল গোলার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জলের ট্যাঙ্কটা ফেলে গেছে। পুবদিকের ঢেউটিনের ছাউনি ব্যারাকখানা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। রাস্তার দুই পাশের নারকেল এবং দেবদারু গাছের সবুজপাতা আগুনে অর্ধেক পুড়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা কড়া পাহারা বসিয়েছে। ভেতরের পথটা দিয়ে লোকের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোন মৃতদেহ দেখতে না পেয়ে অবাক হলাম। স্থানীয় লোকজন বলল, শেষরাতে অনেকগুলো গাড়িতে লাশ বোঝাই করে নিয়ে গেছে সৈন্যরা।

ফিরে আসার সময় খবর পেলাম একই রাতে সেনাবাহিনী ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপল' এবং প্রভাবশালী 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। ইত্তেফাকের একজন চেনা হকারের মৃত্যুসংবাদ শুনলাম।

আরো একটি কাহিনী শুনলাম, সেটিও মৃত্যুর কাহিনী। কিন্তু কাহিনীটি অনন্য। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুয়াজ্জম থাকতেন এলিফ্যান্ট রোডের একটি ফ্ল্যাটে। প্রায় সাতাশ

দিন পরে তিনি স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে এসেছেন। তিনিও ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। তাঁর বীর্যবত্তা এবং সাহসিকতার কথা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে সুবিদিত। রাতে সৈন্যরা তাঁকে বাসায় ঢুকে টেনে বের করে নিচে নিয়ে আসে। তাঁরা মুয়াজ্জমকে বলল, 'তুমি যদি বাঁচতে চাও, আমরা দুইটি শর্ত দিচ্ছি, যদি মেনে নাও তাহলে বাঁচবে, নয়ত মরবে।' তারা তাঁর কাছে দাবি করে, তোমাকে বলতে হবে, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' তিনি পাকিস্তানি মেজরের মুখে থুতু ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন পরম ঘৃণায়— 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি পাকিস্তান আর ইয়াহিয়ার নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করব না।' তখন পাঁচটি মেশিনগান একসঙ্গে গর্জে উঠল এবং মুয়াজ্জমের প্রাণহীন শরীর লুটিয়ে পড়ল। তারপর তারা মুয়াজ্জমের লাশ গাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চালিয়ে নিল। বাংলার একজন বীরকে এইভাবে হত্যা করল, এইভাবেই তাঁর প্রাণহীন শরীরকেও অপমান করল।

ঘরে যখন ফিরে এলাম, দুই মিনিট সময়ও অবশিষ্ট নেই। মোড়ে মোড়ে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে একজন লোকও নেই। শুধু মিলিটারি লরিগুলো রাজপথে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সৈন্যদের বুটের আওয়াজ বেজে উঠছে ঠক ঠক। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম ঢাকা শহরের চারদিক দিয়ে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ধূসর ধোঁয়াতে সমস্ত শহর ছেয়ে গেছে। চোখ মেলার উপায় নেই। যেদিকেই তাকাই, দেখি আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সব মানুষ ঘরের ভেতর ঘরবন্দি হয়ে পড়ে আছে। কারো সংবাদ নেবার উপায় নেই। সূর্য যতই পশ্চিমে হেলছে আতঙ্কও প্রবল হয়ে বুকের কাছে দুলছে। রাতকে বিশ্বাস নেই। গতরাতে ওরা যা করেছে, আজও যদি তার পুনরাবৃত্তি হয়! সন্ধের আগে কানফাটানো প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে তোপখানা রোডের পাশ দিয়ে পাঁচখান ট্যাঙ্ক চলে গেল। উপরে ফিট করা কামান আর ভয়ঙ্কর-দর্শন একটি করে লোক দেখা গেল। বাদামি রঙের ইউনিফর্মধারী সৈন্যের মত তারা তত আতঙ্কসঞ্চারী নয়।

সে যাই হোক, অবশেষে সন্ধে গড়িয়ে রাত হল। আকাশে জেগে উঠল অসংখ্য তারা। আবার গুলিগোলার আওয়াজ আসতে লাগল। আজকের আকাশও গতদিনের মত গুলির আগুনে লাল হয়ে উঠেছে। মেশিনগান ছোঁড়ার শব্দ শুনছি, রাইফেলের গুলি ছুটছে শোঁ শোঁ। মাঝে মাঝে বুম বুম আওয়াজ শুনতে পাই। ওটা ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবিস্ফোরণের ধ্বনি। এখানে সেখানে আগুনেবোমা ছুঁড়ে দিচ্ছে, শিখা বেরিয়ে আসছে আর বাড়িগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গতরাতের চাইতেও ওরা বেশি হারে গুলি করছে। ২৩ মার্চ তারিখে প্রতিটি ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। সে পতাকা লক্ষ্য করে প্রতিটি বাড়িতেই সৈন্যরা গুলি ছুঁড়েছে। এই রাতও পোহাল। ভোর হল। সোনালি রোদে চারদিক ঝলমলিয়ে উঠল।

সকাল সাতটার পর আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বাংলা একাডেমীতে। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তে গড়া

বাঙালির এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি কামান দেগে চুরমার করে দিয়েছে। সংস্কৃতি বিভাগের কাগজপত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তিন তলার দেয়ালের প্রায় আট গজ পরিমাণ দেয়াল ভেঙে ফেলেছে। কামান থেকে যে গোলাগুলো ছোঁড়া হয়েছে তার একটির ওজন নিয়ে দেখা হয়েছে সাড়ে সতের সের।

বাংলা একাডেমীর সামনেই রমনার কালীবাড়ি। দুইটি কালীমন্দির প্রায় শ' হাতের ব্যবধানে। কালীবাড়ির এক একটি কম্পাউন্ডের মধ্যে কম করে হলেও এক হাজার মানুষ থাকত। সকালবেলায় পুকুরে স্নানার্থীর ভিড় দেখে থাকলে আসল সংখ্যাটা অনুমান করতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কাছে যাবার উপায় নেই। একটু দূর থেকেই দেখলাম পায়রার খোপের মত ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলো জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলেছে।

নিঃসঙ্গ মন্দির আকাশে চূড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের গায়ে গোলার আঘাতের চিহ্ন। প্রতিমা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে : এতসব মানুষ, এরা গেল কোথায়? চারিদিকে সৈন্য। তার মধ্যেও একজন কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, পেট্রোল দিয়ে পয়লা আগুন ধরিয়ে দেয় ঘরবাড়িগুলোতে। প্রাণের ভয়ে শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী-নারী-পুরুষ যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করেছে, তাদের গুলি করে মেরেছে। দুটি মন্দিরের এতগুলো মানুষের ভাগ্যে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটেছে। গোটা রমনা এলাকাতে পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাসে নিঃশ্বাস টানা দায়। বমি হয়ে পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চায়।

আমরা কেন যে হাঁটছি, কেন এসব ধ্বংসস্তূপ দেখছি তার কারণ ভেবে দেখিনি। শুধু নেশাগ্রস্তের মত দেখে যাচ্ছি।

আবার এলাম শহীদ মিনারের পাদদেশে। রাতে তারা গোটা মিনারটাকে কামানের আঘাতে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এখানেই ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার মুসলিম লীগের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদেরই শরীরের ক্ষরিত রক্তধারার উপর গড়ে উঠেছে এ মিনার— বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার প্রতীক। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শোষণবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে আমাদের রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ এই মিনারের পাশে শপথ গ্রহণ করেছেন। গত দুই মাস ধরে এখানে প্রতিদিন একটা না একটা সভা হয়েছে। শ্রমিক এসেছেন, কৃষক এসেছেন, ছাত্র এসেছেন, এসেছে নানা রাজনৈতিক দল। তুলি-শিল্পীরা প্রদর্শনী করেছেন, গণনাট্যদল নাটক অভিনয় করেছেন, গায়কেরা সাত দিনব্যাপী গানের আসর করেছেন। কবি-সাহিত্যিকেরা কবিতা, গল্প পাঠ করেছেন। বাঙালি জাতির এই মহামিলনক্ষেত্র কেন্দ্রীয় মিনারটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী।

এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। বাসা ভাঙা পাখির মত লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে এসেছে। সকলেরই চোখেমুখে অনিশ্চয়তা। কে কোথায় যাবে তার

ঠিক নেই। কেউ কারো মুখের পানে তাকিয়ে দুটো সহানুভূতির বাণী প্রকাশ করবে তেমন অবকাশ নেই। ভিড়ের মধ্যেই পা চালিয়ে দিলাম। আমরা প্রায় মাইলখানেক হেঁটে নয়াবাজার এলাম। গোটা বাজারটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বিদ্যুতের তার সব ছিড়ে গেছে। বড় বড় আড়ত এবং গুদামঘরের পোড়া আধপোড়া রাশি রাশি টিন ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে। সারারাত আগুন জ্বেলেছে আর গুলিগোলা ছুঁড়েছে। মানুষ কত মরেছে তার হিসেব করেছে কে?

নওয়াবপুর ক্রসিংয়ের কাছে এসে সবচেয়ে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হল। তেজগাঁ থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন প্রায় আট দশ মাইল হবে। রেল লাইনের দুই পাশে গত তেইশ বছর ধরে অভাবের টানে গ্রামবাংলার মানুষ এসে ডেরা পেতেছিল। কেউ রিক্সা চালাত, কেউ মোট বইত, আবার কেউ বা করত ফেরিওয়ালার কাজ। গতদিন দুপুর থেকে সেনাবাহিনী এই বস্তিএলাকা জ্বালানোর কাজ শুরু করেছে। একটি ঘরও সোজা নেই। পোড়া স্তূপের মধ্যে দেখা গেল কয়টি বীভৎস করোটি। গন্ধ ছুটছে ভুরভুর করে। সেখানেই খবর পেলাম ডেমরা নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনী দিনে রাতে হরদম গোলাবর্ষণ করেছে। বাঙালি অফিসারদের সপরিবারে টেনে এনে বেয়নেট দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে হত্যা করেছে।

দেখারও সীমা আছে, শোনারও সীমা আছে। কিন্তু নতুন অত্যাচারের দৃশ্য চোখকে পীড়া দেয়। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা মৃতদেহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া মুশকিল। নতুন মৃত্যু, নতুন জ্বালানো পোড়ানোর সংবাদ শ্রুতিতে রূঢ় আঘাত করে। না শুনে উপায় নেই। সময়টা যে অস্বাভাবিক। বাঙালি জাতির যা কিছু গর্বের আনন্দের আকাঙ্ক্ষার সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকব?

রিক্সা থেকে নেমে একজন লোক খবর দিল, গতরাতে সমস্ত শান্তিনগর বাজারটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। উহ্, জ্বালানো ছাড়া আর কথা নেই, হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যের আর কর্ম নেই। এই চরম দুঃখের দিনেও হাত নিশপিশ করে ওঠে। আজ যদি আমাদের হাতে অস্ত্র থাকত! মারি কিংবা মরি ব্রত নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম। অসহায়ের মত বসে বসে স্বজনহত্যা দেখা আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। ঘুরবার সময় শেষ হয়ে এসেছে। একটু পরেই কারফিউ নামবে। জানালার বাইরে দুটি কৌতূহলী চোখও যদি দেখা যায়, সেনাবাহিনী নিশানা করে গুলি ছুঁড়বে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

ঢাকা শহরের রাস্তায় মিলিটারি জিপ ছুটে বেড়াচ্ছে। এখানে সেখানে গুলি ছুঁড়ছে। সারারাত ধরে তারা গুলি করে করে আমাদের জাতীয় নিশানগুলো পেড়ে ফেলেছে। ঘরের ছাদে ছাদে বাঁশের কঞ্চিগুলো দাঁড়িয়ে। যে সময়টুকু খোলা ছিল বানের জলের মত অর্ধেক মানুষ সরে গেছে শহর থেকে। সারা শহরে প্লেগের মত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বেলা ঢলে পড়েছে। একটু পরে সন্ধ্যা নামবে। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্মমভাবে শিকার করবে বাংলাদেশের মানুষ, ঘর

জ্বালাবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। সৈন্যরা দুই দিনে যে আচরণ করেছে তাতে করে প্রমাণিত হয়ে গেছে মানুষের সামান্যতম গুণও তাদের নেই।

আশ্চর্য, এই নরপশুরা আলোকে ভয় করে। অন্ধকারের আড়ালেই তারা জঘন্যতম নৃশংসতম দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করে। সন্ধে হওয়ার একটু আগেই সৈন্যরা মাইক দিয়ে ঘোষণা করল, নামিয়ে ফেল জাতীয় পাতাকা। বায়তুল মোকারমের পাশে ইসলামিক একাডেমির একজন হৃষ্টপুষ্ট দারোয়ান পতাকা নামিয়ে নেবার জন্য যেই হাত দিয়েছে, অমনি তার বুকে গিয়ে গুলি বেঁধে। বেচারা ঘুরে ঘুরে নিচে পড়ে গেল। ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে কালো রাজপথ লাল হয়ে এল। এই মৃত্যুর দৃশ্যটি খুবই হৃদয়বিদায়ক।

সন্ধের পরে বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক গুলি চলল। ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে চার চারখানা ট্যাঙ্ক নারায়ণগঞ্জের দিক থেকে ফিরে এল। চোখের ঘুম উধাও। বুকের ভেতরটা ভারি জ্বলছে। গুলি থামছে না। মেশিনগানের ইতস্তত আওয়াজ, ক্ষণে ক্ষণে একটা দুটো করে গর্জে উঠছে রাইফেল। সম্ভবত সৈন্যরা ঘরে ঢুকে হত্যা করছে। রাত যতই গভীর হচ্ছে আওয়াজ ততই ঘন হচ্ছে।

ছাদের উপর উঠে দেখলাম ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। আজ রাতেও তারা জ্বালাচ্ছে। এমনিভাবে আগুন দেখতে দেখতে রাত কাটালাম। রাত ভোর হল। দেখি নওয়াবপুরের বাঙালি দোকানগুলো জ্বলছে। আগের দিন নাকি অবাঙালি অধিবাসীরা দোকানের মালপত্তর লুটে নিয়েছে। যে দেরাজ, বাক্সগুলোতে ভরে থাকত বাঙালি ব্যবসায়ীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এখন সেখানে গাদা গাদা ছাই এবং অঙ্গার। সকলে শাঁখারীবাজারের কথা বলাবলি করছিল। এই ছোট্ট গলিটিতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করত। ঢাকা শহরের আর কোন অঞ্চলে এত হিন্দুর বাস ছিল না।

গলিতে ঢুকবার আগেই নমুনা দেখলাম। জগন্নাথ কলেজের পাশের একটা ঘরে চারজন মানুষ পাশাপাশি পড়ে আছে। গলি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার উপায় নেই। পোড়া আধপোড়া মানুষ আগুনের আঁচে বেঁকে গেছে। প্রতিটি ঘর তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছে। প্রতিটি ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে। কেউ রেহাই পায়নি। শিশু-বৃদ্ধ-নারী সকলেই মরেছে। কে একজন বলল, চন্দন শূরের ঘরে একত্রিশটি লাশ রয়েছে। তিনি ছিলেন প্রভাবশালী এবং ধনবান মানুষ। গত নির্বাচনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মুসলিম লীগ সমর্থক নবাববাড়ির খাজা খয়েরুদ্দীন তাঁকে দলে টানতে চেষ্টা করলে তিনি কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। লোকে বলাবলি করতে শুনেছি খাজা নিজেই নাকি সৈন্যদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিল।

শাঁখারীবাজারে অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং নারীধর্ষণ কিভাবে চলেছে চোখে না দেখলে তার বর্ণনা দেওয়া যাবে না। দেখছি শয়ে শয়ে বিকৃত পোড়া আধপোড়া মৃতদেহ। এর একটি দেখলেও অন্য সময় পেটের খিদে এবং

চোখের ঘুম চলে যেত। তবু সেই খুনি পশুপালের দৃষ্টি এড়িয়ে অসংখ্য মৃতদেহ ঠেলে ঠেলে পথ চলেছি। ভাবতে নিজেরই অবাক লাগে।

দুপুরে বাসায় আসতে হল। দেখতে হল সামরিক কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ উর্দুতে লেখা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এবং সে জাতীয় শ্লোগান বাড়িতে দোকানে সেঁটে রাখছে। সমস্ত ঢাকা শহর খুঁজে বেড়ালেও কোন বাঙালির দোকানে বাংলা ছাড়া সাইনবোর্ড পাওয়া দায় হত। জনগণ স্বেচ্ছায় বাংলাতে সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছিল। কেউ তাদের বাধ্য করেনি। অথচ আজ তারা বুলেট এবং বেয়নেটের মুখে বাধ্য হয়ে আপনাপন বাড়িঘর দোকানপাটে উর্দু লেখা সেঁটে রাখছে। এর চাইতে অপমানজনক আর কি হতে পারে। সৈন্যবাহিনী আমাদের অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, সে সঙ্গে তারা আমাদের বর্ণমালাও ধ্বংস করে দিতে চায় নাকি?

এক-একটা সংবাদ চেতনায় কামানের বলের মত আঁছড়ে পড়ে। এতকাল মানুষ সম্পর্কে জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সব যেন মিথ্যে হয়ে গেল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণই এই কয়দিনে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রেতছায়া বনে গেছি। পথেঘাটে বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা হলে করমর্দন করে বলি, 'আসি এখন ভাই, বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।' ধরতে গেলে আমাদের যেন কোনই অস্তিত্ব নেই। তবু কি করে বেড়াচ্ছিলাম তার বিশ্লেষণ তখন পাইনি। এখনো পাচ্ছি না। খাওয়ার কোন রকম প্রবৃত্তি নেই। একটি দোকানে পাউরুটির দুটো স্লাইস খেয়ে গলায় জল ঢেলে সদরঘাটের দিকে গেলাম। ফুটপাতে ইতস্তত ছড়ানো লাশ পড়ে রয়েছে। বড় বড় মাছি ভন ভন করছে। বাংলাদেশে মানুষের লাশ শকুনেও খায় না। শেয়াল-কুকুরেও ছোঁয় না।

প্রতিদিন সদরঘাটে লোকের হাট থাকত। প্রদেশের অনেকগুলো জেলা থেকে মানুষ লঞ্চে করে ঢাকায় আসত, ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলায় যেত। অসংখ্য মানুষের মধুচক্রের মত অবিরাম গুঞ্জরণ রাত বারটার পরেও থামত না। সেই সদরঘাট খালি। একদম খালি। আইডব্লিউটিএর জেটিগুলোর দিকে তাকালেই বুক ছম ছম করে। এত সব মানুষ, এত নৌকা লঞ্চ হৈ-হল্লা চিৎকার এসব কোথায় গেল? এই যে রাস্তায় দুই পাশে বসত রাশি রাশি ফেরিওয়ালা, বেচাকেনা সেরে রাস্তার উপর শুয়ে থাকত— তাদের কি হল? কানের কাছে কে একজন বলল, সকলেই গেছে। বিরাট গুদামঘরটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঢাকা শহরের বসন খুলে নিয়ে একেবারে উলঙ্গ করে রেখেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

তারপর আর এক ব্যাপার দেখলাম। সদরঘাট এবং ইসলামপুর রোডের সংযোগস্থলে একটি জুতার দোকান আছে। নাম বিআইএস। খুব বড় দোকান। সৈন্যরা দোকানের তালা ভেঙে ফেলে প্রথম অবাঙালিদের ডেকে এনে একদফা লুট করাল। তারপর কিছু বাঙালিকে ডেকে এনে বলল, যা আছে লুটেপুটে নিয়ে যা। যারা লুট করতে চায়নি সঙ্গীনের গুঁতো দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে জিনিসপত্র নিয়েছে। তারা নিজেদের ক্যামেরাম্যান দিয়ে ছবি তুলিয়েছে

এই পরবর্তী লুটের দৃশ্যের। তারপর মেশিনগান দিয়ে গুলি করে মেরেছে। শুধু বিআইএস দোকানের সামনেই বিশ পঁচিশটি মৃতদেহ চার পাঁচদিন ধরে পড়ে ছিল। ইসলামপুরেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

পরদিন বীভৎসতম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনতে পেলাম। রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘুমন্তপুরী আক্রমণ করার মত যখন বর্বর সেনাবাহিনী শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার পরের দিন থেকেই নিরাপত্তার আশায় হাজার হাজার মানুষ স্রোতের মত এসে জিঞ্জিরা বাজারে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই জিঞ্জিরাবাজার পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করার এবং কামান দেগে গণহত্যার খবর পেলাম। সন্ধের সময় থেকে মেশিনগানে সজ্জিত মিলিটারি জিপগুলো সদরঘাটে জড়ো করে রাখে একদিকে। আবার অন্যদিকে বাজারের তিন দিকে তারের ঘেরা দেয় এবং তাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দেয়। রাত হলে নৌকা করে নদী পার হয় সৈন্যরা এবং তাদের জিপগাড়িগুলোও পার করানো হয়। এ্যারোপ্লেন থেকে আলো দেখিয়ে জিপগুলোকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠের সুবৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্রটিতে রাতের অন্ধকারে রাইফেলের নল থেকে, মেশিনগানের নল থেকে অবিরাম ঝলসাতে থাকে মৃত্যু। যারা আশ্রয় নিয়েছিল কেউ বাঁচতে পারেনি। যারা গুলি থেকে বাঁচবার জন্য পেছন দিকে পালাতে চেয়েছে তারা শক্ খেয়ে মরেছে। একরাতে তারা জিঞ্জিরাবাজারে কমসে কম পাঁচ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। দূর-দূরান্তের মানুষও দূরপাল্লার মেশিনগানের গুলি থেকে বাঁচতে পারেনি। এক রাতের মধ্যে জিঞ্জিরাবাজার বিলকুল সাফ করে দিল।

শুনলাম, বংশাল রোডের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার অফিসটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। দেখতে গেলাম। কামানের ঘায়ে সমস্ত অট্টালিকাই উড়িয়ে দিয়েছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই। কে একজন বলল, শহীদ সাবেরের লাশ। হ্যাঁ, তাই তো, একটা বিকৃত মৃতদেহ তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ইনিই কি এককালের প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক বর্তমানের বিকৃতমস্তিষ্ক শহীদ সাবের? নাকের উপর বসানো চশমাজোড়া এখনো তেমনি আছে। শনাক্ত করতে অসুবিধে হল না। মাথা খারাপ হওয়ার পর থেকে শহীদ সাবের এখানেই পড়ে থাকতেন রাতের বেলায়। দুই বেলা প্রেসক্লাবে গিয়ে খেয়ে আসতেন। বন্ধুরা বিকৃতমস্তিষ্ক সাবেরের জন্য এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। পঁচিশ তারিখের রাতে প্রেসক্লাব ভেঙে দিয়েছে। তার পরের একদিন নিশ্চয়ই তাঁকে উপোস করতে হয়েছে। তারপর তো বর্বর সৈন্যদের হাতে প্রাণই দিতে হল।

ঢাকা শহরে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। প্রতিটি জিপের শব্দে মনে হয় মৃত্যু এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ে। প্রতিটি গুলির শব্দে মনে হয় নিজের বুকটাই ফুটো হয়েছে। অথচ গুলি লাগেনি নিজের বুকে। অন্য কারো বুকে লেগেছে। আমার বুকে লাগতে পারে, কিন্তু সে সময়টি কখন আসবে? স্থির হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। ঘুর ঘুর করে হেঁটে বেড়াই। পরদিন উয়ারিতে গিয়ে জানতে পারলাম

কলাবাগান, ফার্মগেট এবং তেজগাঁ এলাকা থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমসে কম আট শ' ছাত্র ধরে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে খবর পাইনি। সৈন্যরা ওসব অঞ্চলের ঘরে ঘরে গিয়ে মা-বাবাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে, তোমার ছেলে কয়টি? তাদের বয়স কত? এখন কোথায়? আমাদের হাতে দিয়ে দাও। নইলে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।

দলে দলে তরুণ না খেয়ে না ঘুমিয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকার বাইরে চলে এসেছে। পথে যে সকল দলের সঙ্গে মিলিটারির দেখা হয়েছে তাদেরকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা শহর জনশূন্য হতে চলল। সন্ধের পরপরই কোন না কোন বাড়িতে আগুন জ্বলে ওঠে। কোথাও গুলির শব্দ শোনা যায়। গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল, রিক্সা কিছুই চলে না। শুধু মিলিটারি জিপগুলো বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তায় ছুটোছুটি করে। আর গর্ গর্ গর্ বিকট আওয়াজ তুলে মাঝে মাঝে ট্যাঙ্ক যায়। বাজারে খাবার মেলে না। তরিতরকারির বাজার সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রেশনের দোকানের চাল আটা গম সব লুট করে নিয়ে গেছে। বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকানগুলো একের পর এক লুট করে যাচ্ছে অবাঙালিরা। মিরপুর, মোহাম্মদপুর অঞ্চলের অবাঙালিরা এসে বাঙালিদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে তালা লাগিয়ে দিয়ে দখল প্রতিষ্ঠা করছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার কাজ তখনো পুরোদমে চালু হয়নি। অনতিবিলম্বে সে কাজটি শুরু হল। দিনের বেলা চরদের সহযোগে হিন্দু অধিবাসীদের বাড়িতে গিয়ে চিহ্ন দিয়ে আসে। রাতের বেলা গিয়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে গুলি করে হত্যা করে। শহর থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই। চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি, একজন মাঝি দুজন হিন্দু ভদ্রলোককে বুড়িগঙ্গা পার করে দেয়। সৈন্যরা এ কথা জানতে পারে। তারা পার করে দেওয়া মাঝিটির খোঁজ করতে থাকে। মাঝি ওপার থেকে দুজন তরকারি বিক্রেতাকে এপারে নিয়ে এসে আবার চলে যায়। সেকথা জানতে পেরে মাঝিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু মাঝি ওপারে গুলির রেঞ্জের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। তারা তখন সে তরকারি বিক্রেতা দুজনকে ধরে ফেলে। হুকুম করে বুড়িগঙ্গায় ডুব দিতে। যেই ডুব দিয়েছে জলের ভেতরেই মেশিনগানের গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ মানুষ দুইজন মরা মাছের মত ভেসে ওঠে।

নিজের চোখে দেখেছি, সৈন্যরা কিভাবে নারিন্দার গৌড়ীয় মাঠের উপর আক্রমণ করেছে। সেদিন মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখ হবে। দুপুর থেকেই তারা মঠটা ঘিরে রাখে। তাদের দালালেরা বলতে থাকে মঠের মধ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এবং একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার পাওয়া গেছে। কথাটা কি কেউ বিশ্বাস করেছে? মনে তো হয় না। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের চূড়ো লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়তে থাকে। আশ্চর্য শক্তি পাথুরে মন্দিরের। গোলার আঘাতেও একটুও ভেঙে পড়েনি। তারপর তারা আগুন লাগাতে চেষ্টা করল।

দাউদাউ করে জ্বলেও উঠল। সে সময় এল বৃষ্টি। আগুন জ্বলল না। তারপর রাইফেলের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। পরদিন দেখা গেল চার পাঁচটি গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

অত্যাচার সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হল। সংখ্যালঘুদের ধনসম্পদ লুট করতে অবাঙালিদের লেলিয়ে দেওয়া হল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল জামাতে ইসলামি এবং মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাহিনী। এই লুণ্ঠনকর্ম শক্তিশালী করার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দাগী আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হল।

অন্যদিকে অত্যাচারের সাধারণ চেহারাটিও কম ভয়ঙ্কর নয়। ঘোষণা করেছে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া হবে। মাইনে দিয়েছেও। অফিসের ফটকের কাছে আবার সে মাইনে কেড়ে রেখেছে। ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি অফিসেই এরকম ঘটেছে। পথেঘাটে হাঁটবার উপায় নেই। তল্লাশী করার নামে মানুষের হাত থেকে ঘড়ি-আংটি, টাকা-পয়সা সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শুনলে গল্প মনে হবে, কিন্তু ঢাকাতে এসব সত্যি সত্যিই ঘটেছে।

ঢাকা শহর তরুণ ছাত্র যুবকদের আশ্রয় দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। দেখলেই গুলি করে, ধরে নিয়ে যায়। গুলি করে মারতে মারতে সৈন্যরাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ধরে নিয়ে কোথায় যে রাখে, কি করে, ঠিকমত খবর পাই না। নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলে নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষ্যার পাশে একটি ঘেরা জায়গায় নিয়ে গুলি করে। আবার কেউ বলে সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরের সব রক্ত টেনে নিয়ে মেরে ফেলে। তার দুই তিন দিনের মধ্যে কমলাপুরে, ধানমণ্ডিতে রক্ত বের করে নেওয়া যুবকের লাশ দেখা গেল।

সৈন্যরা শহরের 'জ্বালানো, পোড়ানো, হত্যা, ধর্ষণ একরকম শেষ করেই গ্রামের দিকে যাত্রা করল। প্রতিদিন খবর আসছে নানাস্থান থেকে জালের মত বেড় দিয়ে মানুষ খুন করে যাচ্ছে। অবলা তরুণীদের ধরে ব্যারাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঢাকায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ঢাকা ছেড়ে চলে এলাম।

শ্যামপুরে ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হওয়ার সময় বাচ্চা মাঝি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই যে, দেখুন, কত লাশ গাঙে'। চেয়ে দেখলাম দশ বারটা পেটফোলা লাশ কচুরিপানার দামের পাশে ভাসছে। এরাই তো স্বাধীনতার নিশান উড়িয়েছিল, এরাই তো রণধ্বনি তুলেছিল।*

---

* যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* [মুজিবনগর : মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), জুলাই ১৯৭১]; পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : মুক্তধারা), মার্চ, ১৯৭২।

পাকিস্তানের শিক্ষানীতি

১

পাকিস্তানের তেইশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপর দুই ধরনের হামলা হয়েছে। তার একটি শিক্ষাদর্শ সম্পর্কিত এবং অন্যটি পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থবন্টনের আসমান জমিন যে বেশকম তার আওতাভুক্ত। এই দুটি সরকারি নীতি আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই প্রকৃত ব্যাপারটা ধরা না পড়ার কথা নয়— একটা অন্যটার পরিপূরক। সরকার যে দুই ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিল, বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে একবাক্যে তাকে যদি কেউ হামলা বলে অভিহিত করেন খুব বেশি ভুল করবেন না।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের ধনিক, বণিক এবং পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের উপনিবেশ। সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কার্যত পশ্চিমারা শোষণই করেছে। ঔপনিবেশিক শোষক সরকার যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে তাতে জনগণের জীবনের বাস্তব দাবির চাইতে শাসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের গুরুত্বই দেওয়া হয় অধিক। বাংলাদেশেও ভূতপূর্ব পাকিস্তানের কর্তারা শাসন-শোষণ কায়েম করে রাখার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের যতটুকু সহযোগিতা অপরিহার্য তার বাইরে শিক্ষার কোন রকম প্রসার হতে দেয়নি। এটা হল বাঙালি জনসাধারণকে শিক্ষার দিক থেকে খাটো করে রাখার সরকারি ষড়যন্ত্র। এই দুরভিসন্ধি পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল পন্থাই গ্রহণ করেছে। নামে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু কাজে পশ্চিমাঞ্চলের এক শ্রেণির মানুষ পূর্বাঞ্চলের সকল শ্রেণির মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে এসেছে। এটা উপনিবেশবাদের চারিত্র্যলক্ষণ।

পাকিস্তানকে আবার চিরায়ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তুলনাও করা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকে গায়ের জোরে। তাতে কোন রকম রাখারাখি ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই। পাকিস্তান বলতে যা বোঝায় বাংলাদেশের মানুষের সমর্থনে তার সৃষ্টি, আস্থায় স্থিতি। পাকিস্তান সৃজনে পশ্চিমা প্রদেশগুলোর অবদান খুবই সামান্য। বাঙালিরাই বানিয়েছে পাকিস্তান। সুতরাং গায়ের জোরের কথাই ওঠে না। তাই বাংলাদেশকে পশ্চিমারা উপনিবেশে রূপান্তরিত করেও মুখে তা স্বীকার করত না।

বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণক্ষেত্র। এ কথা যাতে করে পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপলব্ধিতে না আসে, সেজন্য তারা রাষ্ট্র সংগঠনকারী অপরিহার্য উপাদান—

ভৌগোলিক সংলগ্নতা, জলহাওয়া, সংস্কৃতি, ভাষা এসব বাদ দিয়ে ধর্মকেই একমাত্র হাতিয়ার করেছিল। পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র, মুসলমান রাষ্ট্র ইত্যাদি শ্লোগান হরদম প্রচার করে কতিপয় নগ্ন সত্য ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তার ফলে বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শোষণটা ধরা পড়েনি।

পাকিস্তানের শিক্ষাদর্শেও এই ইসলাম শব্দটা অত্যন্ত সুকৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান জগতে বাঁচবার বাস্তব দাবিই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত। ইসলামি, খ্রিস্টানি কিংবা হিন্দুয়ানি বলে কোন শিক্ষাব্যবস্থা এ যুগে সত্যি অচল এবং একেবারে অকেজো। তবু পাকিস্তানের কর্তারা শিক্ষার সঙ্গে ইসলামকে এমনভাবে জুড়ে দিল, মনে হবে যন্ত্র-ঘর্ঘরিত জগতে বাস করেও তারা যেন মধ্যযুগের খনি খনন করে আদিম অন্ধকার সমাজজীবনে ছড়িয়ে দেবার কাপালিক ক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

আসলে বিষয়টা পুরো সত্য নয়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মনের একটা বদ্ধমূল ধারণা, তারা যা করে, তাদের যা আছে সবই ইসলাম, ধর্মসম্মত। তাদের ভাষা ইসলামি, সংস্কৃতি ইসলামি, উপজাতীয় নাচন আদিমতা এমনকি অশ্লীল অশালীন উর্দুতে পাঞ্জাবিতে তৈরি ছায়াছবিগুলো পর্যন্ত ইসলামি। ওরা স্বভাবের বশবর্তী হয়ে যা করে সবই ইসলামি। সুতরাং ইসলামি শিক্ষাদর্শ তাদের লোকসানের না হয়ে লাভের কারণই হওয়ার কথা। হয়েছেও তাই।

বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সাহিত্য থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত যা প্রকৃতির তাড়নায়, স্বভাবের প্রেরণায়, প্রাণধারণের প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে সৃজিত হয়ে আসছে তার কোনটাই ইসলাম ধর্মসম্মত নয়। তাই এর প্রত্যেকটিকে ইসলামি করে তুলতে না পারলে নতুন রাষ্ট্রের উন্নতি অসম্ভব। শাসকশ্রেণি একথা প্রচার করত। শিক্ষার মাধ্যমেই সবকিছুর দ্রুত ইসলামায়ন সম্ভব। তাই পরিবর্তন যদি আনতে হয় ইসলামি শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনই একমাত্র উপায়।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত শোষণ-শাসনপীড়িত অজ্ঞ জনসাধারণের সরকারের ইসলামি শিক্ষানীতির স্বরূপ জানার কথা নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের প্রকোপে কুপিত। সেই মানুষও এ সম্বন্ধে প্রথম প্রথম কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ইসলামি শিক্ষাপদ্ধতির অল্পস্বল্প বাস্তবায়নের মধ্যেই উপনিবেশবাদী সরকারের গূঢ় ইচ্ছেটা স্পষ্টভাবে ফুটে বের হল। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা রাষ্ট্রারোপিত একটা ছাঁচের মধ্যে সৃষ্টিশক্তিও আটকে থেকেছে। একে কোনমতেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে না। কেননা প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব সত্য এবং তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের একটা তৃষ্ণা অবশ্যই থাকা চাই।

গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা প্রয়োজন যার প্রভাবে শিক্ষার্থীর মন আবিষ্কারের দিকে, বিচারের দিকে, বিশ্লেষণের দিকে ধাবিত হতে পারে। যে শিক্ষা কৃত্রিম, তার সে বালাই নেই। কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিকে অপরের কাজের যোগ্য করে, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরাও

একটা কৃত্রিম শিক্ষানীতি উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে গোটা বাঙালি জাতির স্বভাবজ শক্তিকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করেছে। বাঙালি জাতিকে ভাবনা-চিন্তাহীন, কল্পনাহীন এবং স্বপ্নহীন করার ষড়যন্ত্রের নামই ইসলামি শিক্ষানীতি।

বাংলাদেশে শোষণ কায়েম করে রাখার জন্য এ ধরনেরই একটা শিক্ষাপদ্ধতি চালু হওয়া আবশ্যক। যাতে করে ফি বছর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমলা ও কেরানি তৈরি হয় এবং একটিও সুচেতনাসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তার মানুষের সৃষ্টি না হয়। এই শিক্ষানীতি বিগত তেইশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞানের বিকাশ মারাত্মকভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল কত দূর বিস্তৃত ছিল এবং তা কিভাবে চিত্তের সহজ গতিতে বাধা দিয়েছে কতিপয় বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণির পাকিস্তানি কর্তা জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় ইসলামের সিলমোহর এঁটে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তারা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে এ মত প্রচার করতে থাকে যে, কোরানই হল জ্ঞানবিজ্ঞান তথা সমস্ত কিছুর উৎস। কোরানে যা নেই তা বিশ্ব ভূমণ্ডলের কোথাও নেই। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য কোরানের জ্ঞান তথা ধর্মের জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। ধর্মীয় জ্ঞানের দাপট শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকলে খুব বেশি ক্ষতি হত না। কিন্তু ধর্মের এলাকা ছাড়িয়েও ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং শিল্প-সাহিত্যে ধর্মের বীজ অনুসন্ধান করতে যাওয়া এ যুগে মত্ততারই নামান্তর। দুর্ভাগ্যবশত মত্ততাই শিক্ষার সকল স্তরে প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে।

ইসলামি শিক্ষার প্রবর্তকদের কেউ কেউ তাদের একগুঁয়েমির স্বপক্ষে কবি ইকবালের শেকোয়া কাব্যের একটি অংশের কিছু চরণ 'ম্যানিফেস্টো' হিসাবে তুলে ধরে। ওই কাব্যের পঙ্‌ক্তি যে সত্যি সত্যি তারা ব্যবহার করেছিল তেমন কথা বলছি না। তবে কবিতাংশের নিহিতার্থ যা তাই তাদের শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই কবিতাংশের ভাবার্থ করলে এরকম দাঁড়ায় : পৃথিবীতে আগে মুসলমান ছাড়া আরো অনেক জাতি বাস করত। গ্রিসের লোকেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করত, রোমানেরা সাম্রাজ্যবিস্তারে রত ছিল, সাসানিয়েরা আপনাপন উপাস্য দেবতার প্রতি প্রণতি নিবেদন করত। তারা তো কেউ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র নাম প্রচার করেনি। কেবল মুসলমানের বাহুবলকেই আশ্রয় করে আল্লাহ্‌র নাম পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু এই অংশটুকু আলাদাভাবে বিচার করলে এর মানে ধরে নিতে হয় মুসলমানেরাই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

কিন্তু গোটা কাব্যের প্রেক্ষিতে এর মানে ভিন্নরকম। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগে ইসলাম এবং মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব সন্ধানের একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলতে থাকে

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের অঘোষিত শিক্ষানীতি হিসাবে তা সক্রিয় করে তোলা হয়। মুসলমানেরা সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এই উগ্র অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা নিরক্ষর এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষদের মনে চারিয়ে তুলতে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে এই উগ্র অসহিষ্ণু এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশের কিছু স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কিছু ধর্মান্ধ মানুষ এই অঘোষিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করেছে।

পাকিস্তানি কর্তাদের এই নীতির সঙ্গে হিটলারের শিক্ষানীতির তুলনা করা যেতে পারে। নাৎসিরা আর্যামির ধুয়া তুলে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় যা কিছু উগ্র রণংদেহি জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রোৎসাহিত করে না সে সকল খারিজ করে দিয়েছিল। তেমনি পাকিস্তানি প্রভুরাও যা কিছু মুসলিম জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অনুধারণার পরিপন্থী তা সমস্ত বর্জন করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ নীতি একমাত্র কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশের বেলায়। পশ্চিম পাকিস্তানের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। তারা আগে যেভাবে শিক্ষা পেয়ে আসছিল, সেভাবেই তাদের শিক্ষা চলতে লাগল, বরং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক করে তোলা হল।

দেশবিভাগের আগেও পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশের কোনটাতে বেশি অমুসলমান বাস করত না। তাই সেখানকার যা কিছু সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তার অনেকটা মুসলমানের হাত দিয়েই গড়ে উঠেছে। তাই বলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কিছুতেই ইসলামের সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। সরকার শক্ত হাতে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের কুটোটিও নড়ল না। কারণ সেখানকার সংস্কৃতিতে, কাব্যসাহিত্যে যা কিছু অনৈসলামিক উপাদান থাকুক না কেন, মুসলমানরাই তো ওসবের স্রষ্টা। সুতরাং পঠন-পাঠনে বাধা থাকবে কেন?

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যুগযুগান্তর ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছে। বাংলার মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাষা এবং আচার-আচরণের সঙ্গে হিন্দুদের যোগ রয়েছে। বাঙালির যা কিছু মনন এবং চিত্তসম্পদ, তা হিন্দু-মুসলমানের যৌথসাধনার সৃষ্টি। ক্ষেত্র এবং কাল বিশেষে মুসলমানের অবদান হিন্দুর তুলনায় নগণ্য। শাসকগোষ্ঠী প্রচার করতে থাকল এ কেমন করে সম্ভব? মুসলমানেরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাত, অন্তত হিন্দুর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তো বটেই। তারা যদি হিন্দুলেখকের লেখা পড়ে, তাদের গান গায়, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব খুইয়ে বসবে। স্বার্থান্ধ এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনই করল না শুধু, সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতেও লেগে গেল। তার ফল দাঁড়াল এই যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমান হিন্দুর চাইতে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হল। কোন রকমের যুক্তি ছাড়াই অমুসলমান লেখক, স্রষ্টা এবং চিন্তানায়কদের সাধনা দৃষ্টির আড়াল করে রাখল অথবা বিকৃত করে উপস্থিত করল।

বঙ্গভঙ্গপূর্ব আমলের সকল লেখক, সকল গ্রন্থ কিংবা সকল ধরনের বিচার বিশ্লেষণ অসাম্প্রদায়িক ছিল, ত্রুটিমুক্ত ছিল তেমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে তাঁদের ত্রুটির চাইতে গুণপনা যে অধিক ছিল সে আলোময় দিকটাকে অন্ধকারে ঢেকে রাখা হল। সত্য আবিষ্কারের স্পৃহার স্থান দখল করল একপেশে মনোবৃত্তি। গোটা শিক্ষাযন্ত্রটাই একপেশে হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু সকল বিষয়ে মুসলমানের উৎকর্ষ দেখানো প্রয়োজন তাই সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লেখানো হল। অমুসলমান সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকে বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই হেয় করে দেখানো হল। ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের নতুন সংজ্ঞার প্রচলন করা হল। ভাড়াটে ঐতিহাসিকরা বই লিখে, প্রবন্ধ ফেঁদে, বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করতে লাগল যে বাঙালিরা এদেশের ভূমিজ সন্তান নন। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই ইরান, তুরান কিংবা তুর্কিস্থান থেকে এসেছেন।

পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রবন্ধনটাও কৃত্রিম। একটি শ্রেণি শুধু শোষণ করার জন্য এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছে এবং আরেকটি শ্রেণি অজ্ঞতাসঞ্জাত উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে এই কৃত্রিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের মানুষ। শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্য কৃত্রিম শিক্ষানীতিও তাই অপরিহার্য।

পাকিস্তানের কর্তারা শিক্ষাসংস্কারের নামে এই কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে গোটা বাঙালি জাতিকে তার ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, সংস্কৃতির কোল থেকে, মাটির শেকড় থেকে সবলে টেনে ছিন্নমূল করতে চেয়েছে। যদি তারা সফল হত এতদিনে বাঙালিকে একটা দাস জাতিতে রূপান্তরিত করতে পারত। তাই তারা সাহিত্যে জোর করে বিকৃত ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেছে, মিথ্যা এবং অর্ধসত্য ইতিহাস রচনা করেছে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা এবং যুক্তিবিচারের মুখে পাথর চাপা দিয়েছে। অন্তর্লোকের উত্তরণ ঘটানো, বস্তুনির্ভর সত্য উদ্‌ঘাটন করা এবং আধুনিক পৃথিবীতে সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে বসবাস করার যোগ্য করে তোলাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। পাকিস্তানি শাসকেরা যে শিক্ষাপদ্ধতি বাংলাদেশে চালু করল, তাতে মৌলিক চিন্তার স্থান নেই, চিত্তবৃত্তি স্ফুরণের ক্ষেত্র নেই, সামাজিক দুঃখ দূর করার প্রেরণা নেই— ঘাড়ে-গর্দানে বাঙালিকে দাস করে রাখার একটা নিষ্ঠুর শৃঙ্খল ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায় না। এ শিক্ষা সৃষ্টিশীল প্রতিভার বদলে কেরানি এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষের বদলে আমলা তৈরি করতেই শুধু সক্ষম।

৩

দেশবিভাগের পরে অনেক কৃতি শিক্ষক বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। তার কারণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে মনে করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল করা হবে। অথবা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার লোভে দেশ ছেড়েছেন— বেশির ভাগের

বেলায় তাও সত্যি নয়। হিন্দুই হোন অথবা মুসলমানই হোন বাংলাদেশে শিক্ষকেরা সবসময়ই সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র। অধিকাংশ শিক্ষক আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র ছিলেন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের অনেকের পশ্চিম বাংলা কিংবা ভারতের অন্য কোন স্থানে আত্মীয়স্বজন ছিল না। তবু তাঁরা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তাকে সম্বল করে বাস্তুহারার দলে নাম লেখালেন। কেন? তার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে।

পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিনের সাধনার বিনিময়ে লব্ধ শিক্ষকতার সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কথাটা অনেকাংশে সত্য। একটি জাতির কৃতী শিক্ষকের সংখ্যাই বা কত। সাম্প্রদায়িকতার নীতি এত কঠিনভাবে যদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হত অনেক কৃতী শিক্ষকই দেশে থাকতে পারতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রী সত্যেন বসুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল, যেহেতু তিনি অমুসলমান। অবশ্য শ্রী বসু দেশবিভাগের মাস কয়েক আগে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু কারণ একই। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর মত জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান তাঁর স্বদেশে হয়নি। জগন্নাথ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রী অজিতকুমার গুহ কোন এক সভায় বাংলাদেশের মুসলমানের ঠিকুজী-কুলজী সম্পর্কিত একটি ইতিহাসসম্মত মন্তব্য করেছিলেন তা শাসকশ্রেণির মনঃপূত হয়নি। সে অপরাধে তাঁর মত একজন কৃতবিদ্য শিক্ষক জীবনের উপান্তে এসে কলেজের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

শ্রীবসু, জনাব আলী এবং শ্রীগুহের কথা লোকের শ্রুতিগোচর হয়েছে, কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা কীর্তিমান। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত এমন অনেক অখ্যাত অশ্রুতকীর্তি শিক্ষক দেশত্যাগ করেছেন যাদের সম্বন্ধে বেশি লোকের জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা শিক্ষক হিসাবে ভাল ছিলেন, সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যাঁরা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেননি সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করে তাঁদেরও চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেছে। এতগুলো শিক্ষকের অল্প সময়ের মধ্যে দেশত্যাগ নিশ্চয়ই গোটা জাতির শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করেছে এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই বিরাট বিকট সমস্যার একটা সরল সমাধান সরকার আগেই যেন তৈরি করে রেখেছিল। কৃতী অধ্যক্ষ দেশত্যাগ করলে সে আসনে এলেন আধুনিক জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে একেবারে অজ্ঞ আরবি-ফার্সির অধ্যাপক। উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের অভাব হয়ত সরকারের খয়ের খাঁ গোছের কোন থার্ড মাস্টারকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে।

ফরমায়েস দিয়ে দাস তৈরি করা যায়, কিন্তু শিক্ষক তৈরি করা যায় না। শিক্ষকের মন স্বাধীন না হলে প্রাণের সলতে দিয়ে প্রাণে আলো জ্বালানোর কর্মটি

করা সম্ভব নয়। এক একজন শিক্ষক সুদীর্ঘ সময়ের পরিসরে প্রতিদিন নিজের দুর্বলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চিন্তাধারা সুবিন্যস্ত করে তোলেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর চিন্তাপদ্ধতিতেও শৃঙ্খলার ভাব সৃষ্টি করেন। এ ধরনের শিক্ষকের ঐতিহ্য থাকা চাই। বনবাদাড় ফুঁড়ে রাতারাতি শিক্ষক গজাবে? শিক্ষক কি ব্যাঙের ছাতা? অথচ পাকিস্তান সরকার শিক্ষার মতো একটি জটিল এবং জাতীয় জীবনের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার কারখানায় তৈরি শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

এই ক্রান্তিকালের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষকের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রসম্পদের লেশমাত্রও ছিল না। এই শিক্ষকরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু সরকারি নির্দেশ পালনে চূড়ান্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করে নেওয়া অনুচিত হবে না, শেষ পর্যন্ত বেশকিছু শিক্ষকই সরকারি নীতির বিরোধী ছিলেন। মনে মনে বিরোধিতা করা আর মুখে প্রতিবাদ করা এবং তার জন্য ক্ষতিস্বীকার করতে তৈরি থাকার মত সাহস এবং সঙ্গতি সকলের না থাকারই কথা। লাখে না মিলায়ে এক ধরনের কিছু শিক্ষক বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে এবং স্কুলগুলোতে সত্যি সত্যি ছিলেন। তাঁরা সে সময়ও সরকারি শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য শোনার এবং প্রতিকার করার মত অবস্থা বাংলাদেশের তখনো আসেনি।

গোটা সমাজটা পাকিস্তানের ইসলামি জোয়ারে তরঙ্গিত হচ্ছে, ধনিকেরা স্থূল, সূক্ষ্ম দুই পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে শক্ত করে বাঁধছে বাংলাদেশকে, বাঙালিকে এবং শিক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশিবাদের ভাবী বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে লেগেছে। আর যারা চক্ষুষ্মান, তারা দু'হাতে সুবিধে লুট করছে। এই রকম সময়, এই রকম পরিস্থিতিতে শুধু শিক্ষক সমাজের এগিয়ে এসে বিশেষ একটা কিছু করার ছিল না। সভা-সমিতিতে রাষ্ট্রের ইসলামি দর্শনের ননীর পুতুলের শরীরে আঁচড় লাগে এমন কোন কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না কেউ, সংবাদপত্রগুলোতে তাঁদের মতামত প্রকাশিত হত না।

শুধু তা-ই নয়, প্রতিষ্ঠানিক মুখপত্রগুলোতেও স্বাধীন চিন্তা কিংবা গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল, যদি তা রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিকূলে যায়। শিক্ষক নামধারী এক শ্রেণির পরগাছা ব্যক্তি পোষণ করাই সরকারের পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এই পরগাছা শ্রেণির হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া শিক্ষকেরাই কখনো সামনে এগিয়ে এসে, কখনো দাঁড়িয়ে থেকে, কখনো খোলাখুলি এবং কখনো প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানি শাসকদের বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মোড়কে উপনিবেশবাদী নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তাদেরই সহায়তায় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্তশাসিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। একটির পর একটি সংস্কৃতিবিরোধী সরকারি হামলায় তারাই জুগিয়েছে সমর্থন এবং সাহস।

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা হরণ করল, শিক্ষকদের স্বাধীনতা কেড়ে নিল, স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞানীসুলভ নির্মোহ প্রশ্নশীলতার উৎসমুখ নিষেধের পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল। শিক্ষকেরা পবিত্র বৃত্তির লাঞ্ছনায় মনে মনে গুমরে মরেছেন, কিছুই করতে পারেননি, করার কিছু ছিলও না তাঁদের।

শিক্ষা একটা জাতীয় সমস্যা। সরকার নির্ধারিত নীতি চাপিয়ে দিয়েছে গোটা জাতির উপর। জাতি যদি প্রতিবাদ করার মত মানসিকতার অধিকারী না হয়, তাহলে শিক্ষকও তাঁর দায়িত্ব পালন করতে অনেক সময় সক্ষম হয়ে ওঠেন না। তিনি জাতিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতে পারেন, কোন নীতি কার্যকর হলে গোটা দেশের মানুষকে কি পরিমাণ ক্ষতি সইতে হবে। সরকারি ফেরফার বোঝার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকার জাতি তখনো অর্জন করতে পারেনি।

তবে সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল। পাকিস্তানি কর্তারা শিক্ষার প্রশ্নে এমন সব নীতি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করল, অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে দেশের শিক্ষিত মানুষ চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য হলেন। দেশের মানুষের সচেতন অংশ বুঝতে আরম্ভ করলেন শিক্ষার প্রশ্নে সরকার যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছে তা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, দেশের ব্যাপক জনজীবনেও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করবে। অনেক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে কিছু কিছু শিক্ষক কতিপয় সরকারি নীতির ফলাফল যে দেশের মানুষের পক্ষে মারাত্মক হবে তা তরুণ ছাত্রদের এবং দেশের মানুষকে সম্যকভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন। শিক্ষকদের এই অবদান স্মরণ রাখার মত। কোন কোন শিক্ষককে বিশেষ বিশেষ সরকারি নীতির বিরোধিতার প্রশ্নে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। এজন্য তাঁদের লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হয়েছে।

৪

পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করেছে। তার পেছনে উপনিবেশবাদী দুরভিসন্ধি ছাড়া কোন যুক্তি ছিল না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণকে অনেক কাল পিছিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক শোষণ সুদীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক-বণিক শ্রেণি। আসল উদ্দেশ্য চাপা দেওয়ার জন্য সরকার প্রচার করেছিল, উর্দু ইসলামি ভাষা এবং এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে দুই অঞ্চলের মুসলমানদেরই সুবিধে।

সেই সময় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সরকারি যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন, যদি ধর্মভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার একচেটে অধিকার, তাহলে উর্দু কেন আরবি হোক না পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আরবি তো দুই অঞ্চলের মুসলমানের দৃষ্টিতে সমান পবিত্র। সরকার কিংবা পশ্চিমা ধনিক বণিক শ্রেণি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ ধরনের মন্তব্যে প্রীত হওয়ার চাইতে বেজারই হয়েছিল বেশি। উর্দুকে ইসলামি ভাষা বলে

বাংলাদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, অথচ উর্দু ইসলামি ভাষা নয়। সত্যি যদি কোন ভাষাকে ইসলামি বলা যায়, তাহলে আরবির দাবি সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা আরবির প্রতি অনীহ। তার কারণ, তাদেরকেও তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মত গোড়া থেকে ভাষা শিক্ষা করতে হয়। তারা তাতে গররাজি। তাহলে যে বাংলাদেশের মানুষদের পিছিয়ে রাখার সমস্ত কূটকৌশল মিথ্যে হয়ে যায়।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আদতে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শাসকদের কূটযুক্তির জবাবে কূটযুক্তির অবতারণা করেছিলেন মাত্র। তিনি একা নন। বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ড. কাজী মোতাহের হোসেন বাংলা ভাষার সমর্থনে অনেকগুলো ধারালো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই দুজন প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিকে, তাঁদের জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করেই বোধহয়, [সরকারপক্ষ] কোনরকম প্রত্যক্ষ নির্যাতন করতে সাহসী হয়নি। তাই বলে তাঁদের উপর যে চাপ দেওয়া হয়নি সেকথা সত্য নয়।

অন্যান্য যে সকল শিক্ষক ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জেলখানায় পাঠিয়েছিল সরকার। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ড. নাজমুল করিম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম এবং জগন্নাথ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ— এঁদের সকলকে দীর্ঘকাল কারাগারে আটক থাকতে হয়েছে। তাছাড়া গোটা বাংলাদেশের কত শিক্ষকের উপর পুলিশি নির্যাতন চলেছে এবং কত শিক্ষক যে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব এখনো নিরূপণ করা হয়নি।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শিক্ষা সংস্কৃতির উপর সরকারি হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের শিক্ষকেরা তো পিছিয়ে ছিলেন না, বরং এগিয়েই এসেছিলেন। তবে শুধু প্রতিবাদ দিয়ে কিছু হয় না, তার সঙ্গে সামাজিক শক্তির সংযোগ ঘটা চাই। শিক্ষকদের সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ অনেক সময় গণমানসে সাড়া তুলেছে এবং তা রাজনৈতিক আন্দোলনেও সঞ্চার করেছে বেগ।

শিক্ষকেরা রাজনীতিক নন। শিক্ষানীতি এবং রাজনীতির মধ্যে গোটা সমাজের নিরিখে সম্বন্ধ থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় তা প্রত্যক্ষ নয়। সরকার শিক্ষানীতির মধ্যেই রাজনীতি খাটিয়েছে, তাও আবার ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদীর্ঘস্থায়ী করার রাজনীতি। বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। কেননা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন করে গোটা জাতিকে পুরোপুরি সৃষ্টিশক্তি রহিত করে কায়েমি স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন।

শিক্ষকদের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রকৃতি মোটামুটি দুই ধরনের হলেও মূলত তা এক লক্ষ্যাভিসারী। কিছু কিছু শিক্ষক নেহায়েত শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ

থেকে পাকিস্তানি কর্তাদের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন, কেননা এ নীতি প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থি। আবার অধিকতর রাজনীতি সচেতন শিক্ষকেরা দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, সরকারি রীতির মধ্যে ঔপনিবেশিকতার অভিসন্ধি ধরতে পেরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর কর্তৃপক্ষ উর্দু বাংলা মিশিয়ে একটা 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' তৈরি করতে চেয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন শিক্ষক তার বিরোধিতা করেছেন, যেহেতু ভাষার নিয়মানুসারে দুইটি বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক এককের দুটি ভাষা কারো নির্দেশে একটা সময়সীমার মধ্যে এক হয়ে উঠতে পারে না। যাঁরা রাজনীতি সচেতন, বাঙালির স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ভুলিয়ে দিয়ে গোটা জাতিকে চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে দাস করে রাখার সুচিন্তিত পরিকল্পনাই তাঁদের প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলা লিপির স্থলে রোমান কিংবা আরবি লিপি প্রবর্তনের প্রশ্নেও এই দ্বিমুখী প্রতিবাদ উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত হল, এটা বিজ্ঞানসম্মত নয়, আবার রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ একটু যাঁরা অনুধাবন করতে পারেন, তাঁরা সরকারি ষড়যন্ত্রের রূপরেখাটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। পাকিস্তানি কর্তারা যে দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দু'মুখো উপায়ে গোটা শিক্ষাপদ্ধতির উপর হামলা করেছে, গোড়া থেকে ক্ষীণ-অস্ফুট হলেও তার বিরুদ্ধে দু'মুখো প্রতিবাদ ফুঁসে উঠেছে। প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর হামলার দুটি পদ্ধতি যখন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিশেছে তখনই তাবৎ ধর্মগত সংস্কারগত কুয়াশার অন্তরাল থেকে বাংলাদেশকে উপনিবেশ করে রাখার গূঢ় ইচ্ছেটি শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতিতে ও নানা সিদ্ধান্তে নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছে। প্রতিবাদের দুটি ধারাও ভিন্নতর আরেকটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে উপনিবেশবাদ ঠেকাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তার প্রথম সরব প্রকাশ ঘটে উনিশ শ' বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।

কেউ কেউ ভাষা আন্দোলনকে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন মাত্র বলে থাকেন। আমরা মনে করি সে বিচার যথার্থ নয়। ভাষা আন্দোলনে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের দাবিটা প্রত্যক্ষ, কিন্তু তলায় কুঁড়ির মধ্যে ফুলের মত রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবিও ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে একটি একটি করে পাপড়ি মেলছিল। প্রথম দিকে শিক্ষকরাই এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, পরে ছাত্রদের মধ্যে, তারপর রাজনীতিকদের মধ্যে, তারও পরে গোটা দেশের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার গোড়া থেকে সন্দেহ করে যে শিক্ষকদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, চাকরি খেয়েছিল, কারারুদ্ধ করেছিল সে শিক্ষকেরাই প্রথমবারের মত পাকিস্তানি শিক্ষানীতির গোড়া ঘেঁষে কুঠারাঘাত করলেন। শিক্ষকদের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য।

৫

সেনাপতি আইয়ুব খানের পাকিস্তানের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে এক ধরনের স্বৈরাচারী নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। তিনি হামুদুর রহমান নামে একজন কুখ্যাত ব্যক্তিকে সভাপতি করে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য কমিশন বসালেন। কমিশনের রিপোর্টে যে সকল বিষয়ের সুপারিশ করা হয়েছিল তাতে জনগণের জীবনের বাস্তব দাবির চাইতে স্বৈরাচারী একনায়কের আকাঙ্ক্ষাই অধিক বিম্বিত হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাকে অনাবশ্যক জটিল এবং সর্বসাধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় করে তোলার তোড়জোড় চলতে লাগল। বেশি লোক যাতে শিক্ষিক হয়ে উঠতে না পারে সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হল। সামরিক সরকারের শাসনযন্ত্র চালাবার আমলা এবং কেরানি সৃষ্টি করা ছাড়া শিক্ষার অন্য কোন ভূমিকা নেই— এটাই হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মূল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ব্যয় এত বাড়ানো হল যে গরিবের ছেলের উচ্চশিক্ষা লাভ করার কোন পথই খোলা রইল না। গোটা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রবল আন্দোলনের মুখে একনায়ক আইয়ুব হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর যে হামলা হয়েছে, শিক্ষকদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, নৃশংসতায় আর হৃদয়হীনতায় পূর্বে তেমনটি আর ঘটেনি। সামরিক প্রধান শিক্ষা সম্প্রসারণের চাইতে সঙ্কোচনের নীতিতে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এখানে সেখানে কয়েকটি সুদৃশ্য ইমারত তৈরি করে তাতে প্রবেশের অধিকার বিশেষ বিশেষ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। গোটা রাষ্ট্রীয় জীবনপ্রবাহের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাকেও একনায়কতন্ত্রমুখী করে তুললেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সামরিক শাসনের পকেট করে তোলা হল। শিক্ষকের বাক্যের চিন্তার এবং কর্মের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটির প্রধান করা হল একজন সরকারি আমলাকে। তাঁদের মধ্যে ছিল না কোন ঔদার্য ন্যায়বোধ ও নীতিনিষ্ঠা। সামরিক সরকারের নির্দেশে দাস-মনোভাবাপন্ন নাগরিক গড়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। আইন করে দেওয়া হল শিক্ষকেরা কোন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই আড়ষ্ট হাসফাঁস করা পরিবেশে স্বাধীন চিন্তার উদ্গমের কোন পথ আর খোলা রইল না। কোন শিক্ষকের লেখায় কিংবা কথায় দেশপ্রেম, মানবপ্রেম এং স্বাধীন চিন্তার সামান্যতম অঙ্কুর দেখলেই তাঁকে চাকরি ছাড়তে হত অথবা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত।

লেখার জন্যই খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল-আজাদকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর বাঙালির সংস্কৃতির উপর কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁকে

নাকি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, হয় তিনি গ্রন্থগুলো প্রত্যাহার করবেন অথবা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হবেন। উমর সাহেবকে চাকরি ছেড়েই আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক সামরিক সরকারের দাপটে টিকতে না পেরে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন কৃতী শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদকেও বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল।

এঁরা খ্যাতিমান, এঁদের কথা মানুষ জানতে পেরেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরে শিক্ষকেরা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, চাকরি হারিয়েছেন, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই। সামরিক সরকার একটা নিয়মিত গুণ্ডাবাহিনী পুষতো সরকারি ব্যয়ে। এই গুণ্ডারা তাদের ভাল ক্লাস দিতে শিক্ষকদের বাধ্য করত, পরীক্ষার হলে বই খুলে উত্তর লেখার সুযোগ আদায় করত। যে সমস্ত শিক্ষক সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতেন, দল বেঁধে চড়াও হয়ে সে সকল শিক্ষকের উপর শারীরিক হামলা করতে তারা কসুর করত না। শুধু শিক্ষা নয়, সংস্কৃতির আরো নানা ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা প্রবেশের পথ শক্ত হাতে বন্ধ করে দেওয়া হল।

লেখকদের সঙ্ঘ ইত্যাদি করে প্রতিশ্রুতিশীল শক্তিমান লেখকদের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারখানা খোলা হল। বস্তুত আইয়ুব শাসনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে সামরিক সরকারের আমলা এবং কেরানি তেরির ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত করা হল। বিশ্ববিদ্যালয় যে একটা ক্ষুদে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বিষয়ে চিন্তা করার, অধ্যয়ন করার, মতামত ব্যক্ত করার এবং গবেষণা করার অধিকার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামরিক সরকারের মহাফেজখানায় রূপান্তরিত করা হল। আইয়ুব খান আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত রাজনৈতিক আকাশে উদিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা-কল্পনা নিজের খেয়ালখুশিমতো পরিচালনা করতে লাগলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মূল্যহীন হয়ে গেল, ঐতিহাসিক সত্য মর্যাদাভ্রষ্ট হল, সাহিত্যের উদারতা অর্থহীন হয়ে গেল, ঐতিহাসিক সত্য মর্যাদাভ্রষ্ট হল, সাহিত্যের উদারতা অর্থহীন ধ্বনিতে পর্যবসিত হল, রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা নিল।

সেই সময় বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষের মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সব মিথ্যে, সত্য শুধু স্বৈরাচারী নায়ক আইয়ুব খান। এই সময় একদিন আইয়ুব খানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটাও রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রসূত, সংস্কৃতির উপর অন্যান্যবারের মত একটি হামলা। শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি এসে যুক্ত হল। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল সরকার।

আইয়ুব খানের আমলেই শিক্ষাপদ্ধতির সবচেয়ে বেশি বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তথাপি এই সময়েই জাতীয়তামুখী একটা শিক্ষার ধারা জাতীয়তার প্রয়োজনেই ভেতর থেকে গড়ে ওঠে যা পাকিস্তানি শিক্ষানীতির বিরোধী। কোন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তার কোন হদিস পাওয়া যাবে না। জাতীয় প্রয়োজনের স্বীকৃতি এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকাশের উদগ্র তৃষ্ণাই এই নতুন অলিখিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসূতি। যে সকল শিক্ষক এই শিক্ষাধারার বিকাশে শ্রম এবং সাধনা নিয়োগ করেছিলেন, কেউ তাঁদের মাইনে দেয়নি, কেউ তাঁদের পুরস্কৃত করেনি। অপমান এবং লাঞ্ছনাই তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে বেশি। আইয়ুব খানের আমলেই শিক্ষক এবং সংস্কৃতিসেবীরা নানা নিরিখে থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিরিয়াস গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সাহসের এবং ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার ফলশ্রুতির কথা সকলে জানেন। আইয়ুব খানের সিংহাসন ছাড়তে হয়েছে, ইয়াহিয়া খানকেও যেতে হবে। আজকের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের মনের যে বারুদের ঘরে আগুন লেগেছে, তার যোগানদার শিক্ষকরাও ছিলেন।

৬

শিক্ষকের পরে শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই। বই মানে চিন্তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস, অনুসন্ধিৎসু মনের সূর্যজ্বালা প্রশ্নমালা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের জবাব এবং বস্তুর রহস্যভেদের নির্মল প্রতিবেদন। পাকিস্তান সরকার শিক্ষাসংস্কারের নামে বইয়ের পঠন-পাঠনের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করল। যে সমস্ত বইয়ের সঙ্গে সরকারি মনোভাবের মিল হল না, অথবা যে সমস্ত বই পড়লে কুসংস্কার কেটে গিয়ে যুক্তিবাদিতার উন্মেষ ঘটে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, ইতিহাসে সে সমস্ত বইয়ের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

বাংলাদেশের মানুষের মন যাতে চিরদিনের জন্য অবিকশিত থাকে, তার স্বভাবের কূপমণ্ডূকবৃত্তি অটুট থাকে, তার জন্য একটা ধর্মীয় মোহের আবেষ্টনী সৃষ্টি করা হল, যার চারধারে শক্ত করে বসানো হল আইনের পাহারা। বিদেশ থেকে ভাল বই আমদানি করা একেবারে বন্ধ করে দিল, অথচ ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় সমাজের রঙিন বেলেল্লাপনায় ভরপুর এমন সব বই আমদানি করে বাজার ভরিয়ে তুলল। উদ্দেশ্য, ছাত্র ও তরুণদের বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার বদলে উন্মার্গগামী করে তোলা।

যেসব বই মানুষের মনের প্রশ্নশীলতা বৃত্তিকে শাণিত করে তোলে, জগৎ এবং জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রেরণা দেয় সে ধরনের বই বাজার থেকে একদম নির্বাসিত করা হল। উদাহরণস্বরূপ ইসলামি দর্শনের উপরে লেখা ও লিয়ারির বইয়ের নাম করা যেতে পারে। যেহেতু তাতে অন্ধভক্তির স্থলে যুক্তিশীলতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেজন্য তাঁর বই বিতরণ এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সরকার। একই কথা এইচ. জি. ওয়েলসের 'বিশ্ব ইতিহাসের রূপরেখা' গ্রন্থটি সম্বন্ধেও বলা

যায়। বইটির প্রবেশও বন্ধ করে দিল সরকার। ওয়েলসের সঙ্গে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সংক্ষেপে পৃথিবীর অমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ইতিহাস আর কেউ লেখেননি বললেই চলে।

সরকার বইয়ের প্রবেশ বন্ধ করে আইডিয়ার সংক্রমণ রোধ করতে চেয়েছিল। ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে যেটুকু শিথিলতা সরকারের দেখা গিয়েছে, বাংলা বইয়ের নিয়ন্ত্রণ করে তা পুষিয়ে নিয়েছে।

ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির তো কথাই ওঠে না। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার বই প্রকাশের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। তখনো ঢাকা শহরে স্কুল এবং কলেজপাঠ্য বই ছাড়া অন্যকোন গ্রন্থ প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র গড়ে ওঠেনি। ব্যবসায়ীরা কলকাতার বই আমদানি করেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করত। মাতৃভাষার মাধ্যমে যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করতে চাইতেন, কলকাতার বই ছাড়া তাঁদের অন্যকোন উপায় ছিল না। কলকাতায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার বই যে অন্যান্য আধুনিক ভাষার তুলনায় প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে তাও সত্য নয়। তবু একটা প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির জন্য কলকাতায় প্রকাশিত বই অপরিহার্য।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের দোহাই দিয়ে কলকাতার বই আমদানি একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। তার ফল দাঁড়াল এই যে বইয়ের অভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সেই সুযোগে একনায়কের সমর্থক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীরা মোটা মোটা কেতাব লিখে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে নিল। ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হত সে বই। অথচ সেসব বইয়ের অধিকাংশই মিথ্যে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে ঠাসা— শিক্ষার্থীর মনের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিকে জাগরিত করে তোলার কোন প্রেরণা যে ওসব বই দিতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। কলকাতার বই বাজারে থাকলে লাভ হত এই যে শিক্ষার্থীরা দু'দেশের বই যাচাই করে নিতে পারতেন। যেটা ভাল সেটাকেই গ্রহণ করতেন। আর লেখকেরাও কলকাতার বইয়ের অসম্পূর্ণতা নিজেদের বইয়ে পূর্ণ করার সুযোগ পেতেন। বাস্তবক্ষেত্রে তা হল না। শিক্ষানীতির অন্যান্য দিকে যেমন, তেমনি গ্রন্থের ক্ষেত্রেও কূপমণ্ডূকতাবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হল।

ফল কিন্তু যা ফলবার ঠিকই ফলেছে। যে ভয়ে সরকার পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ করেছিল সে ভয়ের ক্ষয় হল না। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত বইতে সরকারের পক্ষে ভীতিজনক ভাবধারা বিকশিত হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক আবেগে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থে এবং শ্রেণিগত প্ররোচনায় লিখিত বই উদার মানবিক আদর্শে লিখিত বইকে স্থান ছেড়ে দিয়ে আলমারির তলায় সরে যেতে বাধ্য হল। জ্ঞান, যুক্তি এবং বাংলাদেশ ও বাংলাভাষী অধিকাংশ মানুষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লিখিত বই অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্ত জয় করে নিতে সক্ষম হল। পাকিস্তান সরকারের ইসলামি শিক্ষানীতি প্রয়োগ সব বিষয়ে সব জায়গায় যেমন ব্যর্থ হয়েছে, বইয়ের জগতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

৭

বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাপারের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও পাকিস্তান সরকার পুরোপুরি উপনিবেশবাদী নীতি চালিয়ে এসেছে বিগত তেইশ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মত। শিক্ষাখাতেও বরাদ্দ অর্থের মধ্যে সবসময় আকাশ-পাতাল প্রভেদ রেখেছে। পাকিস্তানের জন্মকাল থেকে প্রতিটি বছরে পূর্বাঞ্চলের ব্যয়ের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের অর্থব্যয়ের বার্ষিক পরিমাণ যাচিয়ে দেখলে, বাংলাদেশকে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা যে ষড়যন্ত্র করেছে তার প্রকৃতিটি কি ধরনের জানা যায়।

দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বাংলার সাধারণ মানুষ লেখাপড়া-কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষায়তনের সংখ্যা বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিদ্যা এবং বৃত্তির সকল স্তরে পশ্চিমারা বাঙালিদের তুলনায় অনেকদূর এগিয়ে গেল। বাংলার মানুষের বিদ্যা এবং বৃত্তি শিক্ষা করার আগ্রহ হঠাৎ করে হ্রাস পেয়েছিল— একথা একটুও সত্য নয়। তাদের বিদ্যাশিক্ষা করার কোন সুযোগই দেওয়া হত না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের টাকাপয়সা অর্থসম্পদ লুট করে পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষার পথ সুগম করে। দেশভাগের পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমারা সাক্ষরতা এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। তার কারণ বাংলাদেশের মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অর্থ তাদের পেছনে ব্যয় না করে পশ্চিমাদের পেছনেই ব্যয় করা হয়েছে।

যে কারণে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা হঠাৎ ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে সুন্দর সুন্দর জনপদ গড়ে উঠেছে এবং নগরগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়েছে, সেই কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বেশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চিরদিনের জন্য ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। উপরে এক রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে, মুসলমান এবং ইসলামের ধুয়া গেয়ে তলায় তলায় যে হৃদয়হীন শোষণ হয়ে এসেছে তা যদি নগ্ন উপনিবেশবাদ না হয়, তাহলে উপনিবেশবাদের একটি নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে পর্বতপরিমাণ বৈষম্য রয়েছে তা কতকগুলো পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে।

১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সর্বমোট ২৬,৫০০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১,০০০টি। সে সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে এসে দাঁড়াল বাংলাদেশে ২৯,০০০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯,৫০০টিতে। এই একটি নমুনাই

প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার কত দ্রুত প্রসার হয়েছে। আর তা হয়েছে বাংলাদেশের সম্পদ লুট করে এবং বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৪৮১ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২,৫৯৮টি। সে সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে এসে দাঁড়াল বাংলাদেশে ৩,১৪০টিতে। পূর্বের তুলনায় সংখ্যাল্পতা প্রমাণ করে অনেকগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এক লাফে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে ২,৯৭০ টিতে।

একই পরিসংখ্যানের বিবরণী ১৯৭০-৭১ সালে নিলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৯৬৪ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪,৪৭২। বাংলাদেশের কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সবার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যালয়গুলোকে অভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি বললেই চলে। এই বৈষম্য শুধু প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কারিগরি প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে প্রসারিত।

১৯৬০-৬১ সালে বাংলাদেশে কলেজের সংখ্যা ছিল ৯২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৬৫। কলেজের সংখ্যা ১৯৭০-৭১ সালে গিয়ে দাঁড়াল বাংলাদেশে ২২৫ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫। অথচ জনসংখ্যার পরিমাণের নিরিখে বিচার করলে বাংলাদেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, কিন্তু কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৬৮ সালের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৫৩। তাছাড়া কলেজের মধ্যে বাংলাদেশে সরকার পরিচালিতের সংখ্যা ছিল ৩১ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১৪। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল দুইটি। অর্থাৎ ১৯৪৭-৬১ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দুইয়ে উন্নিত হল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চারে। ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াল পাঁচটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাতটি।

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল— তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইশ বছর সময়ের মধ্যে তারা বাংলাদেশকে ডিঙিয়ে গেল। সরকার জোর প্রয়োগ করে বাংলাদেশের শিক্ষাকে পেছন দিক থেকে টেনে রেখেছে। বাঙালিদের চিরদিনের জন্য দাবিয়ে রাখার মতলবে যদি বাংলাদেশের উপর এই বিমাতাসুলভ আচরণ না করেও থাকে তাহলে কি বলতে হবে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি নেহায়েত মমতাবশতই এই কাজ করেছে?

বাংলাদেশে শাসকগোষ্ঠীর অনুগৃহীত মোল্লা এবং ইসলাম-দরদিরা যখন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে মিটিং মিছিল করছে সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের

মাদ্রাসাতেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমিশন গঠিত হয়েছে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, পশ্চিম পাকিস্তানে তখন খোলা হয়েছে একের পর এক ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। শোষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামপ্রীতির গূঢ় অর্থ এ কাজের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এখনো সম্রাট আকবর কিংবা ঔরঙ্গজেব আমলের পাঠ্যসূচি বহাল তবিয়তে রয়েছে। আধুনিক জীবনবোধ, বাঁচার দাবি, মূল্যচেতনা আজকের দিনেও মাদ্রাসাসমূহে প্রবেশাধিকার পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেরিয়েছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগর। বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহ প্রতি বছর হামবড়া মোল্লা প্রসব করেছে। মাদ্রাসাগুলোকে সরকার ইচ্ছে করেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে অটুট রেখেছে। বিজ্ঞানচেতনা থেকে বাংলাদেশের মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সরকার অতীতের কুহকভর্তি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ধর্মীয় শিক্ষার নামে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে দুই অঞ্চলের অর্থবরাদ্দের মধ্যে যে তারতম্য পরিসংখ্যানের সে অংশটির উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে গেলে আনাড়ির চোখেও তা ধরা না পড়ার কথা নয়। সেজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে নানা আর্থিক বছরে কোন অংশে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার খতিয়ানটা তুলে দিলাম।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ব্যয়

সাল	বাংলাদেশ (লক্ষ টাকা)	পশ্চিম পাকিস্তান (লক্ষ টাকা)
১৯৫৪	৫	২৫
১৯৫৫	১৩	৪৭
১৯৫৬	৫	১০
১৯৫৭	১৭	৮৩
১৯৫৮	২৬	৯০
১৯৫৯	১৮	১০৮
১৯৬০	১৮	৯৭
১৯৬১	১৫	৮৫
১৯৬২	৩২	৯৯
১৯৬৩	৪২	১১৪

শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মোট শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বাংলাদেশে ব্যয় করা হয়েছে এবং বাকি শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাগেই পড়েছে। একটি দেশের দুই অংশ যদি সমান তালে এগিয়ে যেত তাহলে বলার কিছুই ছিল না, কিন্তু এক অংশের শ্রমে সম্পদে কাঁচামালে বাজারে অন্য অংশের পুষ্টি সমৃদ্ধি। এক অংশের

শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার মধ্যে সীমিত রেখে অপর অংশকে দ্রুতহারে আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘৃণ্য পদ্ধতিটিকেই পাকিস্তানি কর্তারা ইসলামি শিক্ষানীতি নামে অভিহিত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধর্মভিত্তিক সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের অন্ধকার অচলায়তনে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র পাকিস্তান গোড়া থেকেই করে এসেছে। তবে সচেতনভাবে কোন শিক্ষাবিদ পাকিস্তানি নীতির সমালোচনা করলে তাঁর মাথার উপর সরকারি আইনের ঝলসানো খড়্গ উদ্যত হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক বরাদ্দ কমিয়ে এবং শিক্ষাদর্শগত দাসত্বের প্রচার করে স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু সরকারি আমলা কিংবা কেরানি অথবা নিষ্কর্মা বেকারবাহিনী সৃষ্টি করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাই পাকিস্তানি শিক্ষানীতির নামান্তর।

সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে পাকিস্তান সরকার বাঙালি জনসাধারণকে আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। তার সাংস্কৃতিক মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করেছে, তার ঐতিহ্য পায়ে দলতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে ইতিহাসবোধ এবং বিজ্ঞানচিন্তা ভুলিয়ে দেওয়ার। বাঙালি মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবন্ত জাত। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কারণে সে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণ করেছে। এই শিক্ষা পাকিস্তানি নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

পাকিস্তানি কর্তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি, আয়োজন এবং সামর্থ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাঙালি নৈতিক সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানভাবনার দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানির চাইতে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ভীতি যা মানসিক বৃত্তিগুলোকে কুঁকড়ে রাখে বা স্ফূরিত হতে দেয় না, তেইশ বছরে সে সম্পূর্ণভাবে তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ভীতিমুক্ত হতে পেরেছে বলেই সে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাতীয় অস্তিত্বকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এই ভীতিমুক্তি প্রকৃত শিক্ষার আলোক না হলে ঘটে না। বাঙালি তা কাটিয়ে উঠেছে এবং শীঘ্রই স্বাধীন শোষণমুক্ত একটি সমাজ, নতুন একটি রাষ্ট্র সে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে।

আধুনিক যুগোপযোগী দেশের বৃহত্তম কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে একটা শিক্ষানীতিও বাংলাদেশের মানুষ রচনা করবে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

রক্তাক্ত বাংলা [কলিকাতা : মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), আগস্ট, ১৯৭১]

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

১

এটা আনন্দের কথা বাংলাদেশে বাঙালি জাতির একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। ভারত উপমহাদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশকে দিল্লির বাদশাহ্ থেকে ইংল্যান্ডের সম্রাটের ভাইসরয় কেউ কখনো শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘদিন শাসন করতে পারেননি। একটা না একটা গোলমাল সব সময় পাকিয়ে উঠেছে। এ সত্য, কিন্তু বাংলাদেশে এমন একটা রাষ্ট্র, স্মরণকালের ইতিহাসে কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার উপর দাঁড়িয়ে বেবাক মানুষ আধুনিক অর্থে একটা জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চিন্তা এবং ভাবধারার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে বাঙালি, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব সংগঠনের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে বাঙালি। তবু বাংলাভিত্তিক একটা রাষ্ট্রিক চেতনা দানা বাঁধতে পারেনি। তার কারণ বাংলার মানুষকে প্রায় একটা গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছে। ব্রিটিশের চলে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে বাংলার তৎকালীন কর্ণধারবৃন্দের মধ্যে দূরদর্শী কেউ কেউ বাংলাভিত্তিক একটা রাষ্ট্রের চিন্তা করেছিলেন। হালে সে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের হিন্দু মুসলমানের বর্বর মারামারি কাটাকাটির যুগে বাংলা-ভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গণমানসে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। বলতে গেলে বাংলা সমগ্র উপমহাদেশের একটা রাজনৈতিক আন্ডারড্রেন ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙালি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দিয়েছে সবচেয়ে বেশি, পেয়েছে সবচেয়ে কম। সাবেক পূর্ব-বাংলার মানুষ এককাট্টা হয়ে জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান আন্দোলনকে করেছে সফল। সে সাধের পাকিস্তান পূণ্যভূমি, তেইশ বছর বুকের ওপর বসে বাঙালিকে শোষণ করল। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ মেনে নিতে হয়েছে। একটা দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে হল।

একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, একটি জাতি হিসেবে ভূ-গোলকের এই অংশে বাংলাদেশের জনগণের অভ্যুদয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছেন পশ্চিম-বাংলার বাঙালি। তাঁরা প্রায় নব্বই লক্ষ গৃহহীন, আশ্রয়হারা আতঙ্কতাড়িত বাংলাদেশের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন! প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতির সময় খাবারের সংস্থান

করেছেন— এমনকি জলের গ্লাসটিও ভাগাভাগি করেছেন। পশ্চিম-বাংলার বাঙালি জনগণও পরোক্ষে বাঙালির এই মুক্তিসংগ্রামে শরীক হয়েছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবদানকে আমি খাটো করে দেখাতে চাইছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনমতকে বাংলাদেশের গণসংগ্রামের সপক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে পশ্চিম-বাংলার জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো পশ্চিম-বাংলা শাখার চাপে পড়ে বাংলাদেশের গণসংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছেন। পশ্চিম-বাংলার বাঙালি তাঁরা যে ধর্মের যে দলের হন না কেন, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, দেশীয় সরকারসমূহ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ দিয়ে তাঁদের সমর্থন সমসূত্রে দাঁড় করিয়েছেন। তার কারণেই ভারত সরকার সামরিক সাহায্য দিতে পেরেছেন এবং বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। পশ্চিম-বাংলার বদলে যদি ভারতের অন্যকোন প্রদেশে বাংলাদেশের মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তাঁদের কষ্টভোগ হত অনেক বেশি। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ও আসত অনেক দেরিতে— এরকম সন্দেহ পোষণ করার কারণ রয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য দিয়েছেন, তাঁদের সংগ্রামে সমর্থন করেছেন প্রথমত, মানবতাবোধের কারণে; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক কারণে। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মানুষ আবেগের ঘনত্ব দিয়ে এই সংগ্রাম সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে পশ্চিম-বাংলার বাঙালিদের সমর্থনের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সমর্থনের মধ্যে একটা পরিমাণ এবং গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

পশ্চিম-বাংলার জনগণ সর্বান্তকরণে এই সংগ্রাম যে সমর্থন করেছেন তার মুখ্য কারণ বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বে একটা জাতি হিসেবে আত্মপরিচিতি তুলে ধরার জন্য সংগ্রামে নেমেছেন, রণধ্বনি তুলেছেন। এটা পশ্চিম-বাংলার জনগণের বুকের গভীরে যত বেশি বেজেছে অন্য ভারতীয় প্রদেশবাসীর ততটা বোধ হওয়ার কথা নয়। কেননা বাংলাদেশে এবং পশ্চিম-বাংলার জনগণের মধ্যে একই ঐতিহ্য, একই সংস্কৃতি এবং একই ধরনের জাতিতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম-বাংলার জনগণ একসঙ্গে বাস করেছে। ব্রিটিশ আমলে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। বাংলার প্রাগ্রসর জনগণের প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকারকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে। তারপরেও বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল, উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত বর্তমানে ত্রিখণ্ডিত হয়েছে। বাংলাদেশ সমগ্র বাংলার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। শুধু ধর্মগত কারণে আলাদা হয়েছে। সেই দুই-তৃতীয়াংশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার দাবিতে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। ক্ষাত্র তেজকে দেদীপ্যমান করেছে, চূড়ান্ত ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে— এসব পশ্চিম-বাংলার মানুষের অন্তিক চেতনায় গর্ববোধ জাগিয়েছে, তার ঐতিহাসিক অহংবোধে প্রবল একটা শিহরণের সঞ্চার করেছে। স্মরণকালের ইতিহাসে যা

কোনদিন হয়নি— বাংলাদেশে তেমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং পৃথিবীতে একটি জাতি মেরুদণ্ডের উপর ভার রেখে মস্তক সোজা করে দাঁড়াচ্ছে— যার পরিচয় বাঙালি। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম-বাংলার বাঙালি মনস্তাত্ত্বিক কারণে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে অনেকটা নিজের সংগ্রাম মনে করেছেন। অন্যকোন দেশ কিংবা ভারতীয় অন্যকোন প্রদেশের মানুষের পক্ষে তেমন অনুভূতির জাগরণ অসম্ভব।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণ এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশের জনগণের কাছে সংগ্রামে সহায়তা করার জন্য অন্তরে অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ করেন বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং একাত্মতা একসঙ্গে অনুভব করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে দু' অংশের বাঙালি পরস্পরকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে, বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে চাইবেন, এটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দু' অংশের মধ্যে [সম্পর্ক] যতই ক্ষীণ হোক, পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলাদেশের মানুষের মনের চারধারে দেয়াল তুলে প্রহরী মোতায়েন রেখেছিল। ইতিহাস প্রমাণ করেছে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী চক্রের বাংলাদেশের মানুষকে আরেকটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ হিসেবে ঢালাই করার ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রক্তস্নানে শুদ্ধ হয়ে প্রখর সূর্যালোকের মত আকাঙ্ক্ষার আগুনে সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত প্রতিক্রিয়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। দু' বাংলার মানুষের চেনাজানা, মনের ভাব আদান-প্রদানের বাধা আজ অপসারিত। দু' বাংলার মানুষের মনের রুদ্ধ আকুলি বিকুলি আজ অনর্গলিত পথে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের জলের মত বেগে পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। এটা তাবৎ বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি শুভ সূচনা। দু' অংশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং মনের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতি আবার গোটা উপমহাদেশের মধ্যে প্রাণ-সম্পদে, হৃদয়ের ঐশ্বর্যে, বুদ্ধির প্রখরতায় এবং মননশীলতার নিবিড়তায় এককালের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে তেমন সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে।

২

বাংলার দু' অংশের মানুষের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি এক। আপাতত বাংলাদেশ এবং পশ্চিম-বাংলার বাঙালির মধ্যে কেবলমাত্র এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই মিল খুঁজতে হবে। অন্য কোথাও নয়। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের মানুষ ভাবে বাঙালি হিসেবে এবং পশ্চিম-বাংলার জনগণকে ভারতবাসী হিসেবে ভাবতে হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, পশ্চিম-বাংলা বাংলাদেশের বিশাল প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের জনগণ সঙ্গতভাবে আশা করেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা প্রীতির সম্পর্ক চিরদিন

থাকবে। পশ্চিম-বাংলা হতে পারে— কিন্তু বাংলাদেশ ভারতের অংশ নয়। যদি তাই হত বাংলাদেশে আলাদা একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা না করে জনগণ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিলেই পারতেন।

দু' বাংলার মধ্যে এখন থেকে যে সাংস্কৃতিক লেনদেন শুরু হয়েছে তার প্রকৃতিটি কি ধরনের হবে সচেতন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশের মানুষের তা ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে। পশ্চিম-বাংলা না হয়ে উড়িষ্যা কিংবা বিহারের সঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন হলে তেমন কথা উঠত না। পশ্চিম-বাংলার ক্ষেত্রে গভীরভাবে ভেবে দেখার কথাটি ওঠাই বরঞ্চ নানা কারণে অনেক বেশি সঙ্গত। তেইশ বছর আগেও পশ্চিম-বাংলা এবং বাংলাদেশের মানুষ একটি প্রদেশের অধিবাসী হিসাবে একসঙ্গে বাস করেছেন, এক ভাষায় কথা কয়েছেন এবং এক সংস্কৃতির চর্চা করেছেন। সিকি শতাব্দীও পুরো হয়নি, বাংলার একাংশ অন্য অংশের সঙ্গে আলাদা হল। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছুর বন্ধন থেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাকে আলাদা করা হল এবং বাংলার মানুষ তা মেনে নিয়েছে। জিন্নাহ্‌কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাঙালিদের ভেতরই গলদ ছিল। এ জন্য মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাকে দায়ি করা যায়। কিন্তু জিন্নাহর পূর্বেও তো মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর তিলক এক ধরনের দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবি উঠিয়ে-ছিলেন, এবং অগ্রসর সমাজের মানুষ এখনো তিলককে জাতীয় মনীষী হিসেবেই গণ্য করে। এটাই আশ্চর্য। দেশ বিভাগের জন্য হিন্দু মহাসভা কিংবা কংগ্রেস দায়ি নয়— শুধু মুসলিম লীগের ধর্মোন্মাদনা, স্বার্থবুদ্ধি এবং জিন্নাহর একগুঁয়েমী একতরফাভাবে দায়ি কথাটা পুরো সত্যি নয়। বাংলার মানুষ বঙ্কিম চন্দ্রকে ঋষির আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি বাংলার জাতীয় সংগ্রামের উদগাতা। খুবই বিকৃত অর্থে সত্য। তিনি সত্যিকারের জাগানোর বদলে উন্মাদ করে তুলেছিলেন। আনন্দমঠ যা বিপ্লববাদের বাইবেল ছিল— আসলে হাঁতুড়ে বিদ্যার তুকতাক ছাড়া কিছুই নেই তাতে। একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ তা স্বীকার করবেন। শ্রী রামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের দার্শনিক। তার সঙ্গে বাংলাদেশের একেশ্বরবাদী মুসলমানদের সম্পর্কটা কি? যাঁদের কথা বললাম এঁরা যে সকলে নিজের নিজের ক্ষেত্রে মহান ব্যক্তিত্ব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ জীবনে তাঁদের ইমেজ এমনভাবে পড়েছে, সামাজিক মানুষ মহতের নামের আড়ালে আপনাপন কুসংস্কার দ্বিগুণ উৎসাহে লালন করেছে। তাতে করে যুক্তিবাদিতা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে— পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও আদিমতা এবং প্রাগৈতিহাসিকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এই আদিমতার মোহ অনেকদূর পর্যন্ত শিকড়িত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রনায়ক মহাত্মা গান্ধী যে ধরনের দর্শন প্রচার করেছেন তা কি একটা জাতিকে সত্যি সত্যি প্রগতিশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পথে ধাবিত করতে সক্ষম? এই মহাপুরুষদের কর্ম, চিন্তা এবং দর্শন থেকেই ভারতবর্ষের জনগণ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছে। যুক্তিহীন

অন্ধ সংস্কার যদি অগ্রসর সমাজকে বিপথে তাড়িত করতে পারে, অনগ্রসর সমাজ আরো বলবান সংস্কারের কাছে আত্মনিবেদন করবে তা এমন কি বিচিত্র? যেমন ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা প্রয়োজন; সেজন্য খিলাফতকে রক্ষা করা চাই। তুর্কির সম্রাট হারেমের সংখ্যা বাড়াবেন এবং অধিক সংখ্যক রমণীর সঙ্গে রমণ-রণ করতে সম্রাটকে সিংহাসনে আসীন রাখার জন্য ভারতের মুসলমানকে আন্দোলন করতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, তার সৃষ্টিশীল শক্তির সিংহভাগ ব্যয় করতে হয়েছে। বছরের পর বছর ভারতের মুসলমান আন্দোলন করেই মরল, কাজের বেলায় দেখা গেল তুরস্কের মুসলমানেরাই সেই সম্রাটকে খেদিয়ে দেশের বার করে দিল। এমনি কত ধরনের অজ্ঞতা। অজ্ঞভাবে দেশকে ভালবাসলে তা যে শেষ পর্যন্ত দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অশিক্ষিত, অনগ্রসর চেতনার মুসলমানদের কাদার মত মনে যে কোন হামবাগ মোল্লা মওলানা আরবি ফার্সি দুয়েকটা বয়েত আউরে স্বর্গের ছবি অনায়াসে এঁকে দিতে পারত। সে আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের ফলশ্রুতি জিন্নাহর কিংখাবে মোড়া সাধের পাকিস্তান। দুনিয়ার যেখানে যত গৌরবময় মুসলিম রাজ্য সাম্রাজ্য ছিল তার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হত এই পাকিস্তান। অথচ তা সত্যি নয়। যা সত্যি নয় তা টিকিয়ে রাখা যায় না। এমনিতেও ভেঙ্গে যেত। দু' অংশের বৈষম্য ভাঙনের প্রতিক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং জোরদার করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে একটা সত্য অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে ধর্মীয় চেতনার আশ্রয়ে হিন্দু মুসলমান দু'সম্প্রদায়কে ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা প্রচণ্ড ঘা লেগেছে। মুসলমানের ধর্মীয়বোধ অনেক বেশি অকেলাসিত এবং সমাজ সংগঠনের চালিকাশক্তি ধর্ম। হিন্দুর ধর্মীয়বোধ অনেকটা সূক্ষ্ম, তাই বলে নিষ্ক্রিয় একে বলা যায় না। যে সমস্ত সর্বভারতীয় নেতা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগের জীবন এবং কর্মধারা ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাইরের পৃথিবীর নিয়ম-কানুনের নিরিখে সম্মিলিত জনজীবনের স্রোতের দৈনন্দিন কর্ম নির্বাহের নিয়ামক হিসেবে রাজনীতিকে কখনো দেখেননি তাঁরা। সামাজিক শক্তির সংঘর্ষ এবং সম্বন্ধ নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টিতে ঘটনা বিচারের মাধ্যমে স্থির না করে তাঁরা তথাকথিত ঐশী প্রেরণা বা আপ্তবাণীতে আস্থা রেখেছেন। বর্বরযুগের উপযুক্ত চেতনা। তবে একথাও মিথ্যা নয়, গড়পড়তা হিন্দুর তুলনায় অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের দরুণ মুসলমান সমাজের জাড্য অনেক বেশি নিরন্ধ্র ছিল। বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার ওপরই প্রথম আঘাতটা প্রবলভাবে পড়েছে। ভারত ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পাকিস্তান ঘোষিতভাবে ধর্মীয় রাষ্ট্র। কিন্তু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়বে ভারত ঠিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়— একসময় ধর্মনিরপেক্ষতার স্তরে ওঠতে পারবে এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ছিল এবং সংবিধানে সে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কোন রকমের

নোংরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব মনে না রেখে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের বিগত কয়েক বছরের ঘটনা পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে বাংলাদেশকেই সবচাইতে বেশি ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে হবে। বাহান্ন থেকে বাহাত্তুর পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে তার প্রমাণ মেলে। দিনে দিনে জনগণের চেতনা ধর্মীয় খোলস বিদীর্ণ করে ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত হয়েছে। গোখলে একদিন বাংলা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow' কথাটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে বলা যায়— বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করবে ভারত-পাকিস্তান কাল তা চিন্তা করবে। শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্ত ভারত এবং পাকিস্তানকে বাংলাদেশ পথ দেখাবে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। দু'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটা খোলাসা হবে। ভারত এশিয়ার একটা প্রাচীনতম পুঁজিবাদী দেশ। ভারতীয় ধনপতিরা ব্রিটিশ ধনপতিদের আদর্শে জন্মলাভ করে বেড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে পুঁজি সঞ্চয় করে স্ফীত হয়েছে। তাই ভারতীয় সমাজে পুঁজিবাদীদের আসন অত্যন্ত সুদৃঢ়। স্বল্প আঘাতে তাকে টলানো যাবে এমন আশা করা সুদূর পরাহত। পক্ষান্তরে গোটা বাংলাদেশে এমন দু'জন পুঁজিপতিও বোধ হয় পাওয়া সম্ভব হবে না যার মূলধন পঞ্চাশ লাখ টাকা। বাংলাদেশের সম্পদে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তা ছাড়া একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কষ্টভোগ করতে হয় একটি প্রবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ তার বেশ খানিকটা লাভ করেছে। এই যুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষকে আরেকটা অমূল্য সম্পদ দান করেছে। বাংলাদেশের মানুষ আত্মশক্তিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠেছে। এ আলোকে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে একথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়, বাংলাদেশের সাংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে অনেকদূর ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতি, কিন্তু এ কথা পশ্চিম-বাংলা সম্বন্ধেও বলা যায় না। পশ্চিম-বাংলা ভারতের সর্বাধিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রদেশ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশগুলোর ধর্মান্ধতা এখনো অনেক বেশি তীব্র। পশ্চিম-বাংলাকে তো সমগ্র ভারতের হয়ে ভাবতে হয়, চিন্তা করতে হয়, কল্পনা করতে হয় এবং লিখতে হয়। তাছাড়া পুঁজিবাদের শেকড় সেখানে অনেক বেশি শক্ত এবং সুদৃঢ়। তাই পশ্চিম-বাংলাকে এক পা এগুলে তিন পা পেছনে যেতে হয়।

৩

পশ্চিম-বাংলার সংস্কৃতি সেখানকার সমাজবাস্তবতার প্রসূন। একথা বলা বোধ করি অযৌক্তিক হবে না, বর্তমানে পশ্চিম-বাংলায় একটা প্রচণ্ড নৈরাজ্যের রাজত্ব চলছে। সেখানে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল আপনাপন অস্ত্রাগার তৈরি করে এবং ঠ্যাঙ্গারে

বাহিনী মাইনে দিয়ে পুষে। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র নিয়মিত অসত্য এবং অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করে। যে সকল সংবাদপত্র ঘোষিতভাবে সাম্প্রদায়িক এবং অতীতে সাম্প্রদায়িক দাংগার উস্কানী দিয়েছে বলে সুনাম আছে, কি কারণে জানিনে, পশ্চিম-বাংলার বেশ ক'জন নামকরা সাহিত্যিক সে সকল কাগজে চাকুরি করেন। সবচাইতে আশ্চর্য এই ধরনের পত্রিকাগুলোর পাঠক সংখ্যাই অধিক। এই পত্রিকাগুলো তাদের বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের ভাবধারা বলতে গেলে একদম পুরাপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে থাকে। যে সকল সাহিত্যিক এ ধরনের পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠার কারণে সহযোগিতা করেন না, তাঁদের আয়ের অন্য উপায় না থাকলে, নিতান্তই কায়ক্লেশে দিন কাটাতে হয়। ইচ্ছে করলে এ ধরনের পত্রিকাগুলো যে কাউকেই মনীষী আখ্যা দিতে পারে, আবার অপছন্দ হলে শয়তানও বলতে পারে। পশ্চিম-বাংলার লেখকেরা বেশিরভাগ এখন আর আদর্শবোধ দ্বারা চালিত হয় না। যে দু'একজন আদর্শবাদী সৎ লেখক আছেন, তাঁদের পাঠক সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। যে সকল বই বাজারে বেরোয় এবং যে সকল বই পাঠক পড়ে ব্যাপকহারে, তার অনেকগুলোতেই সারবস্তু বিশেষ পাওয়া যায় না। হয়ত যৌনতা, নয়তো হাল্‌কা রসিকতা, ভারিক্কি উপদেশ কিংবা পার্টি লাইনের গালাগালি। ভাবেন, চিন্তা করেন, মানব জাতির প্রতি দায়িত্বশীল এবং সমাজ সচেতন লেখক-কবির সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। সমাজের শরীরের প্রবাহিত শোণিত পশ্চিম-বাংলার শিল্প সংস্কৃতির ধমনীতে যেন প্রবাহিত হয় না। শিল্পী সাহিত্যিকেরা বড় বেশি মেকী, বড় বেশি ভণিতাসর্বস্ব যাঁরা আদশবাদী বলে চিহ্নিত, কথা শুনে, লেখা পড়ে মনে হয় নকল আদর্শবাদী। বিপ্লবী সাহিত্যিকেরাও নকল বিপ্লবী। কিছু কিছু ভাল মানুষ আছেন— যাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় জীবনের জুয়ো খেলায় এঁরা ভয়ঙ্কর রকমভাবে হেরে যাচ্ছেন। দুয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে মনে হবে গোটা সুধী সমাজটাই বেশ আনন্দসহকারেই গতানুগতিকভাবে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। নতুন চিন্তার স্ফূরণ, নতুন আদর্শের প্রতি মমতা একেবারে নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোচ করেন। গরিব ছাত্রদের প্রতি মমতাবশত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদাশয় অধ্যাপকেরা নোট বই লিখেন। শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে আরো যাঁরা করুণাময়, পরীক্ষার হলেই ছাত্রদের কাছ থেকে মাথাপিছু দশ পনের টাকা নিয়ে বই দেখে অবাধে টুকতে দেন। উদারচেতা মানুষেরা সাম্প্রদায়িক গোলমালের সময় কিছু কিছু সংখ্যালঘুদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে থাকেন এবং কিছু ছাত্র উৎসাহের আতিশয্য দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেন। (গত দাঙ্গায় কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নানা লোককে বলতে শুনেছি ভবিষ্যতে আর দাঙ্গা হবে না।) কোলকাতা, রবীন্দ্রভারতী এবং যাদবপুর— মহানগরীর এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি, ফার্সি ছাড়া একজনও মুসলমান শিক্ষক নেই বলে শুনেছি। এমনও হতে পারে মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষায় অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। তবে ভারত তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলোকে

এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব তো রাষ্ট্রেরই। সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি দেখে সুস্থ মানুষের মনে হবে, উনিশ শতকে এই কোলকাতা শহরে যে একটা রেনেসাঁর তরঙ্গ জেগেছিল, যার প্রভাবে পশ্চিম-বাংলার সংস্কৃতির নানাক্ষেত্রে বিশ্ববিশ্রুত মনীষার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, হালের পশ্চিম-বাংলায় সম্ভবত তার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অবসিত হয়েছে। অতীতের প্রাণসম্পদের এক কণাও বোধহয় পশ্চিম-বাংলায় নেই। অতীতের সমস্ত মল্য চেতনা এখন সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত, নতুন মূল্য চেতনা এখনো পরিদৃশ্যমান নয়। নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকেরা যে শ্রম করছেন, ঝুঁকি নিচ্ছেন কিংবা কষ্ট স্বীকার করছেন তেমন লেখকও মেলে না। অবশ্য এমন মানুষ দু' পাঁচজন আছেন, যাঁরা সোনালি অতীতের গৌরবের কথা স্মরণ করে লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাস্ এইটুকু। তাঁরাও চিন্তার মত চিন্তা করেন না, কথার মত কথা বলেন না— কোন রকমে দায়িত্ব এড়াতে পারলেই বেঁচে যান। এক কথায় পশ্চিম-বাংলা একটি মারাত্মক স্বস্তিহীনতায় ভুগছে। ছাপাখানার কল্যাণে এই স্বস্তিহীন কাপুরুষতা প্রতিদিন হাজার হাজার গল্প কবিতার আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। লেখকদের মনের সৃষ্টিনাশা চেতনাই এসমস্ত গল্প কবিতার কারণ— যা কাউকে স্বর্গ-নরক কোথাও নিয়ে যাবে না।

৪

পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। দিনে দিনে তা আরো নিবিড় হবে। বাংলার দু' অংশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিক্ষা করে আসছেন। এক অংশে শিল্প সংস্কৃতির অগ্রগতি কতদূর হল অন্য অংশের মানুষ তা জানতে পেলে লাভ বই ক্ষতি নেই। এ বাংলার প্রকাশিত বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা ও-অংশে গেলে সেখানকার মানুষের অনেকগুলো ভুল ধারণার অবসান ঘটবে। তেমনি আবার ও-অংশের প্রকাশিত বই পত্রপত্রিকা এ-অংশে এলে এখানকার মানুষ অনেক বিষয়ে জানতে পারবেন। দু' অংশের এই মানসিক লেনদেন, এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে গোটা বাঙালি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধি আসবে। বিশেষ করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন এবং গবেষণার জন্য যে সকল গ্রন্থের প্রয়োজন তার অভাব বিগত তেইশ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করার মত। দেশ বিভাগের পর থেকে এ অংশে লৌহ কঠিন বিধি নিষেধের মধ্যেও বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের যতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, পশ্চিম-বাংলায় ততদূর হয়নি। অথচ সেখানে কোন সরকারি বিধিনিষেধ ছিল না। সাবেক পূর্ব-বাংলা ঘোষিতভাবে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা সত্যি। কিন্তু তার শিল্প সাহিত্যে ধর্মান্ধতার কোন ছাপ কদাচিত চোখে পড়ে। পশ্চিম-বাংলা ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের আওতাভুক্ত। তার শিল্প সংস্কৃতি অনেক বেশি মানবিক এবং পরিচ্ছন্ন হবে এটা প্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু

কার্যত তা হয়নি। সেখানকার অনেক নামকরা সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকতাবোধ উসকে দেয়ার জন্য গ্রন্থ লিখেছেন। সবচেয়ে অবাক করে যারা জ্ঞানীগুণী এবং পাঠক সমাজের মধ্যে থেকে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়নি। বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'পূর্ব-বাংলার মুসলমান' সমাজ শীর্ষক একটি রচনা চোখে পড়ে। লিখেছেন শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি নাকি বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক। সাবেক পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশের মানুষ অনেকাংশে পিছিয়ে আছে একথা মিথ্যে নয়— কিন্তু ভদ্রলোক এমন সব উক্তি করেছেন যার কোন ভিত্তিই নেই। পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে শ্রী দত্তের লেখার তারিফ করে পাঠক সাধারণের চিঠি ছাপা হতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আমাকে বলা হয়েছে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্ররা নয়, শুধু জুনিয়ার অধ্যাপকেরাও বড়জোর মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওলের নাম জানলেও তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানেন না। কবি রজনীকান্ত সেনের কবিতা স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নাকি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে। তাই বলে পশ্চিম-বাংলায় পরিশ্রুত চেতনার মানুষ নেই, একথা একেবারে মিথ্যা; এবং তাঁদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু হলে কি হবে। একটি গোষ্ঠী তাঁদের লাভ লোভের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে টিকিয়ে রাখতে চান এবং তাঁরাই শিল্প সংস্কৃতির হর্তাকর্তা, এবং প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকাগুলোর মালিক।

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের লেনদেনের ফলে ওই সকল পত্রপত্রিকাগুলো বাংলাদেশে আসবে। বৃহত্তর বাজার দখল করার জন্য হয়ত এগুলোতে ভদ্রগোচের রচনা প্রকাশিত হবে। যে সকল লেখক সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে লিখে পশ্চিম-বাংলার পাঠকের গাঁঠ কেটেছেন, এবার থেকে বাংলাদেশের পাঠকের গাঁঠ কাটার জন্য একটা মুখোশ পরে লিখবেন। প্রয়োজন মনে করলে বাংলাদেশের দুয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনাও কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপবেন। তাতে করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃজিত হওয়া সম্ভব নয়। বিগত তেইশ বছরে বাংলাদেশে একটিও নিয়মিত সাময়িক পত্রিকা পাকিস্তানি সরকারের আরোপিত বিধিনিষেধের দরুণ চলতে পারেনি। পশ্চিম-বাংলার পত্রপত্রিকা অবাধে আসতে থাকলে এদেশে নতুন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ নানা কারণে ব্যাহত হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই মজ্জাগত হীনমন্যতার কারণে পশ্চিম-বঙ্গের পত্রিকাগুলোর দুয়ারে রচনা প্রকাশের জন্য ধর্না দিতে আরম্ভ করবেন। এরই মধ্যে কারো কারো সে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প এখনো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়। বাংলাদেশের লেখকদের রচনা পশ্চিম-বাংলায় মুদ্রিত হয়ে যদি আসে তাহলে প্রকাশকদের স্বার্থ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁরা নতুন লেখকের রচনা প্রকাশে অনুপ্রাণিত হবেন না। অথচ শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতাকে প্রবহমান রাখার জন্য নতুন লেখকের রচনা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

মোটকথা আমাদের নতুন রাষ্ট্রের যা দাবি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি তা আমাদেরকে এই দেশেই সৃষ্ট করতে হবে। যতই কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হোক না কেন এই দেশে আমাদের মৌলিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় মত একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের যা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ দিতে পারে না— পশ্চিমবঙ্গের সে ক্ষমতা নেই। আমাদের সমাজের সচেতন অংশ যত তাড়াতাড়ি এই দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন ততই মঙ্গল। পশ্চিম-বাংলা থেকে আমরা একমাত্র সে ধরনের পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা আমদানি করতে পারি যা আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের মানুষ একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এই স্বাধীনতার যা সম্ভাবনা বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যে মূর্ত করে তুলতেই হবে, নয়ত ব্যক্তিক জীবনে, সামাজিক জীবনে এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। একমাত্র বাংলাদেশেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন শোষণহীন সমাজ অতি তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা সম্ভব। ভারত উপমহাদেশের অন্য দু'টি রাষ্ট্রের সে সম্ভাবনা এখনো সুদূর পরাহত। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করলেও সমাজে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা দিতে ওসব দেশের সময় লাগবে। বাংলাদেশের জনগণের ভারত উপমহাদেশের অন্য দু'টি দেশকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা। বাংলাদেশের জনগণের কাঁধে ইতিহাস এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে— হেলাফেলা করার কোন উপায় নেই। বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যকেও অবশ্যই সে ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেয়ার কথা, যদি না পারে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। এবং যাদের নেতৃত্ব বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের চাইতে অনেক দূর পিছিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে যাবার উপায় নেই— সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। এই প্রাগ্রসর দাবির নিরিখেই দু' বাংলার জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।*

* এই লেখাটি আহমদ ছফার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালি মুসলমানের মন'-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম সংস্করণের পর লেখক নিজেই এটিকে ওই গ্রন্থ থেকে বাদ দেন।— নূ. আ.

দস্তয়েভ্স্কি

জাঁ জ্যাক রুশো তাঁর 'লে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থে রুশীয় সম্রাট 'পিটার দি গ্রেট' সম্বন্ধে একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করেছেন। ক্ষমতাদর্পী পিটারের মনে হয়েছিল প্রতীচ্য সভ্যতা জিনিসটে স্বাদে গন্ধে উত্তম। তাই হুকুম দিলেন রুশ দেশে তা ফলাতে হবে। রুশ সম্রাটের জানার কথা নয়, মাঠের ফসল আর মন মগজের ফসল ফলানোর কায়দাটা ঠিক এক ধরনের নয়। সম্রাটের হুকুম যখন মানতে হবে। মানবে কারা, যারা সম্রাটের দরবারে উজির-নাজির, হুঁকোবরদার, মনসবদার, চাকর-নওকর এরা আর কি! এমনিভাবে রুশ সম্রাটের এক কথাতে রুশ অভিজাত সমাজ বর্বরতা ঠাসা মনটা প্রতীচ্যের যুক্তিবাদী আঙরাখার তলায় চাপা দিল।

দস্তয়েভ্স্কির মনোভূমি জরিপ করতে গেলে রুশ সমাজে এ প্রাচ্য প্রতীচ্য সংস্কৃতির তীক্ষ্ণ সংঘাত সময়টির কথা স্মরণে রাখার প্রয়োজন আছে। দস্তয়েভ্স্কির মানস লোকের দু'টি ধারা গঙ্গা যমুনার মত। বয়ে গেছে পাশাপাশি। মিলন ঘটেনি কোথাও। সম্ভবত লেখক মানুষের সম্বন্ধে, জীবনের সম্বন্ধে কোন একটা মনন সমৃদ্ধ আলোকিত স্থির সিদ্ধান্তে আসতে চাননি, তবু তিনি কিছু গভীর কথা বলেছেন। গভীরে নেমেছেন ও। এই গভীরে যাওয়া এবং বেরিয়ে আসার কাজটিও হয়েছে নিজের অজান্তে। অন্তর সলিলে অবগাহন করে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠা বলতে যা বোঝায় সেটি হয়নি।

অসাধারণ কুশলী শিল্পী দস্তয়েভ্স্কি। মানব প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতায় তিনি টলস্টয়ের চাইতে অধিকতর পারঙ্গম এবং পারদর্শী। টলস্টয়ের চাইতে তিনি কিসে ছোট? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়— দস্তয়েভ্স্কি মানুষজাতটাকে টলস্টয়ের মতো প্রসন্ন উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন নি। দেখতে পারেন নি বলেই তাঁকে সুদক্ষ মনোবিজ্ঞানীর মত পেঁয়াজের খোসার মত একটার পর একটা পরত খুলে আবিষ্কার করতে হয়েছে মানুষের ভেতরে মানুষ। এক মানুষের ভেতরে হাজার মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে সামাজিক মানুষে উত্তীর্ণ হবার যে ক'টি স্তর অন্তরলোকে খোদিত রয়েছে সবগুলোর অবগুণ্ঠন খুলে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। এই দেখানোই সার। আদিম প্রবৃত্তি নিকুঞ্জের চারপাশে মানুষের চেষ্টা, শ্রম, সাধনা এবং সংগ্রামের যে বন্ধনীগুলো, যার বাঁধনে অরণ্যচারী হিংস্র পশু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সামাজিক মানুষে পরিণত হয়েছে, সেসবের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। তিনি যখন চরিত্র

বিশ্লেষণ করেন, মনে হয় মানুষের বুকের নিচের জানোয়ার জগতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলোর মানসলোকে যেন পরাক্রান্ত ষাঁড়-সিংহেরা হরদম নখ দাঁত ব্যাদান করে লড়াই করছে।

দস্তয়েভ্স্কিকে কুশলী ঔপন্যাসিক বলা যায়, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলা যায়, কিন্তু মহৎ বলতে অন্তত আমার বাধে। মানুষকে তিনি শুধু মনস্তত্ত্বের যন্ত্র বলে ঠাউরেছেন। সেজন্য একজন মানুষের সামগ্রিক কোন মূল্য তিনি নির্ধারণ করতে পারেননি। টলস্টয় মানুষ সম্বন্ধে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা নিয়ে শুরু করেছিলেন— কিন্তু শেষ করতে পারেননি। যৌবনের লেখা সুবিশাল মহাকাব্যোপম গ্রন্থ 'সমর এবং শান্তি'তে বোধের গভীরতার সঙ্গে যুক্তিবিচারের যে সমন্বয় পরবর্তীকালে তিনি সেসব নাকচ করতে চাইলেন। 'পুনরুত্থান' উপন্যাসে যুক্তিশীলতার যে অবশিষ্টাংশ ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে তা যেন পুরনো অভ্যাসেরই জের। বুড়ো বয়সে প্রতীচ্যের প্রশ্নশীলতাকে চাপা দিল প্রাচ্যের ভক্তিরস; 'সমর এবং শান্তিকে' যৌবনধর্মের দোষ বলে ঘোষণা করলেন। 'রমণী রমণ রণে ক্লান্ত' হৃত যৌবন টলস্টয়দের কপালেই জোটে অমন নিখাদ ধার্মিকতার অপবাদ। ঋষির গৈরিক, উত্তরীয় তাঁদেরই মানায় ভাল।

কিন্তু দস্তয়েভ্স্কির ব্যাপার আলাদা। জীবন সম্পর্কে কোন ঘনীভূত বোধ তাঁর মননে জমে উঠতে পারেনি। তাই তাঁর মানুষগুলো যন্ত্র না হলেও যন্ত্রের মত। অচেতনভাবে কতেক অভিব্যক্তির বশে যেন তারা চালিত হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তি, জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের অন্তরালে তিনি চিরন্তনের কথা দূরে থাক, কোন আপেক্ষিক সত্যও আবিষ্কার করতে পারেননি। নীতিশাস্ত্রের কোন রকম অস্তিত্ব তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোতে যে নীতি নিষ্ঠা দেখা যায় তা যেন নেহায়েত পশু স্বভাবের ফলশ্রুতি। টলস্টয়ের শেষ জীবনে মানুষের মর্যাদা অনেক কমে এসেছে। আল্লাহ্ ছিলেন তবু তাঁর আরাধ্য। খ্রিস্টের মূর্তি তাঁর মনে চারাগাছের মত সজীব ছিল। তাই সৃষ্টিশীল মানুষকে জীবনের বিচিত্র লীলা এবং প্রয়াস থেকে টেনে এনে সেজদায় বসিয়ে করুণাপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। এও এক ধরনের বর্বরতা।

তবু তিনি আল্লাহ্‌কে মানুষের স্নেহময় পিতা হিসেবে এবং খ্রিস্টকে মানুষের স্বজাতি হিসেবে দেখেছিলেন। এর বেশি মানুষকে নামানো টলস্টয়ের অসাধ্য ছিল।

দস্তয়েভ্স্কির আল্লাহ্ ছিল না, সমাজ ছিল না, ধর্ম ছিল না (পৈতৃকসূত্রে তিনি অবশ্য খ্রিস্টান ছিলেন), নীতি ছিল না, কেবল ছিল আমরণ সঙ্গী মনস্তত্ত্বের মার প্যাঁচ। আর তাতে অপরিসীম আস্থা। সেও স্বাভাবিক অবস্থায় নয়— নিজের ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলতেন যখন— তখনই গ্যায়টের ফাউস্ট কাব্যের সমস্ত কল্যাণ, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতি বক্রদৃষ্টিধারী মেফিস্টোফেলিসের আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথো-পকথনকালে যে কথাগুলো বলেছিলেন মানুষ সম্পর্কে, তাতে যে মনোভাব স্ফূরিত হয়েছে— একই রকম মনোভাব দিয়ে দস্তয়েভ্স্কি মানুষকে দেখেছেন। শয়তানেরও

কিছু শ্রদ্ধাবোধ ছিল। মানুষ বুকে হাঁটা সরীসৃপের মত পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করে। কিন্তু হলুদের ফোঁটার মত আত্মার দীপ্তিকে মস্তকে স্বর্গীয় পাগড়ির মত জড়াবার দুরাশা পোষণ করে। দস্তয়েভ্স্কির মানুষেরা শুধু মারামারিই করে, লোকোত্তর কোন বাসনা তাদের তাড়িত করে না।

প্রকৃতির গমনাগমনে, মানুষের জন্ম-মৃত্যুতে, সমাজে সংসারে চোখ মেলে তিনি সর্বত্র দেখতে পেয়েছিলেন একটা শ্লোগান লেখা।

তাঁর উপন্যাসে ধমনীর উত্তাপে মর্মের যে ক্রন্দন, তাতে একটি কথাই প্রতিধ্বনিত : 'নাই, কিছু নাই, কোথাও কিছু নাই।'*

* এ লেখাটি 'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে এ লেখাটি ওই গ্রন্থ থেকে লেখক নিজেই ছেঁটে দেন।—*নূ. আ.*

একটি প্রাতিস্বিক গ্রন্থ

ফরহাদ মজহারের 'প্রস্তাব' গ্রন্থটি আমাদের দেশের খুবই কম সংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। বোধকরি এটাই এ গ্রন্থের প্রধান গৌরব।

কোন কোন মনুষ্য সমাজে এমন সময়ও আসে যখন তথাকথিত মননশীলদের ক্লান্ত মস্তকে গুরুপাক সারবান কোন বস্তু হজম হতে চায় না। চুটকি এবং ধরতাই বুলিতেই তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই-ই নিবৃত্ত হয়। আমাদের সমাজের এখন সেই দশা। একারণেই ফরহাদের লেখা শিল্প সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের উৎসসন্ধানী এ সকল প্রকৃষ্ট গদ্যরচনা চর্বিযুক্ত লোলচর্ম পণ্ডিত এবং অর্বাচীন তরুণদের বেশিরভাগের কলুষ স্পর্শ বাঁচিয়ে জন্মলগ্নের অমল সুভ্রতা অনেকাংশে রক্ষা করতে পেরেছে।

ফরহাদ মজহার মরমী, মেধাবী, শ্রমশীল এবং অভিমানী কবি। বলতে দ্বিধা নেই, এমনও দিন আসতে পারে সঙ্গীতে একটা বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তকের শিরোপাও তাঁর জুটে যেতে পারে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, অর্থনীতি এতগুলো বিষয়ের অন্তরে এমন অবারিত গতায়ত করতে সক্ষম, এমন আরেকজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষ গোটা বাংলাদেশ ঢুঁড়ে দেখলেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

গ্রন্থের ভূমিকায় ফরহাদ লিখেছেন :

"আমি যুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরের নীল আদিগন্ত জলমালার ভেতর একগুচ্ছ কালো দ্রাবিড়ীয় চুল ভেসে উঠতে দেখেছি। অনাদি অন্ধকার থেকে তরঙ্গের মত নিক্ষিপ্ত চুল। জ্যোৎস্নায় মধ্যরাতে সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে তার অফুরন্ত জলকল্লোল আর জলবন্ধন থেকে শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসার বেদনা শুনেছি। ফলে ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছি উপকূলে। জানি ধীরে ধীরে চাঁদ বিলীয়মান হতে থাকবে। আর অই নারী তার মেটে শরীর আর অনার্য মুখাবয়ব নিয়ে উঠে আসবে, ভোরবেলা সূর্য ওঠার অল্পক্ষণ আগে। তার ভেজা পিচ্ছিল পাথুরে শরীর আমি মাতালের মত জড়িয়ে ধরব। তখনো কিন্তু কেউ থাকবে না, কেউ না। কেবল উদ্ভাসের আগের অন্ধকার আর শরীরময়ের সংঘাতের শব্দ, নিশ্বাস পতন ও জলকেলী।"

অন্তর্গত আবেগপ্রবাহ ইতিহাসের ভেতর চারিয়ে দিয়ে একাত্তরের রক্তপ্লাবিত সংগ্রাম থেকে রূপকল্পের মাধ্যমে বাংলার উত্থান দৃশ্যের এমন সুন্দর অনুভূতি জাগানিয়া কবিতা সাম্প্রতিককালে কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই। এই সংহত অথচ মর্মচেরা আবেগের অধিকারী একজন গীতি কবিতা লেখক কেন আপাত দুরূহ নানান

বিষয়ে একখানি নাতিবৃহৎ গদ্য গ্রন্থ লিখতে গেলেন, তার কৈফিয়ত হিসেবে ভূমিকায় আবার জানিয়েছেন :

"আমি কিছুতেই শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতিকে আলাদা করতে পারলাম না আর। বুর্জোয়া বিকাশের তুরীয় পর্যায়ে মানুষ নিজেকে যেভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে, তেম্নি তার সমুদয় চিৎশৈলীকেও ভেঙ্গে ফেলে লক্ষ ভাগে। শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভক্তিকরণ ঘটে দ্রুত। সবকিছুই যেন ডিপার্টমেন্টাল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা। টুটা ফাটা। নিটোল সম্পূর্ণতা যা আমাদের কাম্য, অপসৃত হয়। সমগ্রতার যে লাবণ্য তা আমাদের কৃৎকলার শরীর থেকে শীতগ্রস্ত পাতার মত টলে টলে ঝরে যায়। আজ আমার মনে হয়, আমি একটি পরিপূর্ণ শরীরকে পেতে চাই নিজের ভেতর এবং তার সঙ্গে একটি মানবীয় মন, যা শুধু আপন উল্লাসেই ঈশ্বর।"

লেখকের এই সহজ ঘোষণা থেকে একটি কথাই বেরিয়ে আসে। মানব চৈতন্যের স্বরাটতা এবং অবিভাজ্যতার অন্বেষণই তাঁর অন্বিষ্ট। মানুষের নানাবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের আপন স্বরূপের আলোই বিচ্ছুরিত হয়। বিজ্ঞান, কাব্য, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি কিছুই তার আওতার বাইরে নয়। তাই স্বাভাবিকভাবে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি এসকল বিষয় ফরহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পেরেছে। তিনি সাহসের সঙ্গে অন্তরের সমস্ত প্রত্যয় দিয়ে উচ্চারণ করার মত কোন বক্তব্য খুঁজে পেয়েছেন কিনা, সে কথা অবান্তর। প্যাশোনেট অনুসন্ধানই হল মানুষের অন্তরের প্রমিথিয়ান অগ্নি। অনুসন্ধান জীবন, অনুসন্ধান যৌবন আর অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই হল মানুষ এবং পশুর মধ্যবর্তী সীমানা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আমাদের জাতীয় মেধা মনন, এবং চৈতন্যের বিকশন পরিশীলনের যে প্রতিশ্রুতি সুপ্ত ছিল, সাম্প্রতিককালে ফরহাদের মত গদ্য রচনায় সে প্রতিশ্রুতি অন্যকোন লেখক এমনভাবে জ্বালিয়ে তুলতে পারেননি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা যে ক্রমশ অবসিত হয়ে আসছে, আমাদের লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষক এমনভাবে জ্বালিয়ে তুলতে পারেননি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা যে ক্রমশ অবসিত হয়ে আসছে, আমাদের লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষক চিন্তাবিদদের চূড়ান্ত রকম সুবিধেবাদী পরাজিত পলায়নী মনোভাব এবং দায়িত্বহীনতাই তার মূল কারণ। ফরহাদের এই রচনাগুলো অকস্মাৎ চাপ চাপ নিশ্চিদ্র অন্ধকারের ভেতর থেকে একগুচ্ছ অগ্নিপুষ্পের মত ফুটে উঠেছে।

এই সকল রচনার মধ্যে তিনি সর্বত্র বিজ্ঞতার এবং বিষয় নিষ্ঠতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন তেমন কথা আমরা বলব না। আসল কথা হল, অনুরাগ নিয়ে, নিষ্ঠা নিয়ে, প্রয়োজনীয় শ্রম বিনিয়োগ করে প্রতিটি বিষয়ের অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের জনগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে বাংলাভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যা বলতে চেয়েছেন, সঠিকভাবে পাঠকের উপলব্ধির কাছে ধরিয়ে দিতে পেরেছেন কিনা সে প্রশ্নও এ মুহূর্তে উত্থাপন করতে চাইনে। প্রতিটি মানবকর্মের

দু'টি বিভাগ। এক হল কর্তার উদ্দেশ্য, অন্যটি হল কর্মের ফলাফল। ফরহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশে ভাষা সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করে থাকেন, তাঁদের চিন্তা, মনন এবং মেধার প্রকৃত স্ফূর্তির জন্য এই সকল বিষয় তাঁদের অনুরাগ আকর্ষণ করুক। কারণ আধুনিক চিন্তা-চেতনা এবং অনুসন্ধান শৈলীর এই সকল প্রক্রিয়া যদি সক্রিয় এবং সচেতন অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠে না-দাঁড়ায় তা'হলে ডোবার মত নিস্তরঙ্গ আমাদের জাতীয় মানসে সমুদ্রের তরঙ্গ জাগবে না।

বাস্তবিকই ফরহাদ তাঁর এই গ্রন্থে আমাদের চারপাশে অনেকগুলো জানালা খুলে দিয়েছেন এবং সমাসসন্ধি বিশারদ বৈয়াকরণ মণ্ডলীর আত্মতৃপ্ত নাদুস নুদুস জাবরকাটা মনোভাবের মধ্যে একটা উপদ্রব সৃজন করে দিয়েছেন।

ফরহাদের অনুসন্ধানের পরিধি কত প্রসারিত এবং বিস্তৃতসূচিপত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি গোচর হবে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বারোটি প্রবন্ধের শিরোনাম হল : (১) মানবীয়তার সংজ্ঞা (২) বিচ্যুত চেতনা ও মানবীয়তা (৩) ভাষা ও চিন্তা (৪) ভাষা বিপ্লব-লালিত বিদ্রোহ (৫) ঐতিহ্য উদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে (৬) ভাষা ও শ্রেণী সংগ্রাম (৭) শিল্পের প্রাকৃতিকতা প্রসঙ্গে (৮) নোআম চমস্কি, তাঁর দর্শনের ব্যাকরণ (৯) নিজের মানুষের জন্যে কবিতা (১০) শব্দ, শব্দলীলা, সঙ্গীত (১১) ক্লদলেভি স্ট্রস— স্ট্রাকচার প্রত্যাশী নৃতাত্ত্বিক কাব্য (১২) প্রস্তাব।

এই গ্রন্থের দু' দুটো রচনার উপর আলোচনা করার মত বিদ্যেবুদ্ধি বর্তমান নিবন্ধ লেখকের নেই। তা ছাড়া বাকি রচনাসমূহ অত্যন্ত ঋদ্ধ এবং শাণিত। অন্তর্গত বিষয়বস্তু নিয়ে হয়ত বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, তা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ফরহাদ তো আর ধর্মগ্রন্থ লিখতে বসেননি যে তিনি যা লিখবেন, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে। প্রায় প্রতিটি রচনাতে বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ভাষা শোভন, শালীন এবং একেবারে আধুনিক। সেই কারণে কোথাও কোথাও নতুন প্রতিশব্দ টামিনলজি এসব নির্মাণের অপচেষ্টাও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর। অনেক তত্ত্ব এবং তথ্যের অবতারণা করেছেন। প্রতিটি রচনার মধ্যে এন্তার অধ্যয়ন অনুসন্ধানের ছাপ রয়েছে। সঙ্গীতের উপর রচনাটি তো তুলনাহীন। বাংলা ভাষায় সঙ্গীতের উপর এমন আলোচনা অধিক আছে তেমন তো মনে হয় না।

ফরহাদের সামনে এ ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করা যেতে পারে, যেমন তিনি মনে করেন, কোন এক প্রাগৈতিহাসিক কালে প্রকৃতি যখন শিষ্ট এবং মৌন ছিল সেই ফুল্ল পরিবেশে মুনি ঋষিদের কণ্ঠে শুদ্ধ সঙ্গীতের চেতনা বাণী মূর্তি লাভ করেছিল— একথা কি সত্যি? মুনি ঋষিরা অনেকেই সঙ্গীত সাধনা করতেন, সে সংবাদ জেনেছি। কিন্তু তাঁরাই সঙ্গীতের প্রাণটা ধ্যানবলে পেয়ে গিয়েছিলেন, আর তারপর থেকে যাঁরাই সঙ্গীত সাধনা করে আসছেন, তাঁরা কি সঙ্গীতের চোকলাটি নিয়ে কারবার করছেন? এ বিষয়ে বিশারদ ব্যক্তিদের মত কি জানা নেই। তবে মনে হয়, অন্যান্য কলা এবং বিদ্যের মত সঙ্গীতেরও পরিবর্তন রূপান্তর বিবর্তন আছে।

ফরহাদের এই বক্তব্যটি খুব সম্ভব ইতিহাস সম্মত নয়। তারপরে তিনি যখন বলেন, একমাত্র জাঁ পল সার্তই মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন। সার্তের এ দাবির কথা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ববাদ যে মার্কসবাদের পরিশীলিত রূপ এ ব্যাপারে মার্কসবাদীদের ভিন্ন বক্তব্যও যে থাকতে পারে, সে বিষয়টা ফরহাদ চিন্তা করে দেখেননি। তা ছাড়া আরেকটি বিষয় ফরহাদের মুদ্রাদোষের মত দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি যে সকল বিজ্ঞান আলোচনা করবেন সব কিছুর মধ্যে মার্কসীয় অভিধা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্যের সুরটিই এমন যে বিজ্ঞান এবং মার্কসের মতবাদকে তিনি সমসূত্রে দাঁড় করাতে চান। হয়ত মার্কসের কোন কোন মতামত আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এ সকল শাস্ত্রকে যে অর্থে বিজ্ঞান বলি, সে অর্থে মার্কসবাদকে বিজ্ঞান বলাটা কি ঠিক হবে? সাধারণভাবে বিজ্ঞানটা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দাবি পূরণ করলেই হল, মার্কসের কোন কোন মতামতের সঙ্গে যদি সঙ্গতি রক্ষা নাও করে বিজ্ঞানের সম্মানহানি ঘটে না আর কার্লমার্কসের মহত্বও খর্ব হয় না। কিন্তু দুটোকে সব সময়ে তুলামূল্যে বিচার করাটা মারাত্মক মানসিকতার জন্ম দিতে পারে। লাইসেনকোর পরিণতির কথা আমরা ফরহাদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

তথাপি এটা অনুপ্রাণিত গ্রন্থ এবং কঠিন গ্রন্থ। নিজের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং চিন্তাহীনতার স্তর অতিক্রমের সংগ্রাম করার প্রশ্ন উঠলেই এ গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়বে। নিজের জাতির মানব সাধারণের প্রতি গভীর প্রীতি এবং দায়িত্ববোধ অনুভব না করলে শুধুমাত্র ইনটেলকচুয়াল খ্যাতি লাভের আশায় কেউ এমন গ্রন্থ লিখতে পারেন না। একটা উদ্ধৃতি দিলেই তা স্পষ্ট হবে।

"বস্তুর বিকাশের ভেতর বস্তুজগতের প্রগতি নিহিত। জীবজগতের বিকাশের ভেতর জীবের প্রজাতিগত প্রগতি চলতে থাকে, (যেমন মানবীয় বিকাশের ভেতর আমাদের প্রগতি জড়িত)। তেমনি জাতিসত্তার বিকাশের ভেতর আন্তর্জাতিক প্রগতি ও সমপ্রবাহমানতা গচ্ছিত রয়েছে। একথাটা বলছি অত্যন্ত অপমানে এবং ক্ষোভে। মার্কস এবং লেনিনের নামে বাংলাদেশের যুদ্ধকে আমাদের প্রিয় বন্ধুদের অনেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের জাতি সত্তাকে স্বীকার করতে চাননি এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা পঁচিশে মার্চের আক্রমণ এবং সেনাবাহিনীর বর্বরতাকে বাস্তব থেকে বিচ্যুত করে বিমূর্ত বিতণ্ডা চর্চার বিষয় করে ফেলেছিলেন। অবাস্তব আর কিম্ভূত সেই বিতণ্ডা। ইতিমধ্যে পথের উপর মানুষের শরীর আর রক্ত জলকাদায় লেপ্টে অঙ্কুরোদগমের প্রার্থনায় বীজ হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের ভাষায় সেই বীজকে বাঙালি বলে। জাতীয়তাবাদ নয়, ওতে কূপমণ্ডুকতা নিশ্চিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক ঐক্যই একমাত্র সত্য। এই ঐক্য নির্যাতিত মানুষের আপন সত্তায় পূর্ণতর বিকাশের ভেতর দিয়ে আসে। আজ সারা পৃথিবীতে বাঙালি জাতিই সবচেয়ে নির্যাতিত। ভিখিরি হয়ে আছে সে। এই

নির্যাতন আর ভিখিরি হওয়ার লজ্জায় নিজের ভেতর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি আমরা। অতএব জাতিসত্তার বিকাশের আগে আন্তর্জাতিকতার বক্তব্য অমার্কসীয়। কারণ তা ভাববাদে নষ্ট। জাতীয় চৈতন্যকে আশ্রয় করে আমাদের নির্যাতিত অবস্থান থেকে উত্তরণ করার পথই হচ্ছে শ্রমজীবীতার আন্তর্জাতিক ঐক্যের পথ। নির্যাতিত মানুষের মুক্তি নির্যাতিত মানুষের আপন চৈতন্যকে আশ্রয় করেই উপস্থিত হয়। বাঙালি সত্তার প্রশ্নে এবং জাতীয় চৈতন্যের প্রগতিশীল চর্চায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এখন। যে কোনো নষ্ট ভাববাদ (বামঘেঁষা বা ডানঘেঁষা) বুর্জোয়া প্রত্যুৎপন্নমতিতা এবং ফ্যাসিস্ট কূপমণ্ডুকতা যেন একে অন্যদিকে প্রবাহিত করতে না পারে। এ ভারী কঠোর দায়িত্ব। সতর্ক হতে হবে আমাদের।"*

---

* লেখাটি 'বাঙালি মুসলমানের মন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একটি। পরবর্তীতে এটিকে ওই বই থেকে লেখক নিজেই বাদ দিয়েছিলেন।—*নূ. আ.*

নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ

১

একজন সাহিত্যস্রষ্টার সবচাইতে বড় হাতিয়ার, তাঁর ভাষা। ভাষার মধ্যেই তাঁর প্রতিস্বিকতার অনেকখানি নিহিত। একজন লেখক বা কবি যে ভাষারীতিটি প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তাতেই তাঁর সবটুকু পরিচয় ফুটে ওঠে। সাহিত্যের প্রাণবস্তুর মধ্যে নতুন কোন উপাদান যুক্ত হলে ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গিতে অবশ্যই তার ছাপ পড়বে। সাহিত্যের প্রাণ এবং প্রকাশরীতি এ দুটো কোন আলাদা ব্যাপার নয়। পুরনো বোতলে নতুন মদ পরিবেশন করার প্রচলিত প্রবাদটি সাহিত্যের বেলাতে কোন অর্থই বহন করে না। নতুন সাহিত্যের নতুন প্রকাশ রীতি চাই, নইলে নতুনকে চেনার উপায় থাকে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী এসকল ছন্দ তাঁর প্রতিভার প্রকাশ মাধ্যম হওয়ার অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। কারণ মাইকেল প্রখর অনুভব শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যে নতুন মূল্যমানসম্পন্ন কাব্য-ভাবনার বিকাশ ঘটাতে যাচ্ছেন বঙ্গদেশে প্রচলিত কাব্যভাষার মাধ্যমে তা আদৌ সম্ভব নয়। এই ভাষারীতি মাইকেলের জীবনানুভূতির মর্মবেগ ধারণ করার উপযোগী নয়। সেই কারণে মাইকেলকে নতুন একটি কাব্যভাষার কথা ভাবতে হয়েছিল। ভেতরের এই আত্যন্তিক সৃষ্টিশীল চাপ তাঁকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। সেই অপূর্ব ছন্দ তুরঙ্গম ধারণ করার উপযোগী আনকোরা নতুন কাব্যভাষা তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছিল।

মাইকেল বঙ্গসাহিত্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলনারহিত জঙ্গমতার সৃষ্টি করেছিলেন। একেবারে কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে প্রহসন লিখে একটা হুলস্থুল কাণ্ডও ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি একথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না, মধুসূদনের যাবতীয় সাফল্য পরবর্তী বাংলাকাব্য বিকাশে খুব একটা ফলপ্রসু প্রভাব রাখেনি। তবে তাঁর গদ্য রচনার কথা স্বতন্ত্র। মাইকেল প্রচলিত ভাষারীতিকে দুমড়ে মুচড়ে ভিন্ন রকম প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা-শরীর যে নির্মাণ করা যায়, সেরকম একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এ কৃতিত্ব মাইকেলের একার। বাংলা কবিতার পরবর্তী বিকাশে মাইকেলের প্রভাব রক্তসূত্রের মত ক্রিয়াশীল থেকেছে, একথা বোধ করি বলা চলে না। অনন্য কাব্যসৌধ নির্মাণেই মাইকেলের শক্তি এবং মনোযোগ

নিবিষ্ট ছিল তাঁর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভা কাব্যের যে আদর্শ নির্মাণ করল মাইকেল-পরবর্তী কবিকুল কেউ সে আদর্শ আয়ত্ব করতে পারেনি। তাঁর ভাষাশৈলী অনুকরণ অনুসরণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মধ্যে এনেছিলেন দ্যুতি। তাঁর সাধনায় বাংলা কবিতার ভাষা বিমূর্ত ভাব এবং চিন্তা ধারণ করার মত নির্ভরতা অর্জন করেছিল। তিনি বাংলা কবিতার জমিনে এতোদূর নিবিড় কর্ষণ করেছিলেন, তার ফলে ভাষার সীমানার বিস্তার এবং সম্প্রসার ঘটেছে অনেক দূর। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলেন, যেখানে মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার, পণ্ডিতজনের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতজনের ভাষার, চিন্তার ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষার একটা সেতুবন্ধ রচনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে বহু মাত্রিক প্রকাশভঙ্গির বাহন করার যোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ভাষার মধ্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির সাবলীল স্ফূর্তির যে ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন, সেই বিষয়টা স্মরণে না রাখলে বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পূর্বাপর সম্পর্করহিত একটা খাপ ছাড়া ঘটনা মনে হবে।

২

বাংলার কাব্যগগনে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নানা কারণেই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলা কবিতার বিকাশ ধারায় নজরুল একটা চমৎকার ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে বিষয়ে সাহিত্য সমালোচকদের অনেকেই একমত। তাঁর সাধনায় সিদ্ধির ব্যাপারে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈততার অবকাশ অল্পই আছে।

সে যাহোক, বর্তমান রচনাটি নজরুলের কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। সমস্ত সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও কবি হিসেবে, মানুষ হিসেবে, যুগনায়ক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই যে একজন অনন্য পুরুষ, এই অনন্যতার একটি পরিচয় তিনি কবিতা, গান, এমনকি গদ্য রচনায়ও যে ভাষারীতিটি ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে নজরুলে ব্যবহৃত ভাষা রীতিটির একটি ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু করে আধুনিক যে ভাষাটি গিরিগাত্রের সংকীর্ণা স্রোতস্বিনীর মত বিকশিত হতে হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি এসে ভরা যৌবনা প্রমত্তা পদ্মার আকার ধারণ করেছিল, নজরুল ইসলাম সেই ভাষাতেই গান কবিতা রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে শুধুমাত্র এটিকেই কাজী নজরুলের অনুসৃত ভাষারীতি বলে স্বীকার করে নিলে, আজকের দিনে আমরা নজরুল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলতে যে জিনিসটি বুঝি বা বোঝাতে চাই, তার ওপর সুবিচার করা হবে না।

সচরাচর সাহিত্য-সমালোচকেরা প্রায় সকলেই একটি অভিধা নজরুলের বেলায় প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি এন্তার আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এসকল বিভাষী শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ব্যাপারে নজরুলের দক্ষতা তাঁর সময়কার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা মোহিতলাল মজুমদার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। তবে এটা নিছকই বাইরের ব্যাপার, তারপরেও কিন্তু অনেক কথা থেকে যায়। নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বেলায় তাঁর একটা গাঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে, কোন কোন সময় সেটা এক ধরনের অনমনীয় জেদ বলেও মনে হয়। মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তের কাছে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল এক ধরনের স্বাদ পাল্টানোর মত ব্যাপার। কবিতার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে বৈচিত্র্য এবং ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মোহিতলাল-সত্যেন দত্ত আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। প্রমথ চৌধুরী মশায় ফিরনির মধ্যে কিসমিসের মত গদ্যের মধ্যে আচমকা দু'-একটি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করে যে ধরনের চমক সৃষ্টির ওস্তাদি দেখাতেন, অনেকটা সেরকম।

নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারেও চমক সৃষ্টি হত বটে, কিন্তু সে সকল শব্দ ব্যবহারের আরো গুরুতর কারণ কবির উপলব্ধির গভীরে প্রোথিত ছিল। যে সকল আরবি ফারসি শব্দ নজরুল ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি পরিস্কার ধারণার সৃষ্টি হবে। কতিপয় আরবি-ফারসি শব্দ তাঁর কবিতা, গানে একেবারে মনের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। আর কতেক শব্দ তিনি ভাষাজ্ঞানের জোরে বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন। যে শব্দগুলো একেবারে তাঁর অস্তিত্বের ভেতর থেকে মাতৃভাষার মত স্বাভাবিকতায় বেরিয়ে এসেছে, সেগুলোর পরিপূরক হিসেবে পড়ে পাওয়া শব্দগুলো এসে পোষ মেনেছে।

তাই মোহিতলাল কিংবা সত্যেন দত্তের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল একটা নিরীক্ষার ব্যাপার মাত্র। কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল একটা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ। নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণে চলতি ভাষা-রীতিটির পাশাপাশি গৌণভাবে হলেও মুসলমান লিখিত পুঁথিসাহিত্যের ভাষাশৈলীটির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে পুঁথিসাহিত্যের ভাষার মধ্যে নতুন একটা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র একজন সাহিত্য-স্রষ্টার বিশেষ স্টাইল হিসেবে চিহ্নিত করলে নজরুলের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হবে বলে মনে করি।

৩

আরবি, ফারসি এবং উরদু ভাষার শব্দ বাংলাভাষার সঙ্গে মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা, তার সঙ্গে পুঁথিসাহিত্যের একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অতীতের পুঁথি লেখকেরা বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার বিদেশি শব্দ মিশিয়ে এক সময়ে

সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সে সাহিত্যের বৃত্ত খুবই সংকুচিত ছিল। যথেষ্ট মৌলিকতার স্ফূরণও সে সাহিত্যে কদাচিত লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা এককথায় 'বটতলার পুঁথি' আখ্যা দিয়ে সেগুলোর বিশেষ একটা শ্রেণী নির্ণয় করেছেন। সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে সারবান পদার্থ অধিক হয়ত পাওয়া যাবে না, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এগুলোর মূল্য যে অপরিসীম, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বপ্রথম হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে পুঁথিসাহিত্যের এই বিশেষ দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাঙালি মুসলমান লিখিত পুঁথিসমূহে বাঙালি মুসলমান সমাজের মানসজগতটির যথার্থ পরিচিতি ধরা পড়েছে। বাংলার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী আর মুসলমান জনগণের জীবন-জিজ্ঞাসা, মূল্যচিন্তা, বিশ্বাস-আচার রসপিপাসা এসব বিষয় পুঁথিসমূহের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এক সময়ে বাংলার আম মুসলিম জনগণের মধ্যে পুঁথিসাহিত্যের চর্চা ব্যাপকভাবে আদরনীয় হয়ে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণের যে প্রক্রিয়াটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শুরু হয়েছিল। সেই বিশেষ সময়টিতেও দেখতে পাই, মুসলমান সমাজে পুরান পুঁথি পঠিত হচ্ছে এবং লেখা হচ্ছে নতুন পুঁথি। তারপরে আধুনিক বাংলা ভাষা যখন সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের বাঙালি জনগণের ওপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, আমরা দেখতে পাই, সেই প্রক্রিয়াটিতে ছেদ পড়ে গেছে।

আবার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে দেখতে পাই কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ঠিক পুঁথিসাহিত্যের মত অতোটা শিথিল ঢালাওভাবে না হলেও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করার একটা প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এই বিশেষ ঘটনাটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেশিরভাগ সমালোচক এটাকে নজরুল প্রতিভার বিশেষ দিক বলে চিহ্নিত করেছেন। কথাটা মিথ্যাও নয়। তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টির জন্য এটা লাগসই ব্যাখ্যা বটে। কিন্তু তাতে করে নজরুলের ভাষারীতির যে সমাজতত্ত্বসম্মত একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়, সে দিকটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নজরুলের সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়নের জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পুঁথিসাহিত্যের প্রেক্ষাপটের বিষয়ে ধারণা থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪

আমরা বাংলা ভাষার যে লেখ্যরূপটি ব্যবহার করে থাকি, তার সঙ্গে আমাদের জনগণের মুখের ভাষার বিরাট এক ব্যবধান রয়েছে। পৃথিবীর খুব কম ভাষার মধ্যে লেখ্যরূপ এবং মুখের ভাষার মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব বর্তমান। বাংলা ভাষার আদি বিকাশ-প্রক্রিয়ায় এই ফারাক ছিল না। আধুনিক ভাষার যে বিকশিত রূপ আমরা ব্যবহার করে থাকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে এই ভাষার প্রাথমিক রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন। এই ভাষাটিই নানারূপ পরিবর্তন

এবং রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথী তীরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটি সুন্দর সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ সমন্বয়, মিলন-বিরোধের ইতিহাসই আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস। প্রতিভাধর এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধকদের চেষ্টা প্রযত্ন এবং শ্রমের মধ্যদিয়ে এই ভাষাটি ভাব-চিন্তা, অনুভব-বিভব ধারণ করার উপযোগী হয়ে উঠেছিল, তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তথাপি স্বীকার করতেই হবে, তামাম বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে একটি মুখ্য এবং অগ্রগণ্য কারণ বর্তমান ছিল; আর সেটি হল শহর কলকাতার ভাষাটিই মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিল। ভাষার এই বিকশিত রূপটি অগ্রাহ্য করার যেমন কোন কারণ নেই, তেমনি অভিধান থেকে এই ভাষার জন্ম সে বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা না থাকলে বাংলা ভাষার বিকাশ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাই প্রথম আধুনিক ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। অধিকন্তু বাঙালি মনীষীবৃন্দের সৃষ্টিশীলতার ছোঁয়ায় এই ভাষা প্রাণবান, ভাবসমৃদ্ধ এবং অপূর্ব প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা হিসেবে বিশ্বমানবের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা ভাষার জন্য এ কম শ্লাঘার কথা নয়। তারপরেও কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে জনগণের মুখের ভাষার দূরত্ব কখনো ঘোচেনি। প্রাথমিক নির্মিতির পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের যে আত্মা ভাষার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিল তা ঝেড়ে ফেলা কখনো সম্ভব হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হয়ে যে রূপটি পরিগ্রহ করে আসছিল, আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ যেভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল সে প্রক্রিয়াটি হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় সে রূপটির কিছু কিছু নমুনা এখনো একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। ড. আনিসুজ্জামান সাম্প্রতিককালে কিছু প্রমাণ তুলে ধরেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের মত সংস্কৃত জানা লোকের পক্ষেও এই ভাষার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাঁকেও 'যাবনী মিশাল' ভাষায় কাব্য রচনা করতে হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পরে, ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতে আরবি-ফারসি ইত্যাদি শব্দ এসে মিশে যাচ্ছিল এবং ভাষার একটি নতুন চেহারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাষাকে নদীর সঙ্গে যদি তুলনা করতে হয়, মেনে নিতে হবে এটা একটা উল্লেখ করার মত বাঁক।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার আরেকটা বাঁক সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা আরবি ফারসি শব্দাবলি সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে বাংলাভাষাকে সংস্কৃত অভিমুখী একটি ভাষা হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়াছিলেন। তাঁদের সে প্রয়াস সবটুকু ফলবতী হয়নি। কিন্তু যে ঝোঁক এবং প্রবণতা তাঁরা ভাষার শরীরের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যদি পলাশীর

বিপর্যয় না ঘটত, আজকের দিনে বাংলা ভাষার অন্যরকম একটি বিকশিত রূপ হয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তবে 'যদি' আর 'কিন্তু' নিয়ে তো আর আলোচনা চলে না, যা ঘটেছে তাই-ই সত্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা ভাষা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙালি জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারেনি। এই ভাষার বলয়টি ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং সঙ্কুচিত। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, সংখ্যাল্প সাক্ষরতা ইত্যাদি নানা কারণ নতুন নির্দেশিত ভাষাটিকে একটি বিশেষ সীমারেখার বাইরে অনেকদিন পর্যন্ত বিকশিত হতে দেয়নি। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, আধুনিক শিক্ষার দুয়ার যাদের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল, তারা পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পারম্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে যে ভাষাটি ব্যবহার করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল, পুঁথি সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে তার একটি নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। একটি ঐতিহাসিক সময়ে আরবি-ফারসি শব্দ মিশে বাংলাভাষার মধ্যে রূপান্তর প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল, পুঁথিসাহিত্যের ভাষার মধ্যে তার কিছু প্রমাণ মিলে। ভাষার সামাজিক চর্চার ওপর নির্ভর করেই তো সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে। একেবারে সামাজিক সম্পর্ক বিরহিত সাহিত্যের ভাষার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিম সমাজ যখন আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তারা কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাটিকে গ্রহণ করেছে। তারপরেও একটি কথা বলা যায়, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজকের দিনেও পুঁথিসাহিত্য আবেদন হারিয়ে ফেলেনি। সুতরাং জনগোষ্ঠীর ভেতরে ফল্গুস্রোতের মত আরেকটি সমান্তরাল ভাষারীতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করছিলেন, সেই সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে শক্তিমান মুসলমান লেখক মীর মোশাররফ হোসেন 'শহীদে কারবালা' পুঁথিটির একটি আধুনিক গদ্য সংস্করণ রচনা করেছিলেন। লেখক নিজে সে গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'বিষাদ সিন্ধু'। মুসলমান সমাজে পুঁথির প্রভাব যে কতটা ছিল 'বিষাদ সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা থেকে তা অনুমান করা যায়।

মুসলমান সমাজের যে সকল লেখক বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাটিকে প্রকাশমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মীর মোশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের সকলকেই নগরলালিত ভাষাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমন কী ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ঘটানোর মানসে যে সকল বই-পুস্তক রচনা করা হয়েছে, তার সবগুলোতেও ওই ভাষারীতিরই অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

পাছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পাঠকরা উপহাস করতে পারেন, এই হীনমন্যতা থেকেই কি মুসলমান লেখকরা আপন সমাজে, পরিবারে, সংসারে সচরাচর ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দসমূহ তাঁদের রচনায় যতটা সম্ভব পরিহার করতেন? বঙ্কিমচন্দ্র মীর মোশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না', এটাকেই গ্রন্থ রচনার সবচাইতে বড় প্রশংসা বলে মুসলমান লেখকেরা কবুল করে নিয়েছিলেন।

মুসলিম লেখকেরা অবশ্য কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষারীতি গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সব দেশেই ভাষার সর্বাধুনিক বিকশিত রূপটিকেই তাঁদের লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন লেখকরা। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নেতা বলে স্বীকৃত লেখক-কবিরাও তাই করেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের বেলায় একটা ভিন্নরকমের ব্যাপার ঘটে গেল। তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি এবং উরদু শব্দাবলি প্রাণপাতালের উত্তাপে যেন ভাপিয়ে উঠতে থাকল। এটা কেন ঘটল, নজরুল ইসলাম এ সকল শব্দ কেন ব্যবহার করতে থাকলেন, জানামতে কোন লিখিত কৈফিয়ত তিনি কোথাও দেননি। যদি তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হত সম্ভবত আত্মপক্ষ সমর্থনে এজাতীয় কথা তিনি বলতেন— মুসলমান সমাজে পেঁয়াজ-রসুনের চল্ আছে। তাই মুসলমানের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ থাকবেই। সেটা গোপন করা কোন ভালকাজ নয়। কারো নাসারন্ধ্রে সে জন্য যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, করার কি আছে। এমনকি সে নাসারন্ধ্র স্বয়ং-সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হতে পারে। তারপরেও তো একটি সমাজকে তার আত্মপরিচয় ফুটিয়ে তুলতে হবে। পুঁথিসাহিত্যের ভাষা নিয়ে কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা যতই নাসিকা কুঞ্চন করুন না কেন, এই ভাষাটি কদাপি উরদু, আরবি এবং ফারসি ভাষা নয়। এটা বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ ফলিত রূপ। একটি সমাজের মধ্যে তার যথেষ্ট আদর রয়েছে এবং সেই বিশেষ সমাজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাসমূহ এই ভাষার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ইসলাম সাহিত্যে নাসিকা-সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ তিনি অধিক হারে ওই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে থাকলেন তাঁর দক্ষতা সুফলপ্রসু হয়েছিল। সর্বশ্রেণীর পাঠক ক্রমে 'যাবনী মিশাল' ভাষাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেন। হিন্দুসমাজের অগ্রণী সাহিত্যিকেরা এই অভিনব ক্ষমতা প্রকাশের জন্য নজরুলকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তাঁরাই ছিলেন তাঁর সাহিত্যের প্রাথমিক সমঝদার। আর মুসলমান সমাজের চেনাজানা মানুষদের অনেকে, যাঁরা ঘরে-সংসারে উচ্চারিত শব্দসমূহ প্রকাশ্যে উচ্চারণের দুঃসাহস কখনো প্রদর্শন করেননি, তাঁদেরই একাংশ মহাসমারোহে নজরুলকে 'কাফের' ফতোয়া দিতে এগিয়ে এলেন। সেই মূঢ়তার আলোচনা অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

৫

নজরুল ইসলামের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে অতীতের পুঁথিসাহিত্যের নব জীবনদানের একটি ইশারা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নজরুল পুঁথি লেখেননি। আধুনিক যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন। শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াসের ফলে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা ভাষারীতিকে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবাহের সংগে যুক্ত করে দিয়ে বাংলা ভাষাকে জনগোষ্ঠীর সত্যিকার প্রতিনিধিত্বশীল ভাষা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এতে তিনি যে সফলতা লাভ করেছিলেন, এককথায় তাঁকে অতুলনীয় বললে অধিক বলা হবে না। নজরুল মুসলমানদের ঘরে-সংসারে ব্যবহৃত শব্দসমূহ ব্যবহার করে এমন একটা প্রক্রিয়ার সূচনা করলেন, যার ফলে বাংলা ভাষার অভিধান-সংকলকদের প্রতি নতুন সংস্করণে নতুন নতুন শব্দ সংযোজনের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। এটা নজরুল ইসলামের একটা বড় কৃতিত্ব।

সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে এই ভাষারীতি ব্যবহার নজরুলের সাফল্যের পেছনে দুটি কারণ বর্তমান। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সময়ে এসে বাংলা ভাষা যে গতিময়তা অর্জন করেছিল নজরুল ইসলাম এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন। বাংলা ভাষা যে সর্বাধিক শব্দসম্ভার সংস্কৃত থেকে ধার করেছে, সে দিকটিতে নজরুল পুরোপুরি সজাগ এবং ওয়াকেবহাল ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, এমন কি ইচ্ছা করলে অন্যকোন বিদেশি ভাষার একটি শব্দও ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত প্রধান বাংলা গান, কবিতা, গদ্য সৃষ্টি করতে পারতেন, নজরুলের সাহিত্য-সঙ্গীতে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। নজরুল যদি পুরোপুরি এই ভাষারীতি অবলম্বন করে সাহিত্য, সংগীত সৃষ্টি করতেন, তাহলে আজকে তাঁর সাহিত্যের রস গ্রহণ করার ভিন্নধরনের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মানদণ্ড নিরূপণের প্রয়োজন হত।

দ্বিতীয়ত, কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সমাজে আত্মগোপন করে থাকা পুঁথিসাহিত্যের ভাষারীতির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের একটা উল্লেখযোগ্য সময় তাঁকে এই পুঁথিসাহিত্যের পরিমণ্ডলে কাটাতে হয়েছে। এই সাহিত্যের শৈল্পিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা তাঁর গড়ে উঠেছিল। সমাজের যে অংশের মানুষের মধ্যে এই সাহিত্যের চল ছিল, সেই মানুষদের মানসজগত এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি জানতেন। সর্বোপরি বোধবুদ্ধিতে পরিপক্কতা অর্জনের পূর্বে এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি একটা অনপনেয় শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোই হল আসল কথা। নিজের সমাজের চর্চার জিনিস, কিছুতেই ফেলনা হতে পারে না। বাকরুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে এ বোধ আমরা লালন করতে দেখি।

নজরুল সাহিত্যে বাংলা কাব্য ভাষার যেমন সৃষ্টিশীল প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি এই পুঁথিসাহিত্যের ভাষাটিও সৃষ্টিশীল নির্বাচনের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জনের পর

সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। নজরুল পুঁথিসাহিত্যের প্রাণের আগুণটুকু গ্রহণ করেছেন, তার জীর্ণ কঙ্কাল বহন করেননি। তাই নজরুল সাহিত্যে পুঁথিসাহিত্যের জীবাশ্ম দৃষ্টিগোচর হলেও সেই ভাষা-কাঠামো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁথি-লেখকেরা বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা উজ্জ্বল করে দেখার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ভাষারীতি তৈরি করেছিলেন। নজরুল স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী এই মুসলিম সমাজটিকে বাঙালি সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই ওই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

নজরুল উরদু ভাষায় গজল এবং গান লিখেছেন। রাজা নওয়াব আলী রচিত সংগীত বিষয়ক আকরগ্রন্থ মারিফুন্নাগমাতের অংশ বিশেষের স্বচ্ছন্দ বাংলা তর্জমা করেছিলেন। ভাষার ওপর কি রকম দখল থাকলে এরকম একটি দুরূহ গ্রন্থের এমন সাবলীল অনুবাদ করা যায়, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের গজল রুবাই-এর মূল ফারসি থেকে তিনি বাংলায় কাব্যিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন । সুতরাং ফারসির ওপর নজরুলের পরিপূর্ণ দখল ছিল, এটা অনুমান এবং কল্পনার বিষয় নয়। হিন্দি ভাষায় রচিত নজরুলের ভজন নেহায়েত কম নয়। ভাষাটি না জানলে শুধুমাত্র স্মৃতি এবং শ্রুতির ওপর ভরসা করে ভজন রচনা সম্ভব নয় বলেই ধারণা করি। নজরুল আরবি গানের সুরে বাংলা গান লিখেছেন। আরবি ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছেন। ভাষাটি তিনি কতটা জানতেন, সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে ভাষার ওপর বিশদ অধিকার না থাকলেও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নজরুলের ছিল, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি ভাষা জানতেন, এটা আমাদের কাছে একটা সংবাদ মাত্র। এই ভাষাজ্ঞান দিয়ে তিনি সাহিত্যের কায়া এবং প্রাণের মধ্যে একটা নতুন সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারটি কদাচিৎ আমরা চিন্তা করে দেখি। সে যা হোক, আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে— আরবি, ফারসি উরদু ইত্যাদি ভাষায় নজরুলের সমধিক অধিকার ছিল, এবং সেই কারণে পুঁথিসাহিত্যের ভাষায় নতুন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তাঁর পক্ষে কোন অসম্ভব বা কঠিন কর্ম ছিল না।

সেই সময়টার কথাও মনে রাখতে হবে। ইতোমধ্যে সমাজ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। হিন্দু সমাজের ভেতর উদারতা এবং মেনে নেয়ার শক্তি বেশখানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুসলমান সমাজের ভেতরে একটা জঙ্গমতা সৃষ্টি হতে চলেছে। এই সময়ে নজরুলের আরবি-ফারসি ভাষার শব্দমিশ্রিত কবিতা গান যখন প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে, হিন্দুসমাজের প্রাগ্রসর ব্যক্তিবৃন্দ সাহিত্যে নতুন উপাদান সংযোজন করার জন্য নজরুলকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর মুসলমান সমাজের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা নজরুলের কবিতায় তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে নিত্যব্যবহৃত শব্দসমূহের অকুণ্ঠিত, অসংকোচ প্রয়োগের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে আপন ঘরের মানুষ হিসেবে চিনে নিলেন।

নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান ও প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের ভাষাহীন পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালি সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে, নব বিকাশধারায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে অনেক দূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মাণ করেছিলেন।

৬

বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতিচিন্তার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য বর্তমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার হওয়ার পূর্বে এখানকার যে স্থানীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তার স্রোতোধারার ভেতরে ধর্মভাবনা পুরোপুরি অবগাহন করতে পারেনি। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মচিন্তার একটা বিরোধ বরাবর থেকে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান সমাজে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। যেমন ইরানে ইসলাম প্রসারের পরেও ইরানি জনগণ প্রাক-ইসলামি যুগের উৎসব আচার জাতীয় গর্ববোধ কোন কিছু পরিহার করেনি। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম চমৎকার মিলেমিশে সহাবস্থান করছে অদ্যাবধি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নিশানবাহী বিমান সংস্থাটির নাম গরুড়। প্রতি বছর সে দেশে জাতীয়ভাবে রামায়ণ উৎসব পালন করা হয় এবং জনগণ হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করেন। মুসলিম সন্তানের সংস্কৃত নামকরণ করতে তাঁদের বাধে না। ইরানে দেখা গেছে ইসলাম পাকাপোক্তভাবে চালু হওয়ার পরেও ইরানি মহাকবিরা অগ্নি উপাসক পারসিক নরপতিদের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করে আরব আগ্রাসনের প্রতিবাদ করছেন।

বাংলামুলুকেও ধর্মসংস্কৃতিতে এক ধরনের সংশ্লেষ যে ঘটে নি সেকথা সত্যি নয়। কিন্তু তার মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। খুব সম্ভবত মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুদের অনুপাতে কম ছিল বলে এবং গোটা সমাজে অর্ধাংশেরও বেশি মানুষ অমুসলিম থেকে যাওয়ার কারণে ক্ষেত্রজ সংস্কৃতিটিকে সব সময় সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অভিভাবকেরা সকল সময়ে স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে শেরক্ এবং মূর্তি পূজার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজে মিলাদ মাহফিল, ওরশ শরিফ, দুই ঈদের জামাত, নবীর দরূদ পাঠ, কোরআন খতমের আয়োজন করা— এ সকলই ছিল সংস্কৃতি চর্চার অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রসম্মত বিষয়। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানসমূহ আরবি ভাষার মাধ্যমে পালন করা হত, যার একবর্ণও আম জনগণ বুঝতে পারত না। এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে জীবনের প্রতি অস্তিবাচক কোন সৃষ্টির প্রত্যাশা করা একরকম অসম্ভব। সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের আরবি ফারসিতে কোন অধিকার ছিল না। অভিজাত

মুসলমানদের সমাজে হয়ত কিছুটা আরবি-ফারসির আংশিক অধিকার ছিল। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের পথ সুগম ছিল না। তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন না। আর সাধারণ মুসলমানদের প্রায় শতকরা এক শ' ভাগই বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতে পারত না।

পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান অভিজাত শ্রেণীক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। আপদকালে সামাজিক নেতৃত্ব নির্মাণ করার যে দায়িত্ব অভিজাত নেতৃশ্রেণীর থাকে, ভাষাগত কারণে মুসলমান অভিজাতরা তা করতে পুরোপুরি অসমর্থ ছিলেন। উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজ যেরকম একজন স্যার সৈয়দ আহমদের মত সংস্কারক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল, কিংবা বাঙালি হিন্দু সমাজ যেমন বিদ্যাসাগর-রামমোহনের আবির্ভাব সম্ভাবিত করেছিল, বাঙালি মুসলমান সমাজে তেমন একজন ব্যক্তিত্বের উত্থান ছিল সামাজিক কারণেই একরকম অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাঙালি অভিজাত মুসলমান সমাজের পক্ষে একজন সৈয়দ আমির আলীর জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছিল। সৈয়দ আমির আলী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল না। তাঁর সমস্ত রচনা তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ যুক্তিবাদিতা এবং মনীষার প্রকাশ দেখা যায়, যদি তিনি বাংলা ভাষায় লিখতেন বৃক্ষ সমাজের মত অনড় স্থবির মুসলমান সমাজের মোহনিদ্রার অবসান আরো তাড়াতাড়ি ঘটত। কিন্তু তা ঘটতে পারেনি।

বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রাগ্রসর ওহাবি, ফরায়েজি আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এগুলো ভাবগত দিক দিয়ে ছিল চূড়ান্ত পশ্চাদ্‌মুখী। যেহেতু কখনো রাজা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সামাজিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের জন্ম হয়নি, তার ফলে মুসলমান সমাজের ভেতরের অন্ধকার কাটেনি। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল লেখক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখালেখি করছিলেন, একদিকে ব্রিটিশ এবং অন্যদিকে নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ, এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তাঁরা রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে অতীত মুসলিম গৌরব রোমন্থন করছিলেন।

মোল্লা এবং পিরেরা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। শরিয়ত পুঙ্খানুরূপে পালন করা হল কি না, সেটাই ছিল মুসলিম সমাজের ধ্যানজ্ঞান। ইসলামধর্মের আধুনিক মানববাদী ব্যাখ্যা অনায়াসে তৈরি করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেকালে একজনও সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন কামেল মানুষ ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইউরোপে রেনেসাঁ থেকে রিফরমেশন পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে ধর্মের মানববাদী ব্যাখ্যা নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং সমাজে চিন্তার মধ্যে যে ধরনের সংস্কার আনতে চেষ্টা করেছিলেন সেগুলো যে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ-পুরাণ বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মুখ্যকর্ম। ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার যদি তাঁরা না করতেন, তাহলে যেটুকু সাফল্য তাঁদের জুটেছিল, সেটুকু সম্ভব

হত না। নবযুগ ইসলাম ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দাবি করছিল। কিন্তু ব্যাখ্যাকার কেউ ছিলেন না। পিরের বাক্য, মোল্লার নসিহত কিংবা পুঁথির উপকথার মধ্যেই মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রথম কোরআন এবং হাদিস শরিফের অনুবাদক ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র।

৭

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মুখ্যত কবি এবং সংগীত শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে সমাজ-সংস্কারমূলক কোন সুবলয়িত তত্ত্ব পাওয়া না গেলে আশাভঙ্গের বেদনা ঘটার কারণ নেই। তবু আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করতে হয়, এই মুসলিম সমাজটা নিয়ে তিনি খুবই গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। গোটা সমাজের মানসিক কূর্মবৃত্তি এবং আত্ম-অবিশ্বাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে বারংবার তিনি ফুঁসে উঠেছেন। যদি তিনি স্থিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতেন, যদি তাঁর বিজ্ঞান নির্ভর বিশ্লেষণী প্রতিভা থাকত, তবে সামাজিক দায়িত্ব তিনি অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে সমর্থ হতেন। নজরুলের যা ছিল না, অথচ থাকলে ভাল হত ও নিয়ে আফশোস করে লাভ নেই। তথাপি সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাঁর একক চেষ্টায় মুসলিম সমাজের ভেতরে যে ভাবাবেগ তিনি জাগাতে পেরেছিলেন, যে আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্যকোন মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তির তুলনা হয় না। এই সমাজটিকে ভেতর থেকে বিকশিত করে তোলার জন্য একজন আত্মভোলা খেয়ালি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত কবির পক্ষে যতটুকু দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল, তার চাইতে অনেক গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্দিষ্ট করে কি ছিল বলা মুশকিল। ১৯২০ সালে কোলকাতায় ফিরে আসার পর প্রথমদিকে তিনি খেলাফত আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর আকর্ষণ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে নজরুল তাঁর লালিত আদর্শের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। জীবনের এই পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ আদর্শের অনুসারী হতে দেখি। আবার, অনতিবিলম্বে গান্ধী রাজনীতির প্রতি তাঁর যাবতীয় শ্রদ্ধাবোধ অবসিত হয়ে আসে। অতঃপর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ একান্তভাবেই 'সাম্যবাদ'। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখের সঙ্গে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে তাঁর মনের অনেকখানি মিল হয়েছিল। নজরুল সাহিত্যে গণমানবের মুক্তির উদগ্র যে আহবান ধ্বনিত হয়েছে, সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অনুরাগ না জন্মালে সেটা সম্ভব হত না। কিন্তু এই মিলের পেছনে যতটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল, ততটা সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার সমর্থন ছিল না। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখি তিনি নির্বাচনে কংগ্রেস

পার্টির প্রার্থী হয়েছেন। আসলে নজরুলের সুচিন্তিত তেমন কোন রাজনৈতিক মতামত ছিল বলে মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি অন্তরের অপরিমেয় আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

তবে বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে নজরুলের দু'ধরনের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্যে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। আর মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতর থেকে একটা জঙ্গমতা সঞ্চার করার জন্য তিনি সদা তৎপর ছিলেন। নজরুল গবেষক কবি আবদুল কাদির বলেছেন, মোস্তাফা কামালের সমাজ সংস্কারের আদর্শ নজরুলের মন কেড়েছিল। তুর্কি সমাজের জন্য মোস্তাফা কামাল যা করেছিলেন, নজরুল আন্তরিকভাবে বাঙালি মুসলমানের জন্য অনুরূপ কিছু করার বাসনা পোষণ করতেন। তাঁর কবিতা, গদ্য রচনা, অভিভাষণ, চিঠিপত্র— এসবের মধ্যে তার অজস্র প্রমাণ ছড়ান রয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম যে ইসলামি বিষয় নিয়ে অনেক কবিতা এবং অসংখ্য গান লিখেছিলেন, এটা আকস্মিক খাপছাড়া কোন ব্যাপার নয়। নজরুলের একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। নজরুল ইসলাম, ইসলাম ধর্ম এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক ব্যবধানটুকু যথাসম্ভব কমিয়ে আনার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত বিষয় মুসলমানদের প্রিয়, যেগুলো নিয়ে বাংলার মুসলমান সঙ্গত কারণে গর্ব করতে পারে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উদ্ভাসন না ঘটালে ভেতরে একটা তাড়না সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাঁর রচিত 'মোহররম', 'কোরবানী', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদোহম', 'কামাল পাশা', 'উমর ফারুক' এ সকল কবিতা তিনি সে কারণে লিখেছেন। কোরআনের আংশিক অনুবাদ, এবং মুহম্মদের জীবন নিয়ে কাব্য সেই জন্য তিনি রচনা করেছিলেন। হাফিজ, খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যে হীনমন্যতাবোধের শেকড় প্রোথিত ছিল তার সেই মূলে আঘাত করে মুসলিম তরুণদের সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস তিনি করে গেছেন। নজরুলের এ প্রয়াস কতটা সঙ্গত ছিল, এবং তা করতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা কিছু পরিমাণে হলেও অপচিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ কেউ নজরুলকে ধর্মীয় আদর্শের লাশ বহন করেছেন বলে অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তার তো' কোন তুলনা হয় না।

ধর্মের যে উদার এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপস্থাপিত করেছিলেন, তার সঙ্গে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রয়াসের অল্পমাত্রায় হলেও তুলনা করে দেখতে চাই। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের একেকটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল। নজরুলের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ছিল না, থাকার কথা নয়। নজরুল ছিলেন কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর কাজ একটা বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করা, জীবনের প্রতি একটা স্বচ্ছ অঙ্গীকারবোধ জাগিয়ে তোলা। সে কর্মটি নজরুল

অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পালন করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যেও কতিপয় বিষয়ে তাঁর স্থির বুদ্ধি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বাঙালি মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তার একটি। আমরা জানি, নজরুলের চিন্তাভাবনার মধ্যে নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল। আর তাঁর সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। নতুন কোন মৌলিক চিন্তা তিনি সমাজের কাছে হাজিরও করতে পারেননি। কিন্তু চিত্তের এমন একটি আবেগ, এমন একটি সহজ সরল কাণ্ডজ্ঞান তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। তাঁর সাধনার মধ্যদিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ সংস্কৃতিচর্চার একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজ শিল্প এবং সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মত আর কারো কাছে অত বিপুল পরিমাণে ঋণী নয়।

আহমদ ছফার প্রবন্ধ
২য় সংস্করণ, ২০০০

মূলত মানুষ

১

"মানুষের মান দাও
মানুষের গান গাও
মানুষ সবার সেরা
মানুষ ঈশ্বর ঘেরা
এ সংসারে।"

আমাদের একজন নাম না জানা লোককবি মানুষ সম্পর্কে ওপরের ধারণাটি প্রকাশ করেছেন। মহাকবি শেক্সপিয়ার হ্যামলেট নাটকের নায়ক হ্যামলেটের স্বগতোক্তির মধ্যে মানুষের অবিস্মরণীয় মহিমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, ম্যান দ্যা ম্যাগনিফিসেন্ট ক্রিয়েশন, বোল্ড ইন ইমাজিনেশন— নোবেল ইন পারসেপশন ইত্যাদি। আমার তো রীতিমত ইচ্ছে করে নাম না জানা লোককবির স্তবকটি মহাকবির অমর পংক্তিমালার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করি। আমাদের দেশে এমন একজন লোককবি ছিলেন যাঁর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না, তাঁর অনুভবের উত্তাপ থেকে রক্তপদ্মের কলির মত এই পংক্তি ক'টি ফুটে উঠেছিল, ভাবতে কার না গর্ব হয়।

২

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ। এই অপরিসীম ব্যঞ্জনাময় শব্দটি যতবার উচ্চারণ করি একটা বিস্ময়বোধ শিরায় শোণিতে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এই দু'পেয়ে প্রাণীটি পারিপার্শ্বিকের সমস্ত বাধা অপার সৃষ্টি ক্ষমতা বলে অতিক্রম করে এ পর্যন্ত এসেছে। গুহামানবের যুগ থেকে মহাকাশ যাত্রার যুগ, এরই মধ্যে মানুষজাতি তার সহযাত্রী সৃষ্টিজগতের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কতদূর ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেলেছে ভাবতে চেষ্টা করলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। গরুর ইতিহাস গরুরই ইতিহাস। সিংহ লক্ষ লক্ষ বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনি রয়েছে। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী ক্রমাগত প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যদিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে করতে এই অবস্থায় এসেছে। নিজেকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে গিয়ে জগতকে নতুনভাবে সৃষ্টি করছে। নিজেকে পরিবর্তন করতে গিয়ে সৃষ্টিজগতকে পরিবর্তন করেছে।

মানুষ জগতকে যেভাবে বিস্ময় স্পন্দিত চোখে দেখেছে, নিজেকেও দেখেছে একই বিস্ময়াবিষ্ট প্রেরণায়। এই বিস্ময়াবিষ্ট প্রেরণা থেকেই সে সৃষ্টি করেছে ধর্ম, দর্শন বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা। মানুষই একমাত্র প্রাণী পূর্বপুরুষের ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-ভাবনা তার চেতনাকে সমিধ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে নতুনভাবে জ্বালিয়েও তুলতে পারে।

মানুষ জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-যন্ত্রণা এবং হতাশার শিকার। ব্যক্তি মানুষ মরণশীল। অভাব তাকে দগ্ধ করে, বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। নিষ্ঠুর পারি-পার্শ্বিকতা সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে। এগুলো অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, মানুষের বেলায়ও তেমনি নিষ্ঠুর সত্য। নিষ্ঠুর সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। মানুষ সম্পর্কে শেষ সত্য হল— মানুষ সবকিছুকে অতিক্রম করার, সমস্ত জড় জগতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার সংগ্রাম সে চালিয়ে যাবে।

মানুষ সবকিছুর সংজ্ঞা আবিষ্কার করে, কিন্তু সে সংজ্ঞার অতীত একটা সত্তা। মানুষের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে কৃতকৌশল, মগজ থেকে বিজ্ঞান, অন্তর থেকে শিল্পকলা, দর্শন এবং ধর্ম। মানুষ ধর্মের কল্পনা করেছে, কিন্তু ধর্মের অনুশাসন যখন প্রাণের প্রকাশ পথ রোধ করে দাঁড়ায় মানুষ তার বিরোধিতা করারও ক্ষমতা রাখে। ধর্মগ্রন্থের বাণীও তো মানুষের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে। মানবিক আবেগের চরমতম শিহরিত মুহূর্তটিতে মানুষ মনে করেছে একজন ঈশ্বর আছেন। যেহেতু মানুষ আপন চেতনার প্রতিরূপেই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, তাই ঈশ্বর আছেন। প্রাণ থেকে যার সৃষ্টি প্রাণেই তো তাঁকে লালন করতে হয়। সুতরাং প্রাণে প্রাণে তিনি লালিত হয়ে আসছেন।

৩

বিজ্ঞান যেমন মানুষের উর্ধ্বে উড্ডীন চেতনার সৃষ্টি, ধর্মও তেমন। একইভাবে মানবমেধা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলা এবং দর্শন। এমিয়েল তাঁর জার্নালের এক জায়গায় লিখেছিলেন, "যেদিন মানুষগোষ্ঠী, দেবতা, আঞ্চলিক দেবতার বদলে চরাচর ব্যাপী বিরাজমান অনন্ত শক্তির উৎস এক ঈশ্বরের নির্মল নাম ধারণায় গেঁথে নিতে পেরেছিলেন, মানুষের ইতিহাসে সেটি অনন্ত উজ্জ্বল দিন।" মানুষ নিজের সৃষ্টিশক্তির পরিধি নির্ণয় করার জন্য অনন্ত অসীম সমস্ত চরাচরের ওপর ক্ষমতাবান এক মহাসত্তার কল্পনা করতে পেরেছিল। এইখানেই মানুষের মহত্ব, এইখানেই তার অনন্যত্বমিলিয়ে মিশিয়ে সে অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারে। আবু সায়ীদ আইয়ুব বলতেন, 'আমি প্রচলিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মানুষের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী।'

৪

আলোচনাটা মারেফাত শাস্ত্রের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে যাচ্ছে। যেহেতু মানুষ অনাদি অনন্ত নির্মল সর্বনাম এক ঈশ্বরের কথা কল্পনা করতে পারে, তাই এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব

আছে। মনসুর ইবনে হুল্লাজ ভাবের আবেশে বলে উঠেছিলেন, যেহেতু আমি অনুধ্যানের ভেতরে চরম সত্যের রূপ ধারণ করতে পারি। সুতরাং আমিই সে চরম সত্য— আনাল হক। মানুষের ধারণার বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং মানব জীবন সার্থক করতে গেলে সেই ঈশ্বরে অবিচল আস্থা রাখতে হবে। বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে তাঁর নিদ্রা তন্দ্রাহীন অবস্থান। সেই ঈশ্বর সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই। যদি বিশ্বাস রাখতে পারি পরকালে স্বর্গলোকে আমার স্থান হবে এবং যদি না পারি নরকে অনন্তকাল ধরে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। ক্লান্ত প্রাণ মানুষের চিন্তাচেতনার যে অংশ নিছক প্রাণধারণের গ্লানির ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, বিদ্যুতের অক্ষরে পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে বিরাজমান থাকে এবং যা মানুষের ইতিহাসকে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহমান রেখেছে। তাকেই মানুষের ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি।

আমার কাছে ঈশ্বরচিন্তা আর অমরতার চিন্তা সমার্থক। কেউ যদি আমাকে আস্তিক বলেন বিনা বাক্যে মেনে নেব। আমি আস্তিক। যদি কেউ বলেন নাস্তিক আপত্তি করব না। আস্তিক হোন, নাস্তিক হোন, ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি কোন বিবাদের হেতু দেখতে পাইনে। আমার অভীষ্ট বিষয় মানুষ, শুধু মানুষ। মানুষই সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যচিন্তা সমস্ত বিজ্ঞান বুদ্ধির উৎস। সবকিছুই উচ্ছৃত হয়েছে মানুষের ভেতর থেকে। ধর্ম বলুন বিজ্ঞান বলুন শিল্পসাহিত্য দর্শন যা-ই বলুন না কেন, মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতাই সবকিছুর জন্ম দিয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে যা কিছু বেরিয়ে এসেছে আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন, গহনে ওগুলোর সবকিছুর মধ্যে একটা মিলন বিন্দু কোথায় যেন আছে। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সবকিছুর মধ্যে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে মানুষের মানুষি চেতনা ছাড়া অন্যকোন কিছুর সন্ধান পাইনি। যে পিতামাতা আমাকে আপনাকে জন্ম দিয়েছে, যাঁরা আমাকে আপনাকে লালন পালন করেছেন, যে সমস্ত মানুষের সুখস্মৃতি আমি আপনি ধারণ করে থাকি, আমি আপনি যে সমস্ত মানুষকে জানি, যাদের জানি না— শুধু অস্তিত্ব অনুভব করি, আমি আপনি যখন থাকব না, সেই সময়ে যে সমস্ত মানুষ মানুষি প্রাণের কলরবে এই পৃথিবীকে ভরিয়ে রাখবে বলে ধরে নিয়েছি, সবকিছু মিলিয়ে অনন্তজীবী এক বিমূর্ত মানুষের স্মৃতি আমার চেতনায় আসন নিতে চায় এবং সেটাকেই আমরা ঈশ্বর মনে করি।

এগুলো কোন নতুন কথা নয়। নানা মানুষ নানা পদ্ধতিতে এ সকল কথা বয়ান করে গেছেন। যেহেতু আমার অনুভূতি থেকে এই সদ্যোজাত বাক্যগুলো বেরিয়ে আসছে, তাই আমার কথা— এরকম একটা মোহ কখনো কখনো আমাকে একটুখানি আড়ষ্ট করে রাখে।

মানুষের ভেতরে ঈশ্বর এ কথাটি উচ্চারণ করার সময়ে নাম না জানা লোক কবির সে 'মানুষ' 'ঈশ্বরঘেরা' ওই পংক্তিটির কথা স্মরণে এলে মনের জোর, অনেকখানি বাড়ে। আমার কত আগে গ্রামের নিভৃত কুটিরে রেড়ির তেলের পিদিমের

স্বপ্নালোকে আমার দেশের এক অখ্যাত কবির হৃদয়ে ঢেউ দিয়ে এই হীরের শিখার মত পংক্তিটি জেগে উঠেছিল। সেই কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম।

৫

সমস্ত কিছুর উৎস মানুষ। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছু মানুষেরই সৃষ্টি। আমার তো মনে হয়, জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের সে বক্তব্যটির গুরুত্ব কোনদিন ফুরোবে না। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের যাবতীয় সিদ্ধির উৎকর্ষ অপকর্ষ মানবতার মূলভূমিতেই নির্ণয় করে নিতে হবে।' মানুষ আকাশে উড়তে পারে জলে ভাসতে পারে এবং আরো নানাবিধ ক্ষেত্রে শক্তি এবং ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। আকাশে তো পাখিও উড়ে এবং জলে জলচর প্রাণীরা ভেসে থাকতে পারে। সুতরাং পাখি কিংবা জলচর প্রাণীর মত শক্তি অর্জন করে মানুষের কি লাভ! মানুষের জৈবিক সংগঠনের ভেতরেই এমন একটা আশ্চর্য রহস্য নিবাস করে যা মানুষকে যুগ থেকে যুগান্তরে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ক্রমাগত নব নব পরিবর্তনের স্রোতে ধাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভেতরের এই আগুন, এই প্রমিথিয়ান ফায়ার এটাই মানুষের ঐশ্বরিক সত্তা। ব্যক্তি মানুষের দুঃখ আছে, ক্লান্তি আছে, পরাজয় আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু মানবজাতির দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই, পরাজয় নেই, মৃত্যু নেই। এই অদ্ভুতকর্মা মানুষ কোনদিন তার কীর্তির মধ্যে বাধা পড়ে না। মানুষের কীর্তি, তার বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি, সামাজিক সংগঠন যদি অনন্তের অভিসারী সত্তাকে আড়াল করে, তাকে অভ্যাসের মৌমাছিচক্রের পৌনঃপুনিকতায় নিমজ্জিত করে রাখে, ধরে নিতে হবে সেখানে মানুষের অধঃপতন ঘটে গেল, সেখানে মানুষী সত্তা পরাজয়কে মেনে নিল।

বোধকরি ভগবান বুদ্ধ মানবসত্তার এই অনন্ত তৃষ্ণাকেই নির্বাণ বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, সমুদ্রের পানি যেমন নোনা, তেমনি আমার এই সাধনা, তারও একটা স্বাদ আছে। সেটা হল মুক্তির স্বাদ। মানুষ সমগ্রের সৃষ্টি এবং সমগ্রের মধ্যে যদি লীন হতে না পারে, তাহলে তার মুক্তি হল না।

৬

সভ্যতার স্পর্শবর্জিত আদিম উপজাতি থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক জীবনোপকরণ এবং প্রযুক্তির অধিকারী মানবসমাজ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বোধ এবং উপলব্ধি অনুসারে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে যুক্ত করে তার জীবনভাবনা নির্মাণ করে। কেউ খণ্ডিত একা এবং বিচ্ছিন্ন থাকতে চায় না। মানুষকে যা কিছু অনন্তের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তা মানুষের মহত্ব এবং অনন্যত্বকে খর্ব করে, খাটো করে।

মানুষ ধর্মের আবিষ্কার করে অনন্তের মধ্যে তার অবস্থানের একটা সামঞ্জস্য নির্মাণ করেছে। যখন ধর্ম অনন্তের উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ ধর্ম

বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে। এক বিশ্বাস বর্জন করে অন্য বিশ্বাসকে বরণ করে নিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস হোক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংগঠন হোক, যেদিক থেকেই নৈতিক বন্ধন তার চলমানতার পথে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ করার অধিকার, গতানুগতিকতাকে মেনে না নেবার অধিকারই মানুষের চলার পথের সবচাইতে বড় পাথেয়।

৭

মানুষ আশ্চর্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ সৃষ্টি করতে পারে এবং সেগুলোকে স্থায়িত্ব এবং প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর নীতিমালা এবং কেজো আচরণবিধির জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তারও চাইতে বড় কথা হল, মানুষ এক সময়ের নির্মিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহ ভেঙ্গে ফেলে ভিন্নরকম সামাজিক সংগঠনের কথা চিন্তা করতে পারে, জন্ম দিতে পারে এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য ভিন্ন ধরনের নীতিমালা এবং আচরণ বিধির সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ আশ্চর্য সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলোর উপযোগবাদিতা অস্বীকার করে অধিকতর উদ্দেশ্যানুগ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারে। চিন্তাভাবনা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের মহত্ব তারও চাইতে অধিক মানুষের কীর্তির চেয়ে মানুষ মহৎ।

মানুষ বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, স্বীকার করে, প্রয়োজনে ঈশ্বর সৃষ্ট করে, সৃষ্ট ঈশ্বরের নির্বাসন দিতে পারে। মানুষের ঈশ্বরচেতনা বস্তুত অনন্তের পথে মানুষের আত্মোপলব্ধির একটা পর্যায় মাত্র। মানুষ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে চিন্তা করেছে এবং এই ফাঁকে এক লোকোত্তর ঈশ্বর তার চেতনায় অধিষ্ঠান নিয়ে বসেছেন। মানুষ নিজেকে যতদূর জেনেছে, তারও চাইতে বেশিদূর জানতে পারেনি। মানুষ সৃষ্টি জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারও চাইতে বেশি অজ্ঞ নিজের বিষয়ে। এই অজ্ঞতার অবসান যেদিন হবে, বোধকরি সেদিন মানুষের আর কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।

মানুষ সৃষ্টিজগত সম্বন্ধে শেষকথা যেমন বলতে পারে না, তেমনি নিজের সম্বন্ধে শেষকথা বলারও তার অধিকার নেই। সুতরাং একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। তিনি ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর না হলেও কোন ক্ষতি নেই। ইতিহাসে অনেক সময়েই দেখা গেছে মানুষেরই কল্পনাপ্রসূত নানা জিনিস ঈশ্বরের স্থান দখল করেছে, আর মানুষ মহা উৎসাহে সেগুলোকে মান্য করতে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্য এই মানুষ।

বুদ্ধদেবের কথায় ফিরে যাই। তিনি মানুষের বাইরে অন্য সত্তার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, ওহে মানুষ তোমার অস্তিত্বের বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই, তুমি নিজেই নিজের আলোক বর্তিকা হও। কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁকে ভগবানের আসনে

বসিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। মানুষের চেতনার এমনই একটা ধরন সে ক্রমাগত ঈশ্বর সৃষ্টি করছে, ঈশ্বর ধ্বংস করছে।

মানুষের বাইরে অন্যকোন ঈশ্বর আছেন কি না, তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু মজার কথা হল এই ঈশ্বরকে মানুষ কল্পনায় ধারণ করেছে এবং মানুষের কল্পনার মধ্যে এই ধারণাটা চালিয়ে দিয়ে গেছে। মানুষ যে রকম তার হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাদ দিতে পারছে না সেরকম ঈশ্বরের ধারণা ত্যাগ করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের বিকল্প যা কিছু আবিষ্কার করুক না কেন তার মধ্যে ঈশ্বরীয় মহিমা তাকে আরোপ করতে হয়। ঈশ্বর যেমন দুর্জ্ঞেয় তেমনি মানুষও দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করছেন এটা মেনে নিতে পারলে সমস্যাটা মিটে যেত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে এবং সেখানেই ভর করেছে সমস্ত জটিলতা। ঈশ্বরের কথা না হয় নাইবা ভাবলাম। কিন্তু মানুষ কী? কোনদিন কী জবাব পাওয়া যাবে?

১৯৮৯

গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথের সৃজনী শক্তির সঙ্গে জার্মান কবি গ্যোতের সৃজনী শক্তির আশ্চর্য একটা মিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমের এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিলে বোধ করি খুবই অন্যায় করা হবে। বঙ্কিম ছিলেন নানা ইউরোপীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রথম বাঙালি লেখক যিনি বাংলাভাষা এবং সাহিত্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ইউরোপের বড় বড় স্রষ্টা পুরুষদের রচনা পাঠ করেছিলেন। সুতরাং গ্যোতের রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হার্দ্য পরিচয় ঘটেছিল, একথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। গ্যোতে প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা যথার্থ ধারণা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে স্বতঃস্ফূর্ত গভীর জীবনোল্লাস বিকশিত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে এমন একটা যুৎসই মন্তব্য তিনি করতে পারতেন না।

বাস্তবিকই গ্যোতে এবং রবীন্দ্রানাথ এই দুই কবির আন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সর্বাগ্রে একটা বিষয় চোখে পড়বে। উভয়েই জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন প্রধানত গীতিকবি। কবি ছাড়া গ্যোতের আরো অনেক পরিচয় রয়েছে। যেমন তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, বলতে গেলে আজীবন মন্ত্রী, নাট্যমঞ্চের পরিচালক, খনিজ বিশেষজ্ঞ, উপন্যাস লেখক, নাট্যকার, চিত্রকলার সমঝদার এবং বিজ্ঞান সাধক। গ্যোতের মত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও ছিল অত্যন্ত প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথ রাজ্য শাসন করেননি, কিন্তু জমিদারি চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারির আয়তন ভাইমারের তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল না। বাংলা সঙ্গীতে তিনি একটা রীতির প্রবর্তন করেছেন। বাংলার চিত্রকলায় সর্বপ্রথম আধুনিকতার সূচনা করেছেন। একক প্রচেষ্টায় সেই পরাধীন ভারতবর্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। গল্প, কবিতা, নাটক শিশুসাহিত্য সবকিছু তো লিখেছেনই। এই দুই মহান স্রষ্টা পুরুষের জীবনবৃত্তের দিকে তাকালে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চোখেও ধরা পড়তে বাধ্য, উভয়ে ছিলেন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। প্রতিভার বহুমুখিতা এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যের বিচারেও দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য অতি সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। কিন্তু এই দুই কবির সবচেয়ে যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তা হল, উভয়েই গীতিকবি। জীবনের সকল পরিস্থিতিতে, সকল বয়সে দুই কবি অজস্র গীতিকবিতা রচনা করে গেছেন। উভয়ের ক্ষেত্রে একথাটা একরকম অবধারিত সত্য যে গীতিকবি এই পরিচয় অন্য সবগুলো পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে।

এছাড়া অন্য যে ব্যাপারটি সকলের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়, সেটা হল প্রতিভার বহুচারিতা। শিল্প-সাহিত্যের কোন বিশেষ একটা মাধ্যমের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে উভয়েই অনেকগুলো মাধ্যমের মধ্যদিয়ে সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই কারণেই উভয়ের অবদান বিপুল কলেবর ধারণ করে স্ফীত হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রতিভার চারিত্র্যের কথা বাদ দিলেও বহিরঙ্গের দিক দিয়ে কতিপয় স্থূল বিষয়ে গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃতিবান বিত্তসম্পন্ন পরিবারে। দুজনেই জন্মসূত্রে পরিবেশ পরিস্থিতির অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। গ্যোতে যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়কার বহুধা বিভক্ত জার্মানিতে একটি জাতীয়তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে সন্ধান করলেও দেখা যাবে তাঁর শৈশবে স্বাধীনতার স্পৃহা ভারতীয় তথা বাঙালি মানসে জাগ্রত হয়েছে। যৌবনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেগ এবং আবেগ দুই-ই সঞ্চারিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটার যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন ভারতবর্ষ একরকম স্বাধীনতার দোরগড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিভার সঙ্গে একটা অলোকসামান্য ব্যাপার যুক্ত থেকেই যায়। সেটুকু বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে দুজনের সম্বন্ধে একটা বিষয় অবশ্যই কবুল করতে হবে যে আপনাপন দেশ এবং কালের উত্তাপে উভয়ের সৃজনী প্রতিভা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে উভয়কেই বলতে হবে আপনাপন দেশ কালের সন্তান।

রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের মধ্যে বড় ধরনের যে সকল মিল লক্ষ করা যায়, নারীর প্রেম হল তার মধ্যে একটি। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতে দুজনেই কৈশোরের উন্মেষ থেকে একেবারে বার্ধক্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত একের পর এক অনেকগুলো রমণীর প্রেমে পড়েছেন। তবে গ্যোতের প্রেম সরাসরি নরনারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এরকম মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম এসেছে নানা ঘুরতি পথে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে। সাহিত্যেও এগুলোর উদ্ভাসন ঘটেছে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে। এটি ঘটেছে সমাজ ও সামাজিক রীতির বাধ্যবাধকতার কারণে। উভয়েই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, উভয়েরই জীবন প্রকাণ্ড হর্ম্যমালার মত বিরাট ও সমুচ্চ। গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বিষয়ে যেমন মিল দেখা যায়, তেমনি উভয়ের মধ্যে গরমিলের পরিমাণও কম নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, সময়, সমাজ এবং সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার ব্যাপার বাদ দিলেও গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপনাপন পরিবেশ পরিমণ্ডলে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন স্রষ্টাপুরুষ। একজনের সঙ্গে অন্যজনের তুলনা করার কোন অর্থই হয় না। প্রসঙ্গক্রমে তুলনার কথাটি আসে।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে গ্যোতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করার কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। গ্যোতে অনেক বেশি দৃঢ় ঋজু, তাঁর মেরুদণ্ড অনেক বেশি সবল এবং দৃঢ় সংবদ্ধ। সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি জড়ানো পেঁচানো। গ্যোতের প্রতিভা যে পরিমাণে উল্লম্ব বা ভার্টিক্যাল তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বলতে হবে হরাইজেন্টাল অথবা বিস্তারমান। গ্যোতের মধ্যে নিখাদ সত্যের পরিমাণ অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথেও সত্য আছে, তবে তাতে গিল্টির পরিমাণও নেহায়েত কম নয়। গ্যোতে সমাজ সংসার থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করে প্রবহমানতার সূত্রসমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সমাজ সংসারের মধ্যে বয়ে যেতে হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপোসকামিতার লক্ষণটি অধিক সুপরিস্ফুট। কিন্তু গ্যোতের মধ্যে পৌরুষ অনেক শক্তিশালী। তিনি যা সত্য এবং ন্যায় মনে করেছেন, তাই পালন করেছেন। কেউ তাঁকে আপন অন্তরস্থিত বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেনি। "আমি ভালো হব, মন্দ হব প্রকৃতির মত হব" একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না। গ্যোতের অভীষ্ট ছিল শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সঙ্গে ধর্মের একটা মেল বন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। গ্যোতের বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য তুলনাবিহীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনই বাস্তবতাকে কামড়ে ধরতে গেছেন অমনি আধিভৌতিকতা এসে তাঁকে অন্য লক্ষ্যে তাড়িত করে নিয়ে গেছে। রচনার মধ্যে সন্ধান করলে দেখা যাবে গ্যোতের রচনার দাহিকাশক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনার চাইতে অনেক বেশি।

গ্যোতে ছিলেন রীতিমত বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর দখল নিয়ে কারো প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানে অপরিসীম উৎসাহ এবং শিশুসুলভ বিস্ময়বোধ ছিল। সাবালক মানব মস্তিষ্কের ফসল হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা কখনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য একথা উল্লেখ করা একটুও অযৌক্তিক হবে না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের অন্যান্য কৃতবিদ্য লোকের তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। এই বিজ্ঞানমনস্কতা না থাকলে তাঁর রচনা ঠিক ধর্মতত্ত্বে পর্যবসিত হতে পারত।

গ্যোতে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপন দেশ-কাল পরিমণ্ডলে যথার্থ অর্থেই মহান পুরুষ। একজনকে অন্যজনের তুল্যমূল্যে কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। তথাপি মানুষকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যোতের গোটা পরিপ্রেক্ষিতটা বিচার না করে একতরফাভাবে বিচার করতে গেলে অবশ্যই তা একমুখো হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গ্যোতে করেছেন জার্মান তথা ইউরোপীয় সমাজের। রবীন্দ্রনাথের মেকিত্ব তাঁর সামাজিক মেকিত্বেরই সাহিত্যিক রূপায়ণ। তথাপি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান জার্মান সাহিত্যে গ্যোতের অবদানের তুলনায় তা কিছু পরিমাণে কম নয়। গ্যোতের সমসাময়িককালে জার্মান ভাষা বিজ্ঞান, দর্শন ও কলাবিদ্যার নানা শাখায় যথেষ্ট

পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। দার্শনিক হেগেল, কান্ট এবং শোপেন-হাওয়ার জন্মগ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতে বেটোফেন এবং মোৎসার্ট এসে গেছেন। তারও আগে ইউরোপীয় সঙ্গীত জগতকে বাখ এবং হ্যান্ডেলের প্রতিভা কাপিয়ে দিয়ে গেছে। ভাষা-বিজ্ঞানী শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় ভাষাতত্ত্বের নতুন অবদানের মাধ্যমে জার্মান ভাষাকে অনেক দূর সমৃদ্ধির পথে ধাবিত করে নিয়ে গেছেন। বহু আগে মার্টিন লুথার জার্মান গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করে ভাষার যে একটি পেশী বহুল কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, সেই ভাষাতেই অনেক বিজ্ঞান সাধক তাদের সাধনা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পেছনে কি ছিল? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্ব-সাকুল্যে এই তো ছিল রবীন্দ্রনাথের মূলধন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনুসন্ধান এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, শিক্ষিত 'এলিট' বাঙালিরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লিখতে রীতিমত লজ্জাবোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই তেজারতিতে এত অল্প মূলধনে বা যত বেশি লাভ হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের দিনের বাংলা ভাষাটি। একটি প্রাদেশিক ভাষাকে সারাজীবনের সাধনায় একটি বিশ্ব ভাষায় উন্নীত করা এ-কি কম শ্লাঘার বিষয়? গ্যোতের প্রতিভার পাশাপাশি বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে যতই ঝাপসা এবং অস্পষ্ট মনে হোক না কোন, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, বাঙালি যে পরিমাণ ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে গ্রহণ করেছে, এককথায় তাকে অন্তহীন বললে খুব বেশি বলা হবে না। বাংলা সাহিত্যে কেন কবির ওপর গ্যোতের যদি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে থাকে, তখনো অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর বয়সে জার্মান শেখার জনশ্রুতিটি ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও নিশ্চিত করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খুঁটিয়ে গ্যোতের রচনা পাঠ করেছিলেন। একবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খেদসহকারে তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং গ্যোতের সমসাময়িক পরিস্থিতির তুলনা করেছিলেন অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন গ্যোতে তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতির কাছ থেকে যে পরিমাণ আনুকূল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে তুলনায় খুব অল্প আনুকূল্যই লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিবেশিনী' গল্পে 'টাসসো' নাটকের উল্লেখ দেখতে পাই। গল্পের নায়ক একটি কলেজের ছাত্র। তার ছিল প্রবল যশাকাঙ্ক্ষা। সে টাসসো নাটকের মূলভাব চুরি করে, নিজের নামে একটি নাটক রচনা করেছিল। অধ্যাপক সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। খুব খুঁটিয়ে না পড়লে এভাবে 'টাসসো' নাটককে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো কবিতায় গ্যোতের প্রভাব কখনো সরাসরি কখনো বা স্থানীয় রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় 'আমার চেতনার রঙে পান্না

হলো সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে'— এই গোটা প্রথম স্তবকটিই ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের একটি অংশের আক্ষরিক অনুবাদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। মনে হয়েছে গ্যোতের কাছ থেকে মূল ভাবটি গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেছেন। যেমন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি। ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের গৌরচন্দ্রিকায় কবির উক্তি—

মানুষের মহিমাকে দেবত্বের স্তরে / নিয়ে যেতে একমাত্র কবিকৃতি পারে।'

পাঠ করে যে কেউ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির জন্ম রহস্য কোথায়। আর 'বৈষ্ণব কবিতা' কবিতার চরণ দু'টি

আর পাব কোথা
"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

এই অংশটির সঙ্গে ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের মার্গারিটার সঙ্গে কথোপকথনকালে ফাউস্টের এই কথাগুলো মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—

'প্রেম বলো, বলো তারে আনন্দ স্বরূপ
কিংবা অনুরাগ ভরে ডাকো আল্লা রহমান
আমি তো জানি না নাম, নামে তার ঘটে সংকোচন
নাম মানে শব্দ মাত্র, নাম মানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।'

তাছাড়া 'কাহিনী' 'কথা ও কাহিনী'র অনেকগুলো কবিতায় এবং 'বিদায় অভিশাপ' নাট্য কবিতাটিতে সরাসরি গ্যোতের প্রভাব পড়েছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ গ্যোতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এসব কবিতা যদি লিখে থাকেন তাহলে তো খুবই ভাল কথা। আর গ্যোতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এসব কবিতা যদি লিখে থাকেন, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা কোন অংশে ক্ষুণ্ন হয় না। এটা কোন নতুন কথা নয় যে এক মশালের আগুন থেকে যেমন অন্য মশাল জ্বলে উঠতে পারে, তেমনি এক প্রতিভাই অন্য একজন প্রতিভাবানের অন্তরের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে।

১৯৮৬

গ্যোতে : প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রেক্ষিতে

বিশ্বাসহিত্য শব্দটি প্রথম গ্যোতেই ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে বিশ্বের জাতিসমূহের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করে, সেগুলোকে মননশীলতার স্পর্শে নব রূপায়নের প্রয়াস অন্যকোন সৃজনশীল ইউরোপীয় মনীষীর মধ্যে গ্যোতের মত তেমন উজ্জ্বলসহকারে ফুটে উঠতে দেখা যায়নি। গ্যোতে রেনেসাঁর সন্তান। গ্রিকো রোমান সংস্কৃতির প্রায় সবটুকু আগুন নিজে জ্বলে ওঠার প্রয়োজন তিনি আত্মসাত করেছিলেন, একথা বললে খুব বেশি বলা হবে না।

গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতির মর্মমধু আপন চিত্ততলে আহরণ করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কল্যাণময় দিকটির প্রভাবও যে তাঁর মধ্যে খুব ভালভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্যোতে যাজক শাসিত ধর্মতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর বাণীকে অন্তরে অন্তরে মানবজাতির সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অন্যতম মৌলিক উপাদান মনে করতেন। গ্যোতের চিন্তা প্রবাহের মধ্যে বয়সের সঙ্গে নানা ব্যয় পরিবর্তন এবং রূপান্তর এসেছে, তথাপি খ্রিস্টধর্মের এই সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি তাঁর যে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অঙ্গীকার তার কোনদিন রঙছুট হয়নি।

তাঁর মানসপ্রবৃত্তির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেকে গ্রিক প্যাগানদের মত মনে করতেন। অবশ্য এটা একটা কাব্যবিশ্বাস। সব বড় কবিদের মধ্যে এই ধরনের একটা জ্বলন্ত বোধ ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের একটা উপলব্ধি ক্রিয়াশীল না থাকলে তাঁরা চিত্তবৃত্তি স্ফূর্তির উপযুক্ত স্বাধীন, স্বরাট এবং নির্ভর মনে করতে পারেন না। কিন্তু গ্যোতে ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সমসাময়িক রেনেসাঁ উত্তর ইউরোপের মানুষ। রেনেসাঁ থেকে রিফরমেশান, তারপর ফরাসি বিপ্লব এই যে বিরাট যুগান্তকারী পরিবর্তনসমূহ ইউরোপীয় মানসের বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে, তার প্রত্যেকটি গ্যোতের ভাবনাপ্রবাহে তরঙ্গ তুলেছে। শুধু গ্যোতে একা নন তৎকালীন প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার চিন্তা তাঁদের অনেকেরই পদ্ধতিতে এগুলো একভাবে না হলে অন্যভাবে প্রভাব হিসাবে কাজ করেছে।

কিন্তু গ্যোতে ব্যক্তিত্বের প্রাতিস্বিকতা এবং তাঁর জীবনভাবনার অনন্যত্ব সন্ধানের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে হবে। আর সেটি হল এই, গ্যোতে

গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতির ঘনত্ব, গভীরতা এবং গরিমা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি এর একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেই ব্যাপারটিও খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও অনিদ্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন অইউরোপীয় সংস্কৃতিসমূহের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন। এই অইউরোপীয় সংস্কৃতিসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্যোতে প্রথম বা একমাত্র ব্যতিক্রম একথা বলা ঠিক হবে না। গ্যোতের পূর্ব থেকেই পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা তীক্ষ্ণ এবং গভীর আগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠতে লক্ষ করা গেছে। গ্যোতের সমসাময়িক কালেও অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ জার্মানিতে অনেককেই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম করতে পারি।

গ্যোতের সঙ্গে অন্যদের এ ব্যাপারে একটা মৌলিক ফারাক হল এইখানে যে অন্যরা ভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতিসমূহকে অনেকটা উপাত্ত সংগ্রহের উৎস হিসেবে দেখছিলেন। কিন্তু গ্যোতে দেখেছিলেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির মহিমামণ্ডিত গরীয়ান পূর্বসূরী কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে। এই যে অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তাকে আপন সংস্কৃতির সমান জ্ঞান করা এবং তার মধ্যে উৎকর্ষমণ্ডিত কিছু থাকলে কর্ষণে ঘর্ষণে আপন মানসের অঙ্গীভূত করা, এটা গ্যোতের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, অন্যকোন ভাবুক কিংবা চিন্তা-নায়কের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটতে দেখা যায়নি।

গ্যোতের সমসাময়িক অন্যান্য ভারত বিশেষজ্ঞের তুলনায়, তাঁকে হিন্দু সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারক, একথা বলা যাবে না। তথাপি তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রাচীন হিন্দু কবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের গৌরচন্দ্রিকা বা সূচনাংশের অনুকরণে তাঁর গোটা জীবনের সাধনার ধন 'ফাউস্ট' নাটকে একটি সূচনাংশ সংযোজিত করেছিলেন। বন্ধুজন বন্ধুজনের সঙ্গে যেভাবে বাক্যালাপ করে, গ্যোতে সংস্কৃতিসমূহের আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে সেরকম একটি মানদণ্ড আপন অন্তরে স্থির করে নিয়েছিলেন। গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের অহংপুষ্ট মনোভাব কখনো গ্যোতের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেনি।

শুধু কালিদাস অথবা হিন্দু সংস্কৃতির নয়, একই দৃষ্টিতে তিনি পারসিক সংস্কৃতির প্রতিও তাকিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ পারসিক গীতিকবি হাফিজের দিওয়ানের অনুকরণে তিনি যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দিওয়ান কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, পাশ্চাত্যের সমালোচক তার কাব্য সফলতা নিয়ে যতই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতর্ক উত্থাপন করুন না কেন, তিনি যে শ্রদ্ধা বিজড়িত দৃষ্টিতে প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছিলেন, প্রাচ্যের মানুষও তাঁকে একই রকম শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করবে।

গ্যোতের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চিন্তা যে যথার্থ অর্থে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছিল বোধকরি তার পেছনের প্রধান কারণ এই ছিল যে জাতিসমূহের মননশীলতার প্রকাশের প্রতি তিনি আদিতে শ্রদ্ধাসহকারে তাকাতে পেরেছিলেন। সংস্কৃতি চিন্তার মত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও গ্যোতে সার্বজনীনতাবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। গ্যোতের সময়কালীন ইউরোপের ইহুদিদের প্রতি কি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গীই না পোষণ করা হত। অথচ গ্যোতে কি অকুণ্ঠ প্রশংসাসহকারে ইহুদিদের ভাল গুণগুলো তুলে ধরেছেন। একই কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে ওসমানীয় তুর্কিদের হাতে রোমানদের পতনের পরে রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত দেশসমূহে ইসলামের প্রতি একটা বিদ্বিষ্ট মনোভাব সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। তার পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টান মুসলমান ক্রমাগত ক্রুশেডের মাধ্যমে এই বিদ্বেষ, এই ঘৃণা আরো গভীরাশ্রয়ী এবং আরো দৃঢ়মূল ও কঠিন হয়েছে। ল্যাটিন ভাষার প্রভাব হ্রাস পাওয়ার যুগে ইউরোপের জাতীয় ভাষাসমূহ যখন বিকশিত হতে শুরু করেছে, সেই পুরাতন বিদ্বিষ্ট মনোভাবে এই ভাষাসমূহের সৃজনশীল ব্যক্তিত্ববর্গের রচনায় নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য ইসলাম এবং ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে একটি পুনর্বিচার ইউরোপে শুরু হয়েছিল। এটা যে সঠিক বিচার তা কিছুতেই কবুল করা যাবে না। তথাপি একটা বিবেচনাশীলতা, একটা যুক্তি শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। ইংরেজ কবি শেলির 'Revolt of Islam' কাব্যগ্রন্থ, ভোলতেয়ারের 'Mohmet' নাটক এই পর্যায়ের ইসলাম সম্পর্কিত সৃষ্টিশীল রচনা সমূহের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্যোতে তাঁর যৌবনদিনে ভোলতেয়ারের এই 'Mohmet' নাটকটি জার্মান অনুবাদ করছিলেন। আজকের দিনের ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানাশোনা আছে এমন ইউরোপীয় ব্যক্তির এই নাটকটির প্রতি তাকালে আঁতকে ওঠার কথা। ভোলতেয়ার মহাপুরুষ মুহম্মদের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করেছিলেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই নাটকের জার্মান ভাষায় অনুবাদক ছিলেন গ্যোতে।

কিন্তু পরিণত বয়সে ইসলাম সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা কতদূর বিকশিত হয়েছে, দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। কি বিস্ময়কর বিবর্তন। এটা যুগরুচি, সামাজিক সংস্কার এবং তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের পোষিত মনোভাবের প্রতিকূলে কতদূর দুঃসাহসী মানস অভিযাত্রার ফলে সম্ভব হতে পেরেছে, ভেবে দেখার বিষয়। কি ধর্ম, কি সংস্কৃতির বিষয়ে গ্যোতের যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন মনোভাব, তা তাঁকে কঠোর সাধনায় অর্জন করতে হয়েছে। পরিবেশ বা পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন মানস সম্পদ নয়।

পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে গ্যোতের শ্রেষ্ঠত্ব একরকম অবিসংবাদিত। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মণীষীবৃন্দের মধ্যে গ্যোতের অনন্যত্ব, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ

উপাদান যুক্তি বিচার এবং অপরিমেয় প্রশ্নশীলতা তার ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়েছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখটা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে সমর্পিত চিত্ততা এবং মরমী চিত্ত সাধক পুরুষ— ভারতবর্ষে যাদের বলা হত ঋষি এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইরান আর তুর্কিস্থানে যাঁরা সুফি সাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, বিনা দ্বিধায় গ্যোতেকে এবং মরমীপনা মূল্যবিচারের একটি মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করানো যায়। এই নিরিখে তাঁদেরকে একই তুলাদণ্ডে স্থাপন করে তুল্যমূল্যে বিচার করা যায়। গ্যোতে গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতি চিন্তার অংশ অপহারী, ইউরোপীয় চিৎপ্রকর্ষ তথা রেনেসাঁর উত্তরসূরী, শেক্‌সপিয়রের যথার্থ শিষ্য একথা যেমন বর্ণে বর্ণে সত্য, তেমনি একইভাবে আরবিয়, পারসিক এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগসম্পন্ন, কালিদাসের মুগ্ধ ভক্ত এবং হাফিজের অন্তরের মিতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দুই বিরাট, মহান গরীয়ান সংস্কৃতিপ্রবাহের দুটি ধারাই তাঁর মানস সরোবরে গঙ্গাযমুনার মত এসে মিশেছে।

১৯৮৬

গ্যোতে : জনৈক বাঙালির দৃষ্টিতে

তখন ১৯৬৪ সাল। অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ঢাকায় একবার সাম্প্রদায়িক ভাঙ্গা হয়। সে বিষয়ে এখানে কিছু বলার অবকাশ নেই। আমি আমার বন্ধু অরুণেন্দু বিকাশ দেবের বাড়ি পাহারা দিতে গিয়েছিলাম। ওদের বাড়ি ছিল পুরোনা ঢাকার একটা গলিতে।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে সারারাত জেগে কাটিয়েছি। সকালবেলা গোসল করবার জন্য গায়ে মাথায় শর্ষের তেল মাখাচ্ছি, সে সময়ে একটা পুরনো বইয়ের স্তূপের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। এটা একটা দুর্ঘটনা বলতেই হবে। চারদিকে পরিবেশটা এমন ভূতুড়ে এবং এমন থমথমে যে পুরনো বইয়ের ওপর আগ্রহ জন্মানোর অনুকূল সময় সেটা ছিল না।

তথাপি কেন বলতে পারব না, ওই ছেঁড়াখোঁড়া বইয়ের স্তূপ থেকে একটা কীটদষ্ট জীর্ণ বই তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। বইটার কোন মলাট ছিল না। ইনার টাইটেলের পাতাগুলো খসে গিয়েছিল। তাই গ্রন্থকারের নাম জানার কোন উপায় ছিল না। ফলিওতে দেখলাম লেখা রয়েছে 'ফাউস্ট'। আমরা সবেমাত্র গণ্ডগ্রামের কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ইংরেজি ভাষা মোটামুটি লিখতে পড়তে পারলেও দখল বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ভাষার এই সামান্য জ্ঞান নিয়েও আমি যখন ওই মলাটহীন আধছেঁড়া বইটি পড়তে থাকি, মনে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব গভীর আনন্দ অনুভব করি।

সব যে বুঝতে পারছিলাম, সেকথা সত্য নয়। সবগুলো ইংরেজি শব্দের অর্থ উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। টুটাফাটা ইংরেজি ভাষাজ্ঞান নিয়েও বইটি পড়তে গিয়ে অনুভব করি আমার ভেতরের প্রাণ গভীরভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এলাম। 'All theory is grey, but the golden tree of life is ever green.' এই আশ্চর্য পংক্তি দুটো পাঠ করার পরে আমার মধ্যে একটা ভাবান্তর ঘটে গেল। পংক্তি দুটো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সোনার ঘুঙুরের মত বাজতে থাকল। মনের মধ্যে আনন্দের একটা উৎস ধারা ছলছল করে বয়ে যেতে থাকল। এই অসহ্য আনন্দের ভারে আমি, আমার সর্বসত্তা গুণীর হাতের তারের যন্ত্রের মত বেজে উঠছিল। সেই অপূর্ব অনুভূতির কথা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই।

আমার অবস্থানের এক শ' গজ দূরে তাণ্ডবলীলা চলছে। মানুষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে। সত্যিকার অর্থে মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত টলটল করছে। সেই গ্রন্থিচ্যুত বীভৎস সময়ে এরকম দুটো পংক্তি সমস্ত তত্ত্ব মিথ্যা, অর্থহীন জীবনের সোনালি তরুটিই থাকে কেবল চিরহরিৎ। প্রাচীন হিব্রু পয়গম্বরের কাছে যেমন স্বর্গবার্তা নেমে আসত, তেমনি অঘটন কিছু ঘটে গেলেও জীবনের প্রতি এতটা আস্থা ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ।

সেদিন সন্ধ্যায় শহরের পরিস্থিতির একটু উন্নতি হল। কার্ফু উঠিয়ে নেয়া হল। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যক্ষের বাড়িতে যেতে পারলাম। ভদ্রলোক ছিলেন রগচটা এবং হামবড়া স্বাভাবের মানুষ। অনেক সময় তাঁর বিভাগে চার বছর পড়েছে, এমন ছাত্রকেও বলে বসতেন, তুমি কে বাপু ইতিপূর্বে তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভদ্রলোকের একটি জিনিস তাঁর চরিত্রের যাবতীয় অবগুণ ঢেকে দিয়েছিল, তিনি ক্লাসিক সাহিত্য শুধু ভালবাসতেন না, অপরের মধ্যে সে ভালবাসা সঞ্চারিত করতেও পারতেন।

সে কথাও থাকুক, আমি ড. হোসেনের কাছে সরাসরি বলে ফেললাম, আমি পুরান বইয়ের মধ্যে 'ফাউস্ট' নামের একখানি বই পেয়েছি। অংশবিশেষ পাঠ করে আমার মনে প্রচণ্ড তরঙ্গ জেগেছে, কিন্তু লেখকের নাম জানিনে। তিনি চশমার কাঁচ মুছে চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে তুমি বলতে চাও যে জার্মান কবি গ্যোতের নাম কোনদিন শোননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান কিভাবে যে নেমে যাচ্ছে, তাই নিয়ে ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলেন। মনে, চেতনায় যে আনন্দ জন্ম নিয়েছে তা নিয়ে আমি এত তন্ময় ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান নিয়ে আমার সামন্যতম দুশ্চিন্তাও ছিল না। ড. হোসেন তাঁর পেশাগত ক্ষোভ এবং বিরক্তি প্রকা[শ] করার পর অবশেষে দয়াপরবশ হয়ে জানালেন 'ফাউস্ট' হচ্ছে জার্মানির সর্বপ্রধান ক[বি] গ্যোতের অমর কাব্যনাটক। তিনি গ্যোতের বিষয়ে আরো অনেক কথাবা[র্তা] বলেছিলেন। তাঁর কথাবার্তা নিশ্চয়ই জ্ঞানগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। বোধকরি [সে] কারণেই সেগুলো আমার মনে স্থান করে নিতে পারেনি। অবশ্য তিনি কতিপয় কে[জো] সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে কাজী আবদু[ল] ওদুদ রচিত কবিগুরু গ্যেটে এই নামে দু'খণ্ডে সমাপ্ত দুটি গ্রন্থ আছে। আমি য[দি] গ্যোতে সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি জানতে চাই, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কা[জী] সাহেবের গ্রন্থ দুটো যেন পড়ে ফেলি। তার পরের দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি[তে] যেয়ে বই দুটো পড়তে শুরু করি এবং দুদিনের মধ্যে শেষ করি। বই দুটো প[ড়ে] গ্যোতের জীবন এবং কর্মসম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ধারণা আমার মধ্যে গড়ে ওঠে।

বাজারে খোঁজ করে পেঙ্গুইন সিরিজের লুই ম্যাকনিসকৃত 'ফাউস্টে'র ইংরে[জি] অনুবাদ কিনে আনলাম। একই সঙ্গে ভের্থরের 'দুঃখ' উপন্যাসখানাও পেয়ে গেলা[ম]। ইংরেজ নাট্যকার মার্লোর 'ডক্টর ফস্টাস' নাটকটিও সংগ্রহ করে ফেললাম। বা[ংলা] ভাষার লেখকদের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ঘটেছিল। ইংরেজি ভাষার বেশ কিছু

লেখক কবির নাম এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করার জন্য আমাকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। একটা সুবিধে আমার ছিল। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টা করার তাগিদ আমাকে পেয়ে বসেনি।

এই সময়ে একটা জিনিস আমি লক্ষ করি। ইংরেজি ভাষার তুচ্ছতম লেখক কবি সম্পর্কে সাহিত্যরসিকদের যে আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখা যেত সে তুলনায় গ্যোতে শীলার বা কন্টিনেন্টাল লিটারেচারের প্রতি অনুরাগ বলতে গেলে একেবারে সামান্য পরিমাণেই ছিল। আমাদের ভাষায় ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। তবে একথা সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সত্য যে ইউরোপীয় সাহিত্য ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। তাই ইউরোপীয় সাহিত্য পঠন-পাঠনের সঙ্গেও একটা ইংরেজিয়ানা জড়িয়েছিল। তখন কার্যকরণ মিলিয়ে চিন্তা করতে শিখিনি। পরে বুঝেছি ওটা হচ্ছে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া। ইংরেজরা পৃথিবীকে দেখার, বিচার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে দিয়ে গেছে তার বদলে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল। বাংলা সাহিত্যে পরিমাণে অল্প হলেও এ ধরনের দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন। বিদ্বৎসমাজটির বাইরে তাঁরা যে বিশেষ প্রভাব রাখতে পারেননি, তার কারণও ইংরেজ শাসন।

আমার কথায় ফিরে আসি। 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের প্রভাব আমার সমস্ত সত্তা গ্রাস করে ফেলে। নিবিষ্ট মনে পাঠ করলেই একটা মহাজাগতিক চেতনা আমাকে বন্ধনমুক্ত জগতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যতবারই পড়ি, প্রতিবারই মনে হয় এই প্রথম পড়লাম। প্রথম খণ্ডের পরে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে দেখলাম। দেখি ওই অংশের ওপর দাঁত ফোটানোর ক্ষমতা আমার নেই। অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পর্বত অভিযাত্রীদের হিমালয়ের উঁচু চূড়ায় চড়ার জন্য যে বাড়তি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, চিন্তাভাবনা করে দেখলাম আমার ভাণ্ডারে সে বস্তুর যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় খণ্ডে যে সুউচ্চ চিন্তা, সমুজ্জ্বল ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এবং দার্শনিক প্রত্যয় গোটা রচনাটিকে একটি ফ্রেমের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং সর্বোপরি গ্রিকপুরাণের যেসকল অচেনা অজস্র চরিত্রের ভীড়, সে গহন জঙ্গলের মধ্যদিয়ে পথ করে অগ্রসর হওয়া, তখন নয় এখনো আমার কাছে এটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। তাই দ্বিতীয় খণ্ড বাদ দিয়ে অন্যান্য রচনার প্রতি মনোনিবেশ করি। প্রথমে পড়লাম 'ভের্থর', 'ভিলহেম মাস্টার্স', 'ন্যাচারাল ডটরস ইলেকটিভ এ্যাফিনিটিস', 'হারমান অ্যান্ড ডরোথিয়া ক্লাভিগো', 'টাসসো', 'ইফিগেনিয়া', 'এগমন্ট', 'ইটালিয়ান জার্নি'। যেভাবে তরতর করে বইগুলোর নাম বলে যাচ্ছি, আসল ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম ঘটেনি। অনেক সময় অন্য কাজে কখনো মাস এমনকি বছর গড়িয়ে গেছে। এক ফাঁকে দেখি গ্যোতে আবার আমাকে পেয়ে বসেছেন। কখনো প্রণয়িনীদের কাছে লেখা চিঠি, কখনো আত্মজীবনী, কখনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কখনো ঝর্ণা ধারার মত উচ্ছিচ্ছ্র অজস্র গীতিকবিতা আমাকে এই মহাপুরুষের প্রতি নিবিষ্ট করে তুলেছে। প্রবাদোক্ত চুম্বক পাহাড় যেমন লোহার জাহাজকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, এই মনস্বী

পুরুষটিও, আমাকে সেরকমভাবে টানছিলেন। বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল, আর বেরিয়ে আসবও বা কেন? নানা বিষয়ে বাংলা লেখালেখি করার একটা অভ্যাস আমার গড়ে উঠেছিল। সামান্য পরিচিতিও ছিল। একজন নবীন লেখক হিসেবে যে সংশয়, সন্দেহ এবং মানস সমস্যার পীড়ন অনুভব করছিলাম, গ্যোতের রচনার মধ্যে তার অনেকগুলোর উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম। এভাবে তিনি যে কখন আমার চেতনায় সিংহাসন পেতে বসে গেছেন টেরও পাইনি। এটি একদিন দুদিনের ব্যাপার তো নয়ই, পনের-ষোল বছরের একটি প্রক্রিয়ার ফলাফল। ইংরেজ লেখক টমাস কার্লাইল গ্যোতের সমসাময়িককালে যে শ্রদ্ধা এবং যে অনুরক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তেমনি একটি অনুভূতি আমার মনের সমস্ত আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে যায়। আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র মানুষ। গ্যোতের সমস্ত রচনা পাঠ করাও অদ্যাবধি আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতি সাম্প্রতিক সময়ে জার্মান বর্ণমালার সঙ্গে আমার মাত্র পরিচয় ঘটেছে। এত সামান্য পুঁজি নিয়ে গ্যোতে চর্চার দুঃসাহস করা অনেক সময় আমার নিজের কাছেই নিতান্ত কাঙাল পথের ভিখিরির মত বড় লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতানোর মত একটা হাস্যকর প্রয়াস বলে মনে হয়।

নানা চড়াইউৎরাই উত্থানপতনের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে আমার জীবন। আমাদের দেশের ইতিহাসেও অনেকগুলো বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। কালের কুটিল গতি বারবার কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলেছে, আমার জীবন স্থিত থাকে কেমন করে? 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?' আমাদের দেশে নারকীয় পরিস্থিতি কখনো ওপার থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কখনো ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করেছে। শক্তিমানের দম্ভ, মূর্খের আস্ফালন, বলদর্পী বর্বরের অট্টহাস্য দেখে যখন মনে হয়েছে জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? এই ধরনের সঙ্কটের মুহূর্তগুলোতে গ্যোতের রচনা, রচনার শরীরে প্রবাহিত চিন্ময় জীবনপ্রবাহ আপন মেরুদণ্ডের ওপর স্থিতু হতে, মানুষের ওপর আস্থা অর্পণ করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। গ্যোতে জার্মানির প্রধান কবি একথা সত্য বটে, কিন্তু তাঁর আবেগের সততা, অনুভূতির দাহিকাশক্তি একজন স্বল্পজ্ঞান বাঙালি যুবকের চিত্তের সমস্ত জায়গা অধিকার করে নিয়েছিল, এটা একটুও অতিশয়োক্তি নয়। সত্য প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, মিষ্টি তেতো যাই হোক না কেন একমাত্র সত্যই মানুষকে সাহায্য করতে পারে। আর কিছু নয়, এই শিক্ষাটা আমার চেতনায় গেঁথে গেছে। গ্যোতেকে মানবজীবনের একটি ধ্রুব নক্ষত্র হিসেবে চিন্তা করতে আমার মন অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বুড়ো বয়সে মূল জার্মানে ফাউস্ট পড়ার জন্য জার্মান ভাষা শেখার বাসনা পোষণ করেছিলেন, এই জনশ্রুতি সত্য কিনা বলতে পারব না। যদি সত্য হয়ে থাকে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একজন বড় মানুষ সহজেই আরেকজন বড় মানুষের প্রতি প্রণত হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের যোগ্য কাজই করেছিলেন।

আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারি, কোন বিখ্যাত জার্মান লেখক টমাস মান নতুন করে 'ফাউস্ট' নাটকের আখ্যানভাগ অবলম্বন করে বিখ্যাত উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস' লিখেছিলেন। কেন সেই চমৎকার ছোট্ট গ্রন্থ 'লোটে ইন ভাইমার' রচনা

করেছিলেন। কোন্ অনুভব, কোন্ বোধ, কোন্ উপলব্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে আলবার্ট সোয়াইৎজার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইউনেস্কোর অনুরোধে সে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাগুলোতে গ্যোতের মহিমা গুণমান করেছিলেন। ইতালিয়ান নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদিতো ক্রোচে নন্দন তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্যোতের অনন্যতা নির্ণয় করেছিলেন। আমার বিশ্বাস গ্যোতে সত্যসন্ধ মানবমনের এক অনিঃশেষ প্রেরণা ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার কখনো রিক্ত হবে না।

গ্যোতের জীবন বা সাহিত্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণমূলক কোন কিছু উচ্চারণ করার ক্ষমতা বর্তমানে আমার নেই, ভবিষ্যতে কোনদিন জন্মাবে সে দুরাশাও পোষণ করিনে। মুগ্ধ বিস্মিত বালক যেমন পলকহীন নয়নে নানা রঙে ছোপানো আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আমারও তেমনি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বালকের ধৈর্যের পরিমাণ আছে, আছে দৃষ্টিশক্তির নির্দিষ্ট সীমারেখা, গ্রহ-নক্ষত্রখচিত ছায়াপথে বিস্তৃত আকাশ চিরদিন অসীমই থেকে যাবে। তাঁর সম্পর্কে দুয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে যে মনে ফণা মেলে না, একথা সত্যি নয়। কিন্তু চীনের প্রাচীরের মত একান্ত মানবিক প্রয়াসে নির্মিত এই আশ্চর্য জীবনসৌধের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে পবিত্র আতঙ্কের শীতল স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, বুদ্ধিবৃত্তি আপনিই নত হয়ে নম্র হয়ে পুষ্পের অঞ্জলির মত সেই বিশালের পদতলে লুটিয়ে পড়তে চায়।

আমার জীবনের দ্বাদশটি বছর আমি গ্যোতেকে নিয়ে কাটিয়েছি। কেউ কেউ মনে করেন চমৎকৃত 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ তার প্রত্যক্ষ ফসল। আমি কিন্তু বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকি। 'ফাউস্ট' নিয়ে কাটাতে গিয়ে গ্যোতের কবিত্ব কল্পনার ঢেউ ভাষার সীমানা অতিক্রম করে যতদূর আমার মনে অভিনব ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে, সেই বেজে ওঠাটুকু মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি মাত্র। গ্যোতের কাব্য অনুবাদ করেছি, কেউ একথা বললে আমার কানেই তা রীতিমত ধৃষ্টতার মত শোনায় এবং ভীষণ লজ্জা বোধ করতে থাকি।

কূলহীন, কিনারবিহীন সমুদ্রে যে নাবিকের যতটুকু যাতায়াত, ততটুকুর খবরা-খবর বলতে পারেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান মণীষীবৃন্দ গ্যোতে প্রতিভার আকর্ষণে তাড়িত হয়ে, তাতে সমগ্র মনোযোগ স্থাপন করেছেন, এরকম নানা প্রতিভার অবদানে গ্যোতেকে বুঝবার এবং উপলব্ধি করবার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে অতীতে এবং এখনো হচ্ছে। সে তুলনায় আমি কি? আমার অর্থহীনতা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এই মহান প্রতিভার আগুনের আঁচে যদি সামান্য পরিমাণও জ্বলে উঠতে পারি এবং এই জ্বলে ওঠার মধ্যদিয়ে গ্যোতেকে আমার দেশের মানুষ এবং আমার ভাষার মানুষের মনের মত করে কিঞ্চিত প্রকাশ করতে পারি— সেটুকুই হবে আমার সুন্দর সান্ত্বনা।

১৯৮৬

টি. ই. লরেন্স—বীরত্বের ওপর পর্যালোচনা

[ক্রিস্টোফার কডওয়েলকে বলা হয়ে থাকে বিশ শতকের এ্যারিস্টোটল। কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন রাজনীতি বিচিত্র বিষেয়েই তিনি লিখেছেন। তাঁর সমস্ত রচনায় সুগভীর ইতিহাস দৃষ্টি এবং শ্রেণীচেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য কীর্তির কথা বাদ দিলেও শুধু একটি গ্রন্থের জন্য সভ্যজগতে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতেন। সেটি মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্পকলা বিচারের ধ্রুপদ গ্রন্থ বলে এ পর্যন্ত বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির নাম "Illusion and Reality"। নিচে মুদ্রিত রচনাটি তাঁর 'Studies in a dying culture' গ্রন্থের টি. ই. লরেন্স অংশের বাংলা অনুবাদ। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে অনেককিছু করতে পারতেন, একথা বিশ্বাস করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু তিনি মাত্র তিরিশ বছরের পরমায়ু পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে স্পেনের সমরক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সেনানি হিসাবে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন।]

মহাযুদ্ধের চার বছরে বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলো তাদের বাস্তব বৈজ্ঞানিক এবং যাবতীয় আবেগী সম্পদ হিংসাত্মক কর্মে নিয়োগ করেছে। তা সত্ত্বেও এ তুলনারহিত যুদ্ধ কোন বুর্জোয়া কর্মবীর সৃষ্টি করতে পারেনি। এই মহাযুদ্ধের কোন নায়ক নেই। অন্যদিকে, শুরু থেকে লেনিনের নির্দেশনা পেয়েছে রুশ-বিপ্লব। তারপর থেকে শুধু রাশিয়াতে নয়, সমস্ত বুর্জোয়া জগতেও তাঁর নাম তাৎপর্যশীল আসন অধিকার করেছে। যেখানে সামাজিক আন্দোলন আলোড়ন জাগছে লেনিনের কর্ম এবং বাক্য তার অংশ বলেই গৃহীত হচ্ছে। এতকাল যা অবগুণ্ঠনের আড়াল ছিল প্রতিটি বছরে ক্রমশ স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেনিনের দিকেই আবর্তিত হচ্ছে। কালের গতিধারা থেকে বিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্ডেনবুর্গ লুডেনডফ, জফে, জেলিকো, ফ্রেন্স, হেইগ, ফোক, লয়েড জর্জ, ইউনসন এবং গ্রে প্রমুখের মূর্তি হাস্যকর এবং ক্ষুদ্র হিসেবে ধরা পড়ছে। বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ মানুষের মৃত্যু, কামানের পাহাড়, ট্যাঙ্ক এবং রণতরী এর সবকিছু একজন বীর সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারা এ পর্যন্ত যা সৃজন করেছে টি. ই. লরেন্সের করুণমূর্তি তার সেরা বলে বিবেচিত হতে পারে।

তা হোক, তবু যদি কোন সংস্কৃতি বীর সৃষ্টি করে থাকে তা কি নিশ্চিতভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি নয়? কারণ বীর হলেন একজন অসামান্য ব্যক্তি। আর ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিমূলেই বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। দানবীয় শক্তিসম্পন্ন একদল বীরের আবির্ভাবে বুর্জোয়া যুগের তোরণদ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তাঁরা হলেন এলিজাবেথীয় যুগের অভিযাত্রীবৃন্দ— ইতিহাসের অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে অধিক সংখ্যায় বেরিয়ে আসা নতুন বিশ্ব বিজয়ীর দল। বুর্জোয়া সমৃদ্ধি আমাদেরকে ক্রমওয়েল, মার্লবরো, লুথার, রানি এলিজাবেথ, ওয়াশিংটন, পিট, নেপোলিয়ন, গুসটেভাস, অ্যাডেলফাস এবং জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ বীরপুরুষ উপহার দিয়েছে। কেবল বীরপুরুষদের সংগ্রাম প্রতিবন্ধক এবং দুঃখ কষ্ট এগুলোই বুর্জোয়া ইতিহাস হিসেবে বুর্জোয়া স্কুলে পড়ানো হয়ে থাকে।

যাকে আমরা বলি, বীরত্ব কোন্ উপাদান নিয়ে তা গঠিত? তা কি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব? না। কারণ সহজ এবং বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষেরাও দেখি বীরে পরিণত হয়েছেন। তাহলে কি সাহস বলবো? সাহসের বলে মানুষ জানের ওপর ঝুঁকি নিয়ে মরণকে বরণ করার বেশি কিছু করতে পারে না। মহাযুদ্ধে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে। সাফল্যই কি বীরত্ব? যাতে একটি মাত্র উদ্দেশ্যের পূর্ণতাদাহের জন্য ঘটনাবলির সদ্ব্যবহার করা হয় এবং যার বাস্তবায়নের বেলায় বিচ্ছুরিত হয় এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি। জুলিয়াস সিজার এবং সে জাতীয় বীরশ্রেণীর মধ্যে সে জিনিসটিই দেখা যায় বলে তাঁরা ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন? এটিকে সত্যের বেশ কাছাকাছি বলা যেতে পারে। কিন্তু যে সকল বীরপুরুষ সফল হতে পারেন না, তাঁদের বিষয়ে এতে কিছু বলা হয়নি। যেমন লিওনিভাসের বীরত্ব উন্নততর হুনুর হেকমতের কাছে হার মেনেছে। লুডেন ডফ, রক ফেলার— যারা প্রচুর ঐশ্বর্য সাফল্য এবং ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী অথচ বীর নন, তাঁদের বিষয়েও বলা হয়নি কিছুই।

সুতরাং এটি অধিকতর সত্য বলে মনে হওয়াই সঙ্গত যে বীরত্ব এমন জিনিস, যা বীরের চরিত্রের উৎকর্ষ যাচাই করে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বীর সৃজন করে। টলস্টয় বীরের যে ধারণা দিয়েছেন, আমরা তা সমর্থন করিনে। তাঁর মতে বীরেরা হলেন সৌভাগ্যের স্রোতে অবগাহন করা ক্ষুদ্র মানুষের দল। কিন্তু সে মানুষটির মধ্যে তো বিশেষ কিছু থাকতেই হবে। শুধু তাই নয়, যে ঘটনাবলি বীর সৃষ্টি করে তাতে কিছু থাকা চাই। নিশ্চিতভাবে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পারঙ্গম এবং পরিস্থিতিকে নিজের সপক্ষে পোষ মানাতে পারার অধিকারী বলে বীরের যে সাধারণ ধারণা তা যেমন মিথ্যে, তেমনি তাঁরা সাগরের ঢেউয়ে ভেসে সৌভাগ্যের চূড়ায় চড়েছেন তাও মিথ্যে। অথবা এ দুটিতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির আংশিক বিকশিত— তাও ঠিক নয়।

যতদূর পর্যন্ত সচেতনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষ ততদূর স্বাধীন। যে কোন মুহূর্তে পরিবেশের কার্যকারণশীলতা এবং অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তটির মানসিক অবস্থা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো ক্রিয়াশীলতায় মানুষের চেতন এবং অচেতন স্নায়ুগুলো যুক্ত হয়— তা মানসিক অবস্থার অন্তর্গত।

কোন বিশেষ পরিবেশে অতীত নির্ধারিত এবং পূর্বপুরুষের সূত্রে প্রাপ্ত কতক সহজাত সাড়াদান ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে মানুষ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজাত সাড়াদান প্রবৃত্তি এবং পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার থেকেই সৃষ্টি হয় চেতনা। সুতরাং প্রবৃত্তি এবং পরিবেশের পারস্পরিক সংঘাতের ফলশ্রুতিই হল চেতনা এবং এই সংঘাতের ফলেই মনের বিকাশ ঘটে। যেহেতু সকল ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া রয়েছে— সংঘাতের মাধ্যমে সে পরিবেশে পরিবর্তন আনে এবং প্রতিটি পরিবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে সে নিজেকেও পরিবর্তিত করে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য মানুষও এ পরিবেশের আওতায় পড়ে।

একজন বীরপুরুষও মানুষ। প্রবৃত্তি এবং পরিবেশে অন্যান্য মানুষের বেলায় যেমন তার বেলাও তেমনি। কিন্তু তিনি পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেন বেশি এবং নিজে প্রভাবিত হন কম। সুতরাং আমাদের বলতে বাধা নেই, তিনি হলেন এমন ধরনের মানুষ, যিনি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তন করেন।

একজন মানুষ একটা মুরগিকে তখন ঠিকভাবে চিরতে পারেন, যখন গ্রন্থিগুলোর সংস্থান তিনি ভালোভাবে জানেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। একজন বীরও ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কারণ যে সকল নিয়মের কার্যকারিতার ঘটনা ঘটে— নিবিষ্টতাসহকারে সে সকল তিনি অধিগত করেন। দক্ষভাবে মুরগি চিরতে সক্ষম ব্যক্তির সঙ্গে টলস্টয়ের বীরের ধারণার মিল রয়েছে। আসলে তাঁরা উভয়েই মানুষ হিসেবে পরিস্থিতির আজ্ঞাবহ। সঠিকভাবে মুরগি চেরার একটা পন্থা রয়েছে। সুতরাং যে লোক দক্ষতাসহকারে মুরগি চিরতে পারেন তাঁকেও চাকরের মত অস্থিবিদ্যা শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু চেরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেল। এও যদি হয়, তাহলে একে জটিলতা মুক্ত এবং সরল বলে প্রতিভাত হবে। কিন্তু মানুষের জীবনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ারও একটা কারণ রয়েছে। কেন সে মুরগি চিরতে চাইবে আর বীরপুরুষও বা পৃথিবীকে কাঁপাতে যাবে কেন?

এখানে আমরা বীরত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বীর পৃথিবী পরিবর্তন করেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি কি করছেন সে বিষয়ে যেন সচেতন নন বলেই মনে হয়। সচেতনভাবে সিজার কখনো সম্রাট হতে চাননি এবং আলেকজান্ডার হেলেনীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়ার বাসনা পোষণ করেননি। তা হোক, তবু তাঁরা তো কিছু চেয়েছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রবাহ তারই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রভাবিত করেছেন। বীরপুরুষ যেন আন্তর প্রেরণা বা অন্ধ স্বজ্ঞার বশীভূত হয়েই কাজ করেন। বিশেষ করে তাঁদের একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক যে তাঁরা মানুষ এবং জগতের ওপর সমান প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন, যা অনেক মহাপুরুষের নাগালের বাইরে থেকে যায়। তাঁদের অনেকের বীরত্বের নির্যাস শুকিয়ে যায় এবং তারা হয়ত নবী কিংবা ধর্মীয় শিক্ষাদাতাতে পরিণত হন। তাঁরা মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আবার হয়ে যেতে পারেন বৈজ্ঞানিক যদি ইচ্ছা করেন, কিভাবে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় শেখাতে পারেন মানুষকে। কিন্তু

কিভাবে ইচ্ছা করতে হবে সেটি শেখাতে পারেন না। বীর যিনি তিনি ভূগোল, সমরবিদ্যা, রাজনীতি, নগর জনপদ এবং নতুন কলাকৌশল যা তার কাছে প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে জানেন; তদুপরি, মানুষকেও তিনি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এসব তাঁর কাছে কেন প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। তবে মনে হয় অন্তরে অন্তরে তিনি জানেন ভবিষ্যতে কোন্ কাজটি তাঁকে করতে হবে। সিজারের পূর্বপুরুষের দেবী ভেনাসের মত কেউ যেন তাঁর সঙ্গে মানুষ এবং ঘটনার সম্পর্কের দিকে অবিচলভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। এই যে ধারণা এর উৎস কি? আর এর অর্থও কি হতে পারে? বীরপুরুষ শেষ পর্যন্ত যা করতে চান বাস্তবে তিনি তাই-ই করেন। জুলিয়াস সিজারের মত তিনি মনে মনে হতে পারেন অভিযাত্রী। কিন্তু বীরত্বের প্রতি ঝোঁক তাকে নিশ্চিত করে যে নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তিনি একটা সভ্যতার জন্ম দিচ্ছেন। প্রায়ই স্বর্গীয় মহিমায় তাঁর নামে আলোকচ্ছটা বিকীরণ করে। ক্লেশকর পরার্থপরতার কথা বেমালুম ভুলে যান। যদি কেউ মনে রাখে, মনে রাখে তাঁকে অভিযোগ করা এবং অভিসম্পাত দানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বীরত্বের এই গুণটি বীরের উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ। এর একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কিছুর নিরিখে তাকে যাচাই করতেই হবে।

সামাজিক তাৎপর্যের নিরিখেই তাঁদের কর্মের যাচাই হয়। সামাজিক কর্মের গতিশীলতাই বীরের মনে আশা আকাঙ্ক্ষা সৃজন করে এবং তাঁরা যে শক্তি প্রদর্শন করেন একই গতিশীলতাই তার প্রসূতি। অনেক সময় দেখা যায় আকাশের গ্রহ নক্ষত্র আপনাপন গতিপথে চলবার কালে তাঁদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছে।

সমস্ত সমস্যা, সমস্ত যুদ্ধ, রাষ্ট্রের সমস্ত জয় পরাজয় সামাজিক সম্বন্ধের সমস্ত পরিবর্তন যার মধ্যে বীর তাঁর চেহারা প্রমূর্ত করেন, পরিবর্তিত সমাজ সত্তা চাপে পূর্বতন সুগঠিত চেতনা বিন্যাসের ভগ্ন ভিত্তিরই ইঙ্গিত বহন করে। সমাজ সত্তার যদি কোন পরিবর্তন না হত তাহলে অন্তরালবর্তী সমাজে বাস্তবের যে প্রতীকগুলো আছে (বাক্য, চিন্তা, ধারণা, চিত্রকল্প, উপাসনা, মন্দির এবং আইন) চিরকাল অনড় স্থির থাকত এবং পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হত। সময় ফুরিয়ে যায় কথাটা একই ধরনের অর্থবাহী। সোজা কথায় এক বলয়ের অন্তরালবর্তী ঘটনা প্রবাহের বিভিন্নতার নামই যেন সময়। যেমন ক, খ ঘটনার কারণ এবং খ গ এর কারণ। এ ভাবেই চলতে থাকে। হয়ে উঠাই হল বাস্তবের নিহিত সারাৎসার সত্য। সব সময়ে তা ওপরের নির্মোক বিদীর্ণ করেছে ধীরে ধীরে নয়, সাপের খোলাসের মত ঋতুতে ঋতুতে। ঘটনার চাপ ঘনীভূত হতে থাকে, যখন পর্যন্ত না কোন সঙ্কটকালে সমস্ত খোলসটাই বদলে যায়। এভাবেই সমাজের অধিকাঠামোর পুনঃ রূপায়ন ঘটে। এরকম সময়ে কর্ম এবং চিন্তার মধ্যে লাগে সংঘাত। যেহেতু কাজ থেকেই চিন্তার উৎপত্তি—তাই সঠিক চিন্তা আসার পূর্বশর্ত হিসেবে সঠিক কাজটি করা চাই। সামাজিক চেতনা সমাজ সত্তার দর্পণে বিম্বিত চিত্রকল্প নয়। যদি তাই হত তাহলে অর্থহীন উদ্ভট তত্ত্বে রূপ নিত। সমাজ সত্তা বাস্তব পদার্থ জড়তা এবং গতির অধিকারী এবং তা শব্দ প্রক্রিয়া,

উপাসনালয়, বিচার পদ্ধতি এবং পুলিশ এ সমস্ত বাস্তবের সমন্বয়েই গঠিত। পরোক্ষ সমাজ সত্তা যদি দর্পণে বিম্বিত চিত্রকল্প হত, তাহলে কোন শক্তি খরচ না করেই বিম্বিত ছবিটি বদলে দেয়া যেত। কিন্তু এ তার চাইতে অনেক বেশি। এ হল ক্রিয়াশীল অধিকাঠামো মূল কাঠামোর সঙ্গে যার নিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলছে এবং পরিবর্তন করছে। তাই জীবন বস্তু থেকে উদ্ভূত হয় এবং বস্তুতেই পরিবর্তন ঘটায়। ভাষার সহজতম ব্যবহারের মধ্যেই এ প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাক্য সামাজিক— সমাজের বর্তমান চেতনা বিন্যাসের সঙ্কেতবাহী। যখন আমরা কথা বলতে চাই তখন নতুন কিছু বলতে চাই যার জন্ম আমাদের সত্তার গভীরে, উঠে এসেছে জীবনের অভিজ্ঞতার তলদেশ থেকে। সুতরাং আমরা শব্দকে রূপক অথবা বাক্য হিসেবে এমনভাবে ব্যবহার করতে চাই, যাতে নতুন শব্দে আমাদের অভিজ্ঞতার কিছু ছোঁয়া অন্তত লাগে। ব্যাপক হারে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে জন্ম দেয় বিপ্লবের। যখন মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমাজ বাস্তবের চেতনার বিন্যাস যেমন সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আইনের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তখন তারা এখনো অবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এসব নতুনভাবে গড়ে নিতে চায়। শব্দের যেমন, তেমনি সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরও জড়তা রয়েছে। কারণ নতুন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং যে সকল মানুষ নতুনকে বদলে পুরানকে আঁকড়ে ধরে তারা অন্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই পদ্ধতিটা সহিংস এবং সহজ।

সমাজের মত মানুষও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চেতনার বিন্যাস এবং সবল দেহাবয়বের সমন্বয়ে গঠিত। সে শরীর এবং মনের অধিকারী, রয়েছে তার প্রবৃত্তি এবং চেতনা। এই দুই বিপরীত ধর্মী মেরু পরস্পরকে প্রভাবিত করছে। সাংস্কৃতিক যে ছককাটা নকশার মধ্যে তার জন্ম, ভাঙবার সাধ্য নেই। সুতরাং তা অর্ধেক স্থির এবং অনড়। বাকি অর্ধাংশ প্রবাহমান নতুন এবং বিদ্রোহী-প্রবৃত্তি মূলের বাস্তবতার স্তন্যরসে সংবর্দ্ধিত। ব্যক্তিসত্তা এবং চিন্তার মধ্যবর্তী সংঘাত তার মর্মের গভীরে গিয়ে বাজে। এ হল নতুন ব্যক্তিসত্তা এবং পুরোনো চিন্তার দ্বন্দ্ব। এ এমন ধরনের সংঘাত যা পারস্পরিক সংশ্লেষণে উন্নীত নয় আনকোরা নতুন চিন্তার স্তরে। সে অনুভব করে তার প্রবৃত্তির গভীরতম স্তর এবং সত্তার অত্যন্ত মূল্যবান একাংশ চেতনার বলয় থেকে হেঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল, যেন অসম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ তাকে টানছে, তার মনে হবে, অতীত যেন তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে। তাই অনেক সময় আমরা এ ধাঁধাঁর সম্মুখীন হই যে বীরপুরুষ অতীতের নামে আবেদন করেন এবং অতীতকে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্দীপিত করেন তাই করতে গিয়ে তাঁরা ভবিষ্যতকে সৃজন করেন। তাই প্রাচীন যুগে ফেরার দাবি বুর্জোয়া রেনেসাঁস যুগে অত সবল ছিল। রোম, নেপোলিয়ন এবং বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছে। অপাপবিদ্ধ প্রাকৃতিক মানুষের জগতে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নই ছিল অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবীদের আদর্শ। কিন্তু মানুষ তো সে সময়ে মনে প্রাণে নতুনের রোমাঞ্চিত পরশই অনুভব করেছিল। উহ্যভাবে, সংগোপনে মানুষের চেতনার প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করে। নতুন থাকে অদৃশ্য অবস্থায়। এখনো একটা

শক্তি, একটা সংঘাত মাত্র। যে নতুন বাস্তবের ইশারাতেই এ সংঘাত জেগেছে অনুরূপ বাস্তব সৃজনে সক্ষম। তবে এখনো একটা অদেহী শক্তির চাইতে বিশেষ কিছু নয়। কর্মের উদাত্ত আহবান যখন বীর শুনেন, তিনি তখন তা ভবিষ্যতের রঙে রাঙাতে পারেন না যেমন তেমনি পচা অতীতের অঙ্গাবরণেও ঢাকতে চান না, সমাজ এবং মনের সুশৃঙ্খল যে স্তর, তাও এ ধ্বনির জন্ম দেয়নি। কিন্তু চাপের কারণে উভয়ের গভীরতা থেকে এর উৎপত্তি। তাই মনে হয় বীরের অন্তর থেকেই উঠে এসেছে এ আহবান। একে তিনি ব্যক্তি সত্তালোপী উচ্চকাঙ্ক্ষা বলে ব্যাখ্যা করেন একদিকে (এক হিসেবে তা ঠিক অন্যদিকে ব্যাখ্যা করেন খোদাতালার নির্দেশ হিসেবে। অন্য অর্থে খোদাকে সব সময়ে অচেতন সম্পর্কের প্রতীক বলে ধরা হয়)। মরমী শিল্পীরাও একই ধরনের শক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। কিন্তু বীরের মত তাঁদের অনুভূতি অত তীক্ষ্ণ এবং প্রখর নয়। তাঁর কাছে এ হল্ল অজানা জিনিষকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দেয়ার অমোঘ নির্দেশ বিশেষ। তাঁকে তার জন্য বাস্তব বাধা চূর্ণ করতে হয় অথবা নতুনকে ধারণ করার মত নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে হয়। তিনি মনে করেন অতীতকে রক্ষা এবং অতীতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে তাঁর জন্ম। কিন্তু দেখা যায় তিনি নিয়ে এসেছেন ভবিষ্যতকে। আদি খ্রিস্টধর্ম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে সংস্কারকেরা বুর্জোয়া প্রটেস্টান্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। অভিযাত্রীরা সেনেট ধ্বংস করতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন।

যেহেতু বীর পুরুষের সঙ্গে মুখ্যত সম্বন্ধ কর্মের, তাই তাঁর যুক্তি অমার্জিত। কেননা তাঁর সম্পর্ক কর্মের সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে নয়। তাঁর আদর্শও অমার্জিত। তাঁর লক্ষ স্বার্থকেন্দ্রিক-ব্যক্তিক কিংবা সংকীর্ণও হতে পারে। এখানে আমরা সেসব আলোচনা করছিনে। তাঁর কর্মের দিকে তাকান। যে শক্তি তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাঁর মধ্যেও একই শক্তি বিকশিত হচ্ছে এবং তার বলেই তিনি জয়লাভ করেন। যুক্তি বিমুখতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুগের আলোকিত এবং মনন সমৃদ্ধ মতবাদকে ছাড়িয়ে আসতে পারেন। অন্যেরা জ্ঞানী এবং দূরদর্শী হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কথা বলেন বর্তমানের ভাষায়। অতীতের চেতনা বিন্যাসের মধ্যে আটকা পড়েছে তাঁদের সত্তা। কিন্তু বীর যেন কোন পরিচিত ভাষার কথা বলেন না। তাঁর ভাষার মধ্যে বাল্যস্মৃতি এবং অর্ধমৃত ধারণার মিশেল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি কর্মে এমন একটি দর্শনকে রূপ দেন যা তাঁকে তাঁর বিদ্বান প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে ভিন্নতর প্রমাণিত করে। সিসেরোকে সিজারের কাছে যেতে হয়, তার কারণ সিজার সব সময় আগামীকালের কথা বলেন। আলেকজান্ডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জ্ঞান এবং বুদ্ধি নিয়ে যখন একচ্ছত্র হেলেনিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন, সে সময়ে এ্যারিস্টোটল এক শ' আটান্নটি বিস্মৃত রাজ্যের গঠনতন্ত্রের গবেষণা করিয়ে তাঁর ছাত্রের শুধু শুধু সময় নষ্ট করেছিলেন। বীরের ভাষা হতে পারে জড়ানো এবং স্ববিরোধী, কিন্তু শ্রোতার কখনো বুঝতে বেগ পেতে হয় না, আসলে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। তারাও

বাস্তবের অন্তর থেকে কর্মের সে চিত্তহারী সংগীত শুনতে পায়। তাদের মনে সংঘাত সংক্রমণ করে ফেলে। তার জন্য প্রয়োজন হলে বিস্মৃত চেতনা এতকাল প্রতিজ্ঞা থেকে সে, স্বভাবসিদ্ধ যুক্তিরেখা টানা হয়েছে, এ ধ্বনি থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা তার নেই।

তারা কিন্তু বিশ্বাস করে তাদেরই যুক্তি এবং চিন্তার ভাষা তাদের হৃদয় এবং প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করেছে। তারা বিশ্বাস করে সোনালি অতীত পুনরাবিষ্কারের জন্য জীর্ণ বর্তমানকে পরিহার করছে। আসলে ইতিহাস যা সব সময় প্রমাণ করে, চেতনার সঙ্গে সংশ্লেষ সাধনের জন্য তারা বর্তমান চেতনাকে সরিয়ে দিচ্ছে। সোনালি অতীতের নয় সোনালি ভবিষ্যতেই ঘটছে তাঁদের উত্তরণ। নেতা তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং বীর ও বিপ্লবীরা সব সময়ে এই সাংকেতিক ভাষাতেই কথা বলেন, যা তাঁরা শিক্ষা করেন একই উৎস থেকে। বীর উগ্র আবেগে কথা বলতে পারেন অথবা নিশ্চুপ থাকতে পারেন— হাস্যাস্পদ হতে পারেন, এমনকি বিরোধীতারও সম্মুখীন হতে পারেন তাঁর শ্রোতারা জানেন তিনি যা চান কেবল কথায় তা বলা যাবে না— একমাত্র কর্মের মাধ্যমই তার বাস্তবায়ন সম্ভব। মানুষের ওপর বীরের যে অপ্রতিহত প্রভাব এখানেই নিহিত রয়েছে। তা নতুন বাস্তবের সংস্পর্শ লাভ করে এবং সে উদ্দেশ্যেই এর জন্ম। সচেতন চেতনার প্রকরণ থেকে বিযুক্ত অবস্থায় একে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে হয়। একে বীরভাগ্য অনুপ্রেরণা অথবা দেবীর আদেশ বলে ব্যাখ্যা করেন। দেখা যায় যখন তিনি পরিপূর্ণ অন্ধভাবে এর আদেশ মেনে চলেছেন, তখনই তাঁকে সফল বলে প্রতিভাত হয়। সেই জিনিসটিকে আমরা বলে থাকি স্বজ্ঞা বা ইনটুইশন। একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বীর ক্রমওয়েল ফরাসি রাষ্ট্রদূত বেলিভয়ের কাছে একটি প্রত্যাদেশের মতো বাক্যে তা প্রাঞ্জল করেছেন—

"যে তার গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ নয় তার মত উর্ধ্বে কেউ আরোহণ করেনি।"

আলেকজান্ডার থেকে নেপোলিয়ন পর্যন্ত সমস্ত বীরপুরুষই এ বাণীকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য করে তুলেছেন।

কিন্তু সমকালীন চেতনার বাইরে এই শক্তির যে উৎস তার বিপদ রয়েছে। শক্তি আপন লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ নয়— তাই নিষ্ফল বিস্ফোরণে তার ক্ষয় হতে পারে। এমনও সময় আসে যখন সব মানুষ অস্পষ্ট এবং আবছাভাবে সামাজিক সংঘাত অনুভব করেন এবং তা প্রকাশের জন্য আকুলি বিকুলি করেন। এ অবস্থায় তারা যে কোন বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তির শিকারে পরিণত হতে পারে, সেও রহস্যময় ভাষার পরিবর্তনের আবেদন জানায়। শক্তি সঠিক পথে প্রবাহিত হলে পর্বতকেও সরাতে পারে। এখানে কিন্তু সে বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তিও তাদেরই মত অন্ধ। বাক্যনবাব এবং সত্যিকার বীরের তফাৎ এইখানে। বাক্যবাগীশ ব্যক্তির মানুষের ওপর প্রভাব রয়েছে, কিন্তু বাস্তবকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পরিস্থিতির মুরগির গ্রন্থিসংস্থানের জ্ঞান তার নেই। সে মানুষকে পরিত্যক্ত পথে এক অন্ধগলির দিকে চালনা করে।

এই রকম সময়ে যে শক্তির স্ফূরিত হয়, তাতে অবশ্যই গতিশীলতা থাকা চাই বস্তুপুঞ্জ ভাঙছে, চুরছে— তার যাত্রা হয়ত সামনে নয়ত পেছনে। যৌবনের সমস্যার সমাধানে অক্ষম স্নায়ুবিক রোগি শৈশব সমাধানেই ফিরে যায়। তেমনি সঙ্কটকালে সভ্যতাও, আমরা যেমন বলেছি, পূর্বতন সমৃদ্ধ স্বৈরতান্ত্রিক সামন্ত স্বর্ণযুগের সমাধানে ফিরে যায়। অতীত আর ফিরে না। বর্তমান মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় সব জিনিস যেমন ছিল আবার সে রকমটি হবে না। সমাজের স্তর অনেক বদলে গেছে তাতে এতদূর সূক্ষ্মতা এসেছে যে পূর্বের আকার নেয়া আর কিছুতে সম্ভব নয়। স্নায়ুবিকৃত রোগির মত সামাজিক পশ্চাদগতিও কোন সমাধান নয়।

একই সময়ে যেমন আসেন বীর তেমনি আসে প্রতারক বাক্যবাগীশ। বাইরে থেকে দেখতে গেলে দুজনকে একই রকম মনে হবে। দুজনের আবির্ভাবের কারণ একই শক্তি। অথচ তার ভূমিকা বিপরীতমুখী। সে আসে সুলার বেশে, কেরেনস্কির, বেশে, আসে হিটলার এবং মুসোলিনীর বেশে। লেনিন যে উৎস থেকে শক্তি আহরণ করেছেন, একই উৎস হিটলারকেও শক্তি যুগিয়েছে। তা হল গিয়ে ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্বন্ধ এবং বর্দ্ধিত উৎপাদন শক্তির মধ্যবর্তী সংঘাত। বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিহাস হিসেবে এই সব বাক্যবাগীশকে পয়লা মনে হবে সংরক্ষণ এবং নির্মিতির দেবতা। ধ্বংসকারী বলে মনে হবে বীরকে। একমাত্র পরবর্তীকালেই দেখা যায় তাদের ভূমিকা বিপরীতমুখী। বাক্যবাগীশ সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ অবশ করে দিয়ে সমাজকে পেছনে ফেরানোর অপচেষ্টায় মানবশক্তির বৃথা অপচয় করে। কিন্তু একই শক্তি দিয়ে বীর পুরান প্রেক্ষাপট ভেঙ্গে তৈরি করেন নতুন প্রেক্ষাপট।

শুধুমাত্র মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের নিরিখে বীরপুরুষ যাচাই করা যায় না। বহির্বাস্তব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়ে যাচাই করতে হয় বীরপুরুষকে। নতুন বাস্তবের প্রতি তাঁর স্বজ্ঞা বা অন্তর প্রেরণা সংঘাত সীমানার ওপার পর্যন্ত প্রসারিত। তার বলে তাঁরা জানতে পারেন— যদিও সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরিভাবে নয় কোন্‌পথে সংঘাতকে মুক্তি দিতে হবে। এইভাবে প্রেরিত পুরুষের মত তারা ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হন এবং ইতিহাসের রায় অনুযায়ী কাজ করেন। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রীতিকরভাবে তাদের হাত দিয়ে ইতিহাস রূপায়িত হয়। অপরপক্ষে বাক্য-বাগীশেরা যা তৈরি করতে চায় কালের জল সব ধুয়ে নিয়ে যায়। কাজ শেষ করার আগে বীরের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আমরা যথার্থ বলতে পারি তাঁর শিক্ষা বেঁচে থাকে। যে লক্ষ্যের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন তাই তাঁকে স্থায়ীত্ব দেয়। ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্তমান কি কোন কিছুকে স্থায়ীত্ব দিতে পারে? এই সেই পৃথিবী তিনি যার মধ্যে বাস করেছিলেন, আমরা বর্তমানে যাঁরা বাস করছি তাঁকে সমান নাগরিকের মর্যাদায় সম্ভাষণ করি। অপর পক্ষে একজন উপনিবেশবাদী স্বদেশে স্বল্পস্থায়ী কালেই মাত্র প্রশংসিত হয়।

বীরেরা সকলে সম্ভবত এক ধরনের প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিস্থিতি তাদেরকে করে তোলে বীর। বুর্জুয়া লরেন্সের চরিত্র বীরসুলভ সকল গুণে ভূষিত ছিল, কর্মের ধ্বনিও তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু অবস্থার ফেরে তিনি সাড়া সঞ্চার

করতে পারেননি। তিনি ছিলেন অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রখর উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দুর্লভ বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীর অধিকারী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চরিত্রে এক ধরনের আশ্চর্য অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। বীরের এই অস্থিরতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ যেন শুরু থেকেই তাঁর মনে নতুন সামাজিক সম্বন্ধের সংঘাত ধ্বনিত হয়েছে। এ সময়ে কিন্তু তাঁর প্রবৃত্তির সামনেকোন লক্ষ্য ছিল না। অন্যান্য বীরদের বেলায় যেমন তেমনি রমণীর সতীত্বে লরেন্সের বিশেষ প্রবৃত্তিটি অবগাহণ করেছিল। শুধু নৃতত্ত্বের যান্ত্রিক আকর্ষণ নয় আরো বড় কিছুর আকর্ষণ যা প্রাচীন জগতে ছিল ভাস্বরিত যা বর্তমানের দৈন্যদশার নিচে চাপা পড়ে রয়েছে, তারই অমোঘ আকর্ষণে প্রাচীন প্রাচীর দুর্গম মরুভূমিতে পর্যটকের বেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

যে অতৃপ্তি তাঁর মধ্যে এ অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে যে ক্ষুদ্রতা জীবনে নেমে এসেছে তার ফলে তিনি সহজ সামাজিক সম্বন্ধ কামনা করতেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরে এই কারণ বীজই ব্যাখ্যা যুগিয়েছে। এক ধরনের ভবঘুরে পণ্ডিতের মত তিনি যৌবনে প্রাচ্যের সমস্ত শ্রেণী এবং অবস্থার প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করেছেন। বেদুঈনদের স্বাধীন এবং দিলখোলা ব্যবহারে অনেকাংশে তার অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা এবং মূল্যচেতনাকে তারা চরিত্রের সঙ্গে এক করে মিশিয়ে দেখতে অভ্যস্ত এবং তাঁর জাগল নেতৃত্বের খেয়াল। তিনি যেন একটি পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন, যেখানে সমস্ত মূল্য চেতনার মান নগদ মূল্যে যাচাই করা হয়। বুর্জোয়া উপহারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতের জন্য যে ডাক তিনি দিলেন তাতে সাঙ্কেতিকভাবে ওডেসি মহাকাব্যের কষ্টকর সবল মহিমার আভা-ই যেন বিকশিত হয়েছে। তিনি অনুভব করলেন এখনো সে মহিমামাখা সুদিনের সবটুকু হারিয়ে যায়নি। পৃথিবীর এককোণে আরবের মরুভূমিতে জীবনের মহিমা এখনো সজীব, এখনো সেখানে ধনপতির কলঙ্কিত লোভের থাবা প্রসারিত হয়নি। যে অতৃপ্তির টানে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন, মরুভূমির সংস্কৃতিতে তা মিটবে না বুঝতে পেরেছিলেন একথা সত্য বটে। তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখেননি যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর বুকের তলায় বাসা বেঁধেছে কোন্ রঙে তা রাঙাতে হবে। সত্যি সত্যি কি তিনি অতীতচারী ছিলেন? নিজে ব্যাখ্যা করলেন ভিন্নভাবে। তারা ছিল আরব— তিনি ইউরোপীয়ান। তারা সরল— তিনি অধিক শিক্ষিত এবং সুমার্জিত।

তারপরে যুদ্ধ এল। সে সঙ্গে এ লোকগুলোকে স্বাধীনতা দানের সুযোগ এল। তিনি স্বাধীনতাকে এত দামি মনে করতেন, তাঁর সমস্ত কামনা তাতেই যেন ভরে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা দিতে পারলেন না। বীর পুরুষেরা যে বাস্তবকে পরিবর্তন করেন, লরেন্সের পাঞ্জা থেকে সে বাস্তব ফসকে গেল। অক্সফোর্ডে পড়ার সময়ে বুর্জোয়া চেতনার নিরিখে তিনি স্বাধীনতা শব্দটিকে অধিগত করেছিলেন। তার সঙ্গে বেদুঈনদের স্বাধীনতার যে ধারণা আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিলেন, মিশিয়ে নিয়েছিলেন। এ স্বাধীনতাকে ছাত্রজীবনে প্রাপ্ত ধারণার পরিব্যাপ্ত রূপ বলে তিনি ধরে

নিয়েছিলেন। এই দু'স্বাধীনতা এক কিনা কখনো প্রশ্ন করেননি। যদি হয় এক তাহলে বুর্জোয়া স্বাধীনতার স্বরূপই যে কি তিনি জানতে চাননি। তিনি স্বাধীনতারূপ কামধেণু তাদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন। তাই ছিল তাঁর কাছে যথেষ্ট। সেই পরিচ্ছন্ন এবং অনড় সুপ্রাচীন ধারণার ভিত্তিতে তিনি কাজ করতে পেরেছিলেন।

এক সময়ে তিনি মানুষ এবং ঘটনার ওপরে কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন কেননা তিনি ছিলেন স্বাধীন এবং বেদুঈনেরাও ছিল স্বাধীন— টাকা সম্পর্কহীন খোলামেলা, সমানে সমানে সম্পর্ক ভালবাসতেন। তাঁদের যে অকপটতা তা ছিল অতীতের এবং তাঁর অকপটতা ছিল ভবিষ্যতমুখী। তিনি তা জানতেন না এবং আরবের মরুভূমিতে তা জানার উপায়ও ছিল না। তিনিও বিনীতভাবে তাঁর নিজের আদর্শকে তাদের মত করে বাঁকিয়ে নিলেন। তাঁর অকপটতা ভবিষ্যতের কোন প্রেরণা পায়নি এবং আরব পোষাকের মধ্যে আটকা পড়েছে। অসভ্য বর্বরোচিত এ চেতনা যাদের নুন, রুটি খেয়েছে একমাত্র তাদের প্রতিই ক্ষমাশীল। তিনি স্বাধীনতার আদর্শকে অসভ্য অজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন এবং বাকি সকল মানুষকে অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে নিলেন। এতে যে কিছু ভাল এবং মঙ্গল নেই তা নয়। এও মানবিক এবং স্বাধীন। সীমাবদ্ধতার কারণে প্লেটো এবং জেনোফোনের চিন্তায় লালিত বুর্জোয়া বীরের পক্ষে এ নিঃসন্দেহে আযোগ্য কর্ম। যে বীর তাঁর অন্তরে বুর্জোয়াতন্ত্রের অসারতা অনুভব করেছেন এবং একটি নতুন পৃথিবী গড়ার আহবান শুনেছেন তাঁর পক্ষে আরো অযোগ্য কাজ। তিনি হতে চেয়েছিলেন ন্যায়বান, বন্ধুভাবাপন্ন সাহসী। জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, আড়ম্বরকে ঘৃণা করে কর্মে মানুষের অন্তরের রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। যে সমস্ত মূল্যচেতনা বুর্জোয়া জগতে হারিয়ে গেছে এবং একমাত্র বেদুঈনদের মধ্যে আংশিকভাবে আদিম পন্থায় রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল তাই হল কমিউনিস্টের সম্মানের আসল বস্তু। কিন্তু তিনি নিজেকে আরবের মরুভূমির ধাঁচে গড়তে গিয়ে মূল্য চেতনাগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছেন। কেননা তিনি বুর্জোয়া ইউরোপের সমস্ত দর্শন এবং শিল্পকলার স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নির্মমভাবে হত্যা এবং লুণ্ঠন করেছেন এবং তাকে একজন আরব নেতার সংকীর্ণ আকাঙ্ক্ষার মত তাঁর ইচ্ছার সংঙ্কোচন সাধন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এত রক্তপাত, এত পণ্ডশ্রম অপচয়িত সুযোগের বৃথা সংঘাত তাঁকে তিরস্কার করেছে।

তিনি বীরের চরিত্রলক্ষণ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কেন? এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ঘটনা এবং মানুষের প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কি কারণে? কারণ তিনি অন্তর-প্রেরণার বলে জানতেন, ধনতান্ত্রিক সম্বন্ধ কত শুষ্ক, কঠিন এবং জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বুর্জোয়াতন্ত্রের বসন্তকালে এই সামাজিক সম্বন্ধ এত বর্ধিষ্ণু এবং মধুর মনে হয়েছিল যে অভিযাত্রীরা কোন সাহায্য ছাড়াই একেকটা নতুন জগত জয় করার বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু এখন বুর্জোয়ার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাত ধরে গেছে। আরবে ফ্ল্যান্ডাসের রণাঙ্গনে বুর্জোয়া সমরযন্ত্র অতিকায় জন্তুর কঙ্কালের মত অকেজো

হয়ে পড়েছিল। একটি সামন্ত সমাজের তাই দিয়ে চলত। লরেন্স প্রথম এটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তার অন্তর প্রেরণার জ্ঞান দিয়ে তিনি বুর্জোয়া সমর যন্ত্রের দুর্বল দিক ঝাপসা সংগঠন, কার্যকারিতাহীনতা এবং রসদের ওপর নির্ভরশীলতার ওপর আঘাত হেনেছিলেন। তদুপরি, যেহেতু তিনি বুর্জোয়া মূল্যবোধকে ঘৃণা করতেন তিনি আরবের মরুভূমির মানুষদের বাঁকাতে পেরেছিলেন। এমনকি সবচেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেছেন। যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যাদের কাছে বুর্জোয়া সমাজের মত টাকাই সব নয়, তাদেরকে উৎকোচের বশীভূত করেছিলেন।

লরেন্স আরবকে স্বাধীন করেছেন। কিন্তু তিনি কি জন্য স্বাধীন করেছেন? যে সমাজকাঠামো অতীতের এবং যা ক্ষয়িষ্ণু স্বৈরতন্ত্রের অধীন সে সমাজ কি করতে পারে? কেউ যদি কোন দেশকে স্বাধীনতা দেয় বুর্জোয়াদের ধারণা মত এবং তাতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, বুর্জোয়া সামাজিক সম্বন্ধ ছাড়া সেখানে আর কি আসতে পারে?

লরেন্স যে আরবদের মুক্ত করেছেন তাঁরা দু' পরিণতির শিকার হয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে দু' হলেও মূলত এক। কেউ কেউ ফরাসি সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত হয়েছে। অন্যদেরকে ব্রিটিশের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের আপন রক্তের এক একজন রাজা বানাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইরাককে সরকার, পুলিশ, তেলের সুবিধা এবং অন্যান্য বুর্জোয়া আনুষঙ্গিকসহ একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে।

লরেন্স অনুভব করেছিলেন, তিনি এবং ব্রিটিশ সরকার আরবদের প্রতারিত করেছেন। তিনি কিন্তু কখনো পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হননি যে তাঁর দ্বারা তারা সকলে কি মর্মান্তিকভাবেই না প্রতারিত হয়েছে। যে অন্যায় অত্যাচার থেকে তিনি পলায়ন করেছিলেন, আরবদেশেই সে সমস্ত নিয়ে এলেন। আরবদেশে এল টাকা, ব্যবসা। তারা শিখল চাকুরি করতে, চালু হল লাউডস্পিকার এবং নিয়মিত মাইনের চাকুরি। এ সকল বিষয় তিনি সচেতনভাবে ভাবতে পারেননি। তাছাড়া তিনি কখনো সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি ভাবতে পারেননি। যে বুর্জোয়া সামাজিক সম্বন্ধের আওতা থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতীতের ওপর বর্তমানের সর্বাত্মক ধ্বংসকারী শক্তির সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন না। আসলে, তিনি যেন সে মানুষ যিনি মহামারী আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যদি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারতেন, তাহলে এ ভেবে সান্ত্বনা পেতেন যে অনিবার্যভাবে অতীত বর্তমানের কাছে আত্মসমর্পণ করবেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সোভিয়েত রাশিয়ার মত এমন এক শক্তিশালী সহায় না আবিষ্কার করতে পারে যা বর্তমানের গর্ভে আভাসিত হয়ে উঠেছে তা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতেরই জন্ম দেবে। এ ধরনের কর্মের জন্য শুধু বীরপুরুষেরা যথেষ্ট নয়। যে ভবিষ্যতটি আসন্ন তাও পরিপূর্ণভাবে অঙ্কুরিত হওয়া চাই, আরবের মরুভূমিতে সে কাজটিই হয়নি।

কি ঘটে গেল তা লরেন্স পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি, তিনি শুধু এটুকু বুঝেছিলেন সিরিয়া এবং ইরাক এসব তাঁর জীবনের অতৃপ্তির উত্তর নয় এবং তিনি যে

নির্মমভাবে নিজেকে ক্ষয় করেছেন তার তুলনায় এসব কিছু নয়। পরবর্তী তিক্ত দিনগুলোতেও লরেন্স তাঁর অন্তরের গভীরে কর্মের উদাত্ত আহবান শুনেছিলেন, কেননা তিনি দেখেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু বর্জোয়া সংস্কৃতিতে পচন লেগেছে। রাষ্ট্রের সমস্ত উৎসবে, সমাজের চাকচিক্যে এবং প্রচারের উত্তুঙ্গ মহিমার মধ্যেই এ অবক্ষয়কে দেখেছিলেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রত্যেক উদ্ভাসনের মধ্যেই তিনি তাঁর আদর্শের চমকপ্রদ একটি প্রতিরূপ দেখেছিলেন। তাও শুষ্ক এবং পূর্ণতাবিরোধী, কিন্তু তাতে অসম্মানের ভয় নেই। সেনাবাহিনীতে মানুষ রাজার অর্থ গ্রহণ করে, তাই বলে লাভ কিংবা লোভের আদর্শ তাদের একত্রিত করে না। এক সহজ সামাজিক নির্দেশের ওপরই তার ভিত্তি এবং যে শক্তি বিকীরিত হয় সেনাবাহিনীতে তা কখনো লাভের প্রত্যাশা করে না। বুর্জোয়াতন্ত্রে স্থূল বিলাসভূমির উপকণ্ঠে সেনাবাহিনীর সাদাসিদা তাবুগুলো এক ধরনের আরবের মরুভূমি যেন। একটি স্বাধীন সামাজিক স্থিতি যাতে নেই সামাজিক ঘৃণা এবং প্রতিযোগিতা। এ এক ধরনের প্রত্যাশাবিমুখ স্থির অস্তিত্ব। কারণ একদিকে তাতে বুর্জোয়াতন্ত্র কর্তৃক ধ্বংস করার আগে সামন্ততান্ত্রিক যে সমাজ সম্বন্ধ ছিল তা সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে আগামীদিন নগদ টাকার সম্পর্কমুক্ত যৌথ চেষ্টা এবং শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত কমিউনগুলোর প্রাথমিক ঈশারা যেন। এই যে মানুষটি যিনি বুর্জোয়াতন্ত্রের সমস্ত সম্পর্কের ওপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অন্যকোন চাকুরিতে কাজ এবং খেলাধুলায় এরকম সৌহার্দের সম্পর্ক দেখতে পাননি। এও বন্ধ্যা সম্পর্ক, তবু তাতে এমন কিছু আছে যা সুন্দর এবং আনন্দদায়ক কিছু স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। শান্তির সময়ে সেনাদলের নিষ্ফল শ্রম তাকে ক্লান্ত করে তোলে এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে এক ধরনের অক্ষম ঈর্ষা সদস্যদের আক্রমণ করে। যখন যুদ্ধ আসে তখন সামাজিক দায়িত্ব তাদের ওপর পড়ে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া সমাজ আইন এবং নগদ সম্বন্ধ স্থগিত রাখে, যাতে করে রক্তপাত এবং প্রতিহিংসার মাধ্যমে আত্মসংরক্ষণ কিংবা আত্মবিস্তৃতি সাধন করতে পারে। তখনই সেনাবাহিনী নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে। যুদ্ধের সমস্ত আতঙ্ক এবং বিপদের মধ্যেও তারা এক ধরনের উগ্র উন্মাদনা এবং উগ্র কল্যাণবোধ অনুভব করে। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে অংশ নেয় তারা যৌথভাবে এক ধরনের উর্ধে উড্ডীন স্বপ্নালু বাস্তবের সন্ধান লাভ করে যা তাদের নীরস বুর্জোয়া অস্তিত্বের উর্ধে নিয়ে যায়।

বুর্জোয়া সম্বন্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন লরেন্স, কেননা তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা তার বিরুদ্ধে বেঁকে গিয়েছিল। তাই তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। সেও অফিসার হিসেবে নয়। বুর্জোয়াতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন সেনাবাহিনীতেও বুর্জোয়া সমাজের বৈশিষ্ট্য তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। তাই সে অফিসার শ্রেণীতে তিনি যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু অফিসার তাঁকে হতে হল। তাঁর অর্ন্তজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি প্রদর্শন করলেন, তাঁর যে অতৃপ্তিবোধ তা হচ্ছে ভবিষ্যতের সর্বহারা পৃথিবী নির্মাণেরই অতৃপ্তি, তাঁর শিক্ষাগত চেতনা তখনও নিজেকে বুঝতে বাধা দিয়েছিল।

তিনি শুধু সর্বহারা নয় যন্ত্রকেও কোল দিলেন। সে দুঃখময় দিনগুলোতে যন্ত্রের প্রতি তার এক অদ্ভুত মমতা ছিল। মটর সাইকেল, মটর বোট এবং এ্যারোপ্লেন এসবকে মানুষের অত্যধিক শক্তিধর সহায়ক আশ্চর্য সত্তা বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন এবং লিখেছেন আকাশ বিজয়ে অংশগ্রহণ করা একটি কাজের মত কাজ। এর সবটুকু নিষ্ফল নয়, কিন্তু তিনি বলতে পারেননি কেন? যন্ত্রের মধ্যেই ভবিষ্যৎ। কিন্তু যে যন্ত্র মুনাফা বৃদ্ধি করে তাতে আগ্রহী তিনি ছিলেন না। তিনি যে তাৎপর্য কামনা করেছিলেন, যান্ত্রিক সাফল্যের মধ্যেই তা নিহিত। কিন্তু তিনি যন্ত্রকে যন্ত্র হিসেবে দেখেননি, দেখেছিলেন মানুষের সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধীন ভৃত্য হিসেবে, যার বলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ চেতনা না হারিয়েও মানুষে মানুষে আদিম সম্বন্ধের স্বাধীনতার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়। লরেন্সের হাতে ছিল যন্ত্র, বুর্জোয়াদের হাতেও তাই ছিল। কিন্তু তিনি তাদের মত ব্যবহার করতে জানতেন না। বুর্জোয়াদের মত তিনিও যন্ত্রের অস্থির শক্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, যেহেতু তিনি একে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাই দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে চালিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন। একদিন সকলে তাঁকে তাঁর অতিকায় মটর সাইকেলের পাশে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেল। সাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি শিখেননি। তার কিছুদিন পর তিনি মারা গেলেন।

তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার নিকটবর্তী সময়ে তিনি কমিউনিস্ট বীর হলেন না কেন? তাঁর গুণাবলি এবং ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্বন্ধের প্রতি ঘৃণাবোধের জন্য তাই হওয়া তাঁর পক্ষে সমীচীন ছিল। বাধা দিয়েছিল কি? লরেন্সের এই বিয়োগান্তক পরিণতির কারণ অংশত তাঁর শিক্ষা। আর তিনি অধিক পরিমাণে ইনটেলেকচুয়াল ছিলেন। একজন বীরের প্রচুর ব্যবহারিক এবং সহজাত বুদ্ধি থাকা চাই। কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল হওয়ার অর্থ হল চলতি ধারা অনুসারে একজন মানুষের মানসিক সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। লরেন্স ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চেতনার মানুষ—কিন্তু তা ছিল এমন একটি সমাজের চেতনা যা বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যাহ্নদিনের পরিত্যক্ত প্রতীকগুলো আঁকড়ে ধরেছিল তার স্মৃতি। তার মানসিক গঠনে এমন এক ধরনের কাঠিন্য দিয়েছিল যা তাঁর প্রতিভার প্রবৃত্তিগত চালনায় বাধা দিত। তাই যদিও চিন্তা কাজের সহায়ক, অনেক সময় দেখা যায়, কাজের বাধাও সৃষ্টি করে। লরেন্স নিজে বিশ্বাস করতেন তাঁর ট্রাজেডি হল তিনি কাজের মানুষ, কিন্তু তাঁকে চিন্তাও করতে হয়। সরলভাবে বলতে গেলে তাঁর পরিণতির এই কারণ। চিন্তা এবং কাজের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য তা অধিকতর ব্যাপক এবং তাৎপর্যময়।

অন্যান্য বীরপুরুষ যাঁরা একই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন— তাঁরা এই বাধাকে অতীতের জন্য সংগ্রাম করতে যেয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে এসে অতিক্রম করতে পারেন। তিনি পারেননি কেন? এ হল লরেন্সের বিয়োগান্তক পরিণতির নতুন দিক যা লেনিনের সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে ভালভাবে বোঝা যাবে। লেনিন হচ্ছেন এমন এক ধাতুতে গড়া বীরপুরুষ যাঁর সঙ্গে অতীতের বীরপুরুষদের কোন তুলনা হয় না। তাঁকে

দেখলে বীরের পুরনো সংজ্ঞা না বদলে উপায় নেই। অতীতের যে বীরপুরুষদের প্রতিমূর্তি তার মনে অস্পষ্টভাবে ছিল, যে সামাজিক অবস্থা তাঁদের সৃষ্টির কারণ তা তিনি বুঝতেন না। অনেক সময় তিনি ভাবতেন যে, অতীতকেই পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন তিনি। অথবা জোয়ান অব আর্কের মত তিনি শুধু স্বর্গীয় নির্দেশ অথবা দৈবী আওয়াজের বশেই চালিত হচ্ছেন। এ ধরনের বীরেরা অন্ধভাবেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করেন। তাঁরা কি করছেন কেন করছেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

তাঁর কর্তব্য কি এ বিষয়ে লেনিনের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। যে ভবিষ্যৎ তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে তাই হল কমিউনিস্ট সমাজ। কিভাবে যে তা বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে তাকে মুক্তি দিতে হবে তিনি জানতেন। শুধুমাত্র অন্তর প্রেরণার বলে নয়, তিনি জানতেন স্পষ্টভাবে। তাঁর রচনা এবং বাক্যে তা প্রতিভাসিত হয়েছে পরিষ্কার। ভবিষ্যতের রূপটি কি হবে তিনি জানতেন না, কেউ তা জানতে পারে না। তবে তিনি তার সাধারণ আকৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ সম্পর্কে যা ভবিষ্যৎ সৃজন করছে জানতেন। যেমন করে একজন বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের রূপ সম্বন্ধে না জানলেও কতেক নিয়ম যা তিনি জানেন তার বলে স্রোতের গতিরেখা এবং প্রয়োজন হলে তার থেকে সুবিধে আদায়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। ভবিষ্যদ্বাণীর এই হল মূলকথা। কত রকম ঘটনা যা ক্রমশ ঘটে যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে একটি ভিন্নরকম ঘটনা ঘটছে সামনে, সে সম্বন্ধে বলা। সমাজ এবং বিরুদ্ধ ঘটনা দুটি এক বলয়ে শুধু অবস্থান করে না, একটি অন্যটিতে রূপান্তরিতও হতে পারে। একটার পরিবর্তনে অন্যটাতেও পরিবর্তন আসে। গুণ আকস্মিকভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন সত্তার মত হঠাৎ জেগে উঠতে পারে এবং পরিমাণ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। পরিচিত সম্বন্ধের আওতার মধ্যে তা স্থিত থাকে। জানা বস্তুনিচয়ের মধ্যেই বিজ্ঞানের কারবার। যেমন ইলেকট্রন, কাল, ব্যাপ্তি, বিকীরণ এবং তাদের সংযোগকারী সম্বন্ধ। যেহেতু জানা জিনিসের মধ্যে সীমিত বিজ্ঞান তাই তার বলে ভবিষ্যতে জানা সম্ভব সে বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। যতদূর পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানীরাও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারে। লেনিন এতদূর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতীতের বীরপুরুষেরা ভবিষ্যতের পরিমাণগত ভিত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। লেনিনও কর্মীপুরুষ, বীরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন এই মরমীবাদে সম্পূর্ণরূপে আস্থাহীন ছিলেন এবং পক্ষান্তরে বিজ্ঞান নির্ভর ধারণাকেই অনেকাংশে বরণ করে নিয়েছিলেন।

যে লোক নতুন সমাজের জন্ম দেবে তার পক্ষে সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে জানা কি অপরিহার্য নয়? কেননা ভাবী সমাজের অঙ্কুর বর্তমান সমাজে রয়েছে অন্যান্য প্রাথমিক সামাজিক সম্বন্ধের থেকে একে আলাদা করা কি উচিত নয়? যে বুর্জোয়া সমাজে বাস করছে সে সমাজের সংস্কৃতি নয় শুধু গোটা সমাজটার জ্ঞান লাভ করা তার পক্ষে কি অনুচিত? একমাত্র আত্মসচেতন বীরই মানুষকে আত্মসচেতন সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে দিতে পারে। কমিউনিস্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য যদি এই হয় যে সমাজ সম্বন্ধে অন্ধ

প্রতীক ধর্ম, মরমীবাদ, প্রতীক এসব সত্যের আলোকে বদলে দেবে তাহলে তার পতাকাবাহীদের কি সমান পরিমাণে এইসব রূপক এবং চিত্রকল্প থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়? এ ধরনের মানুষের সমাজকে দেবতা, শয়তানের সক্রিয় রঙ্গমঞ্চ অথবা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার অস্পষ্ট ঝাপসা চিত্র কিংবা প্রাকৃতিক মানুষের জগত হিসেবে না দেখে অবশ্যই কার্যকারণ সূত্রে বিচার করে দেখা উচিত। লেনিন তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আগে কার্লমার্কস সমাজের বিধিগুলোর কারণ উদ্ভাবন করেছেন। সেই সময়ে নতুন ধরনের বীর অথবা নায়কদের জন্ম সূচনা করলেন। তাঁর বিপরীতে হিটলার এবং মুসোলিনী সূচনা করলেন নায়ক এবং বাক্যবাগীশদের সুদীর্ঘ ফর্দ। এখন বীরের পক্ষে শুধুমাত্র প্রবৃত্তিগত ধারণার নির্দেশে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সীমানার বাইরে সঠিক কাজটি করা সম্ভব নয়। এ ধরনের বীরেরা লরেন্সের মত তাঁদের চেতনার ফাঁসেই আটকা পড়বেন। কমিউনিজমের আসল দাবি মানুষকে যা ইচ্ছা করে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকলে চলবে না, কি কারণে সে ইচ্ছাটির জন্ম হল সে সম্পর্কেও সচেতন হওয়া চাই। কমিউনিস্ট নেতার এ না হলে চলবে না।

লরেন্সের দুঃখজনক পরিণতির কারণ শুধু এই নয় যে তিনি আপন বুদ্ধির ঘোরপ্যাঁচে আটকা পড়েছিলেন, নতুন জগতের আসল স্বরূপ, যার ডাক তিনি স্বপ্নে শুনেছিলেন, তাও সমানভাবে দায়ী। অন্যান্য বীরেরা গেল দিনের চেতনার বিকৃতি সাধন করেও সঠিক পথ ধরে চলতে পেরেছেন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জের তাদেরকে টেনে নিয়ে গেছে। এ ধরনের প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ বীরের জন্ম আর হবে না। বীরে পরিণত হওয়ার সাথে লরেন্সর যে চেতনা অবহেলা না করে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তা ভেঙ্গে তাঁকে আবার শক্ত ভিতের উপর নতুন করে বিন্যাস করতে হয়েছে। তিনি অক্সফোর্ডের শান্ত নিকুঞ্জ-অথবা এখন বাজার এবং যন্ত্রের কলুষমুক্ত ঊষর ধূসর আরবীয় মরুভূমিতে তিনি কেমন করে সে চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করবেন?

লেনিনের পূর্বে যে সকল সরল মানুষ বাস করতেন আগামীদিনের বীর-পুরুষদের কাজ অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ এবং সন্তুষ্টিদায়ক। তাঁদের পয়লা জানা প্রয়োজন কোন্ জিনিসের জন্মের প্রয়োজনে তারা সাহায্য করতে যাচ্ছেন? তারপরে তাঁরা জানতে পারবেন যে তাঁরা নতুনের জন্মদানে সক্ষম। এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্বপুরুষেরা দেবী আফ্রোদিতি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কিংবা কোন ভাগ্যের অধীন নন— তাঁরা শুধু সে কার্যকারণ সম্পর্কেরই অধীন যা জগত সংসারে নিজ পরিবর্তন ক্রিয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন যিনি নিজে উপকথার মধ্যে বাস করবেন এবং অনুসারীদের কাছে পরীর দেশের গল্প বলবেন, তেমন বীরের দিন সত্যি সত্যি অতীত হয়েছে। সমস্ত রমণীয় সরলতা এবং সুন্দর ভ্রান্ত বিশ্বাস করানোর কায়দা কানুনসহ মানুষের শৈশবকাল অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং এ যুগের মানুষের যারা হবেন বীর, তাঁদের সাবালক হওয়া চাই।

চীন দেশেও দারিদ্র্য এবং দুঃখভারে প্রপীড়িত সরল কৃষক সমাজ স্বাধীনতার নামে কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন। সে একজন বীরের কাহিনী নয়— অযুত বীর মিলে

রচনা করছেন অপূর্ব বীর কাহিনী যা শোষকেরা বিশ্বাস করবে না। তাঁদের সপক্ষে বুর্জোয়া সোনা নেই, বরঞ্চ বুর্জোয়া সোনার সাহায্যে, সশস্ত্র বুর্জোয়া শক্তি, বুর্জোয়া কৌশলীদের পরিচালনায় তাঁদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাঁরা প্রতিহত করে চলেছেন। লালফৌজের পরিচালনায় চীনের যে জাতীয় আন্দোলন আগুন এবং বারুদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এবং তা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে— তাও স্বাধীনতার অনুপ্রেরণায়। কিন্তু সে স্বাধীনতা বুর্জোয়া স্বাধীনতা নয়। বুর্জোয়া স্বাধীনতা জাপানি সমরবাদের নামে, ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির নামে এবং আমেরিকায় ব্যবসানীতির নামে তাঁদেরকে নাস্তানাবুদ করতে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। লালফৌজ হল কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী যেখানেই এই ফৌজ যায় প্রতিষ্ঠা করে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরা পড়েছেন মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিনের রচনাবলি। ইরাকে তেলের অর্থনীতি সঙ্কটের ফলে বুর্জোয়া মুক্তিদাতা লরেন্সের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এতকাল যাবত অবরুদ্ধ চীনা জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমেই তার শেষ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

১৯৬৯

এনজিও প্রসঙ্গে কিছু কথা

এক

ত্রিশ বছর আগে এই পৃথিবীতে এনজিও'র অস্তিত্ব ছিল না। ত্রিশ বছর পরে এনজিওগুলো টিকে থাকবে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনীতির বিশেষ এক পর্যায়ে এনজিও'র চল হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে সত্তুরের দশকে তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা "Assaulet on the poverty of the world" শিরোনামে একটি কেতাব রচনা করেছিলেন। এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে রবার্ট ম্যাকনামারা ছিলেন মার্কিন পক্ষের সেনাপতি।

ম্যাকনামারার এই পুস্তক রচনা করার পেছনে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীদের ভরাডুবি যে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ম্যাকনামারা তার বইতে বলেছিলেন, আমরা অর্থাৎ আমেরিকানরা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোতে দেদার অর্থ সাহায্য করে আসছি। আমাদের অর্থ সাহায্য করার পেছনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ওই সমস্ত দেশে দারিদ্র্য যাতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে না পারে। কারণ দারিদ্র্য যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করে, কমিউনিজমকে রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কমিউনিজমের প্রসার ঠেকানোর লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে দেড় দু' দশকেরও অধিক সময় ধরে বিস্তর অর্থ সাহায্য করে আসছি। কিন্তু আমাদের আজ বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হচ্ছে ওই সমস্ত দেশে সাহায্য করার পেছনের উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা গেছে। আমাদের সাহায্য দেয়ার কারণে ওই সমস্ত দেশে ধনী অধিকতর ধনী হয়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিকতর দরিদ্র হয়ে পড়েছে। শহরের এবং গ্রামের দূরত্ব ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কমিউনিজম ঠেকানোর জন্যে অর্থ সাহায্য করেছিলাম, কিন্তু আমাদের সাহায্য কমিউনিজমের গতিকে দুর্বার করে তুলেছে। রবার্ট ম্যাকনামারা, এরিস্টটলের সেই সমাজ বিপ্লবের তত্ত্বটি উদ্ধৃতি করে বলেছিলেন, নদীর বাড়তি পানি যেমন প্লাবনের সৃষ্টি করে তেমনি সমাজের বাড়তি দারিদ্র্যই সমাজকে বিপ্লবের পথে ধাবিত করে নিয়ে যায়। আমরা বিস্তর অর্থ সাহায্য করে ওই সমস্ত দেশের দারিদ্র্যকে সহনীয় সীমারেখার মধ্যে আটক রাখতে পারিনি, বরঞ্চ দারিদ্র্যকে অসহনীয় এবং ভয়াবহ করে তুলেছি।

আমরা এই স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশসমূহে সাহায্য আকারে যে অর্থ দিয়েছি সমাজের অতি খাওয়া লোকেরা সেই অর্থ খেয়ে ফেলেছে। রাজনৈতিক দলের নেতা, সরকারি আমলা এবং সমাজের নেতৃশ্রেণীর মানুষদের বলয় ভেদ করে সে অর্থ সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে একেবারে পৌঁছাতে পারেনি। এ কারণে, আমাদের সাহায্য ধনীকে আরো ধনী করেছে এবং গরিবকে আরো গরিব। গ্রাম এবং শহরের দূরত্ব এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'য়ের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব করেছে। আমরা পড়ে গেছি এক মহামুশকিলে। ওই সমস্ত দেশ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই। আমরা যদি তাদের ভয় দেখাই আমরা সাহায্য দেব না, তারা প্রয়োজনের তাগিদে কমিউনিস্ট দেশসমূহের দ্বারস্থ হবে এবং কমিউনিস্টরা বিশ্বে আমাদের প্রভাব খাটো করার জন্যে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। রবার্ট ম্যাকনামারা তাঁর গ্রন্থে সাহায্য দেওয়ার একটি সুচিন্তিত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেটা হল এই, যে সমস্ত দেশে আমরা সাহায্য দিয়ে আসছি, তাদের অব্যাহত সাহায্য দিয়ে যাব। কিন্তু দেশগুলোকে অবশ্যই আমাদের কতিপয় শর্ত মেনে চলতে হবে। যে সমস্ত টাকা আমরা তাদের বছরে বছরে দিয়ে থাকি তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের তৃণমূলে আমরা ব্যয় করব। দেশগুলো যদি কবুল করে নেয় যে তারা আমাদের শর্ত মানবে তাহলেই আমরা তাদের সাহায্য দেব, নইলে দেব না। অধিকাংশ দেশে এই ম্যাকনামারার উদ্ভাবিত ফর্মুলা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ মার্কিন সাহায্য না হলে তাদের চলে না। ৭০-এর দশক, তারপর ৮০-র দশক, এই দু' দশকের প্রায় সবটা সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কমিউনিজমের প্রসার রোধ করার লক্ষ্যেই এনজিও কার্যক্রম চালানো হয়েছে। মূলত এনজিও কার্যক্রমের মুখ্য লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা।

৯০-এর দশকের শুরুর দিকে সোভিয়েতের যখন পতন হয় তখন পূর্ব-ইউরোপে কমিউনিস্ট বলয়ভুক্ত দেশগুলো কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ প্রত্যাহার করে এবং স্নায়ুযুদ্ধের গতিধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে থাকে, সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী এনজিও কার্যক্রমের লক্ষ্যে আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। যে সকল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটো করার জন্যে ৭০-এর দশকে এনজিও কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল ৯০-এর দশকের শুরুতে দেখা গেল সেই দেশগুলোই তাদের ওখানে এনজিও কার্যক্রম চালু করার জন্যে পশ্চিমা দেশসমূহের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে অধিক বাক-বিস্তার করার অবকাশ নেই, তবে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর দেশে দেশে এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমা দেশসমূহের স্নায়ুদ্ধের ক্ষেত্র বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন গোটা পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধী কোন সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব আপাতত নেই। এই পশ্চিমা ধনতন্ত্র পৃথিবীর উপর যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দৃশ্যত তাকে সরিয়ে দেয়ার মত অন্যকোন সামাজিক আদর্শ আজ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জয়যাত্রায় পৃথিবীতে আস্থা নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জয়যাত্রা পৃথিবীতে আজ অব্যাহত গতিতে চলছে। তারপরও পশ্চিমের দেশগুলো এবং পণ্ডিতজনেরা সাম্প্রতিককালে মনে করতে আরম্ভ করেছেন একটা সময়ে ইসলাম পশ্চিমা ধনতন্ত্রের জন্যে একটা বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইসলামি সমাজ আদর্শের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো পুঁজিবাদকে প্রত্যাখান করার মত শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে এবং প্রশ্নটা সময়ের।

পশ্চিমা দেশসমূহ যারা দরিদ্র দেশসমূহে এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহায্য দেয়া অব্যাহত রেখেছে— সাম্প্রতিককালে এই চিন্তাটিও তাদের মন-মগজে একটা স্থান অধিকার করে নিয়েছে। স্পষ্টভাবে তারা কিছু বলছে না। কিন্তু তাদের সাহায্য কার্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করছে তার মধ্যে মুসলিম সমাজসমূহের মূল চিন্তাসমূহের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন হামলার ভাব অতি সহজে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে অত্যন্ত সংক্ষেপে এনজিও কার্যক্রমকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ধনতন্ত্রের অর্থনীতিকে গতিশীল করা, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকাশের বাধাসমূহ অপসারণ করা এবং সমাজের তৃণমূলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নিয়ে যাওয়াই হালে এনজিও কার্যক্রমের লক্ষ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল এনজিও দীর্ঘদিন কার্যক্রম পরিচালনা করে একেকটা সমান্তরাল সরকার চালানোর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর যেকোন পর্যালোচনা চালানোর সময় ওপরের বক্তব্যগুলো মনে রাখতে হবে।

দুই

আমাদের দেশের বৃহৎ এনজিওসমূহ আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে অত্যন্ত দীনভাবে তাদের কাজকর্ম শুরু করেছিল। সেবাকর্মের মাধ্যমেই তাদের যাত্রা শুরু। এই নাতিদীর্ঘ সময়ের পরিসরে সেই এনজিওসমূহ বড় হতে হতে এমন একটি আকার পেয়েছে, একেকটি এনজিওকে বিনা দ্বিধায় একেকটি সমান্তরাল সরকার বলে চিহ্নিত করা যায়। বড় এনজিওসমূহের বার্ষিক বাজেট ৩ শ' কোটি, ৫ শ' কোটি থেকে শুরু করে হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় এনজিও নামেমাত্র সেবাকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আসলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য তেজারতিসহ নানাকিছুতে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ ব্যাংক খুলেছে, কেউ ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারের মত বড় দোকান ইত্যাদি চালাচ্ছে। কেউ কেউ উৎপাদনকর্মে সরাসরি যুক্ত হয়ে

পড়েছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বলতে যে জিনিসটা বুঝায় বৃহৎ এনজিওসমূহ এই সময়ের মধ্যেই তার ভেতর ঢুকে পড়েছে। এই বড় এনজিওগুলোর কর্মতৎপরতার এই দিকটির ওপর অদ্যাবধি বস্তুনিষ্ঠ কোন পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়নি। এনজিওর ভালমন্দ, এনজিও প্যারাডাইম (Paradigm) তথা প্রেক্ষিতের মধ্যেই রেখে বিচার করা হচ্ছে। একেকটা এনজিও এই যে ৩ শ' ৫ শ' এবং হাজার কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট রচনা করছে, তার সিংহভাগ এসেছে বাইরের দেশ থেকে। বস্তুত বৃহৎ এনজিওগুলো দেশের বাইরে থেকে দান-অনুদান ইত্যাদির আকারে মূলধন সঞ্চয় করে এখানে জাতীয় ধনতন্ত্রের সমান্তরাল একটি ভিন্ন রকমের ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। ধনীরা যে পদ্ধতিতে মূলধন বিনিয়োগ করে, শ্রমিক খাটায় এবং উৎপাদিত পণ্য থেকে মুনাফা অর্জন করে, এনজিওগুলোও সেই একই পন্থা অনুসরণ করে যাচ্ছে। দেশীয় ধনীদের ট্যাক্স দিতে হয়, মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে শ্রমিক ধর্মঘটের মোকাবেলা করতে হয় এবং ট্যাক্স ফাঁকি দিলে সামাজিকভাবে ধিকৃত হতে হয়। কিন্তু এনজিওগুলোর সেসবের সম্মুখীন হতে হয় না। তারা দরিদ্র মানুষের সেবাকর্মে নিয়োজিত রয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে সরকারকে কর দেয় না। এনজিওতে কর্মরত শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার নেই। অথচ সেখানে মুনাফা আছে, শ্রমিক শোষণ আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। আমরা শিল্পপতি সালমান এফ রহমানকে ঋণখেলাপি বলে গাল দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রফেসর ইউনূসকে কেন নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে না, সেজন্যে আমাদের আপেক্ষের অন্ত নেই। অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এবং ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তলিয়ে দেখলে অবশ্যই ধরা পড়বে প্রফেসর ইউনূস এবং সালমান এফ রহমান উভয়েই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তবে একথা সত্য, সালমান এফ রহমান তার মত ধনিকদের সঙ্গে প্রফেসর ইউনূস বা তার মত ধনতন্ত্রের বিকাশে গঠনরত এনজিওগুলোর একটা পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যটা প্রণিধানযোগ্যও বটে। ব্রিটিশ পুঁজির কনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে এখানে যে পুঁজির বিকাশ শুরু হয় সালমান এফ রহমান এবং তার মত অন্যান্য পুঁজিপতি সেই প্রক্রিয়াটির ধারাবাহিক বিকাশের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছেন। অন্যদিকে প্রফেসর ইউনূস এবং অন্যরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে ধারাটি অনুসরণ করছেন, সেটি একটু ভিন্নকরম। প্রফেসর ইউনূসরা গ্রামের দরিদ্র, বিশেষ করে নারী সমাজ— যারা পূর্বে সম্পূর্ণভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বাইরে থেকে গিয়েছিল এই জনগোষ্ঠীর সেই সমস্ত দুঃস্থ মানুষদের সংগঠিত করে একটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছেন এবং আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়েছেন। একজন লাতিন আমেরিকান অর্থনীতিবিদের পরিভাষায় এই পদ্ধতিটিকে পাউন্ড ক্যাপিটেলের পাশাপাশি পেনি ক্যাপিটেলকে গতিশীল করার একটা প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা যায়। পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি আমাদের মত জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সমাজের তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন বলেই পশ্চিমা দেশসমূহ প্রফেসর

ইউনূস এবং তার মত লোকদের মিরাকলম্যান আখ্যা দিয়ে প্রতিদিন একটা করে পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করছে।

বর্তমান নিবন্ধটির পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ, এখানে তাত্ত্বিক আলোচনা করার বিশেষ অবকাশ নেই। আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি, সংক্ষেপে তা হল এই রকম— আমরা একটি পুঁজিবাদী সমাজে বসবাস করছি। সে পুঁজিবাদ যতই পরনির্ভরশীল এবং জরাগ্রস্ত হোক না কেন, আমাদের সমাজ পুরোপুরিভাবে পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন— সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে আমাদের এখানে যে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করছে, তার মধ্যে একটি পার্থক্য অবশ্যই আছে। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী সমাজে একটি বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদল লোক ধনী হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেছিল, কিন্তু আমাদের এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ধনীক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

এই রচনায় একাধিকবার আমরা উল্লেখ করেছি, ধনবাদের সনাতনী ধারাটির পাশাপাশি আরেক ধরনের পুঁজিবাদ আমাদের সমাজে বিকাশ লাভ করতে আরম্ভ করেছে। সেটা হল এনজিও নির্ভর ধনবাদ। ধনবাদের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এতদিন ধনীক শ্রেণী বাংলাদেশে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ামক ছিল। তারা তাদের প্রয়োজনে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগি করেছে। সাম্প্রতিককালে এনজিও নির্ভর ধনতান্ত্রিক ধারাটি তেজী হয়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রে এনজিওগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এখন এনজিও আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওগুলোর প্রভাব, চাপ, দাপট রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর এতদূর কার্যকর হয়েছে যে, এখন বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারকে ঋণ দেয়ার সময় শর্ত বেঁধে দেয় জিও এবং এনজিওর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর এনজিওগুলো যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল।

আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে সমাজের একটি ধনতান্ত্রিক উত্তরণ প্রয়োজন। সেটা যদি এনজিওগুলোর দ্বারা পরিচালিত ধনতন্ত্রও হয়, তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হল, এনজিওগুলোর উদ্যোগে যে ধনতন্ত্রটি বিকাশ লাভ করছে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে তার কোন নিয়ন্ত্রক নেই। এনজিওগুলো বাইরে থেকে দারিদ্র্য দূর করার নামে দান-অনুদান ইত্যাদি এনে এক ধরনের ধনতন্ত্র কায়েম করছে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে, তার কোন নিয়ন্ত্রক নেই। কিন্তু দেশীয় ধনিকদের যেভাবে জবাবদিহি করতে হয়, লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে হয়, এনজিওগুলোর তার কোনটাই করতে হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কর দিতে হয় না, শ্রমিক ধর্মঘটের মোকাবেলা করতে হয় না, লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয় না— একটা কর্মসূচি সফল না হলে নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করে বিদেশ থেকে অর্থ আনতে পারে।

এনজিওগুলো যে ধরনের লাগামছাড়া দায়বদ্ধতাহীন ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে আমাদের সমাজে তার কী প্রভাব পড়বে, সেটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার বিষয়। বড় বড় এনজিও নানারকম কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র্য নিরসনের নাম করে বাইরে থেকে মূলধন নিয়ে আসছে এবং এক ধরনের ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটাচ্ছে। ধনতন্ত্র যখন বেগবান হয় সেখানে আপনা থেকে দারিদ্র্য জন্ম নেয়। এনজিওগুলো এখন একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। তারা দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে বাইরে থেকে টাকা এনে ধনতন্ত্র কায়েম করার মাধ্যমে নতুনভাবে দারিদ্র্য সৃষ্টির কারখানা তৈরি করছে।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৯৫ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এডাব-এর অধীন এনজিওসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে দেশের সবচাইতে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী এবং আমলাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আন্দোলনে নামে। অবশ্য এডাবের সমস্ত সদস্য এই আন্দোলনে অংশ নেয়নি। একাংশ তার বিরোধিতা করেছে। আবার বাংলাদেশে ছোট বড় যত এনজিও আছে তার শতকরা তিনভাগও এডাবের সদস্য নয়। এডাব সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কোন অন্যায় করেছে, আপাতদৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়ার কথা নয়। কিন্তু একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দলই জাতীয় মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একটাকে হটিয়ে আরেকটাকে আনা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কী উপকারে আসে। '৯৬-এর নির্বাচন এবং নির্বাচন পূর্ববর্তীকালে দেখা গেল বড় বড় এনজিও ঘোষিত এবং অঘোষিতভাবে মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলল। বেশ ক'টি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করল। অন্য ক'টি প্রচ্ছন্নভাবে বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছে। অর্থাৎ সরকার ওঠানো-নামানোর খেলায় এনজিওগুলো নিজেদের একটা ফ্যাক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়াটি কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সেটা ভাবনা-চিন্তার সময় এসেছে। বড় এনজিওগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কারণ, তাদের হাতে পুঁজি এসেছে এবং পুঁজির বিকাশ সাধনের জন্যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা তাদের প্রয়োজন। সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ কিংবা গ্রামীণ মানুষের উন্নতি সাধন তাদের মুখ্য লক্ষ্য আর নেই।

তিন

আমি মাঝারি নয়, আবার একেবারে ক্ষুদ্রও নয়— এরকম একটি এনজিও'র কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। আজ প্রায় পাঁচ বছর হল। এ সময়ের মধ্যে এনজিও'র কাজ-কর্ম একেবারে ভেতর থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষাবিস্তার, জনসংখ্যা নিরোধ এককথায় গ্রামীণ সমাজের মধ্যে একটা গতিশীলতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এনজিও'রা

একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। কিছুদূর পর্যন্ত গরিব মানুষের অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়নের বেলায়ও এনজিও'র অবদান অবশ্যই উল্লেখ করার মত। সবচাইতে বড় কথা হল, এনজিওসমূহ শিক্ষিত বেকারদের একটা বিরাট অংশের জন্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এটা কম কথা নয়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা কথা বলতে পারি, এনজিওসমূহ যতক্ষণ ক্ষুদ্র থাকে সমাজে তারা একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। তারা নারীর অধিকারের প্রশ্নটি অগ্রাধিকার দেয়, সমাজের একেবারে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষদের জোট বাঁধতে সাহায্য করে, নিরক্ষর জনসমাজে অল্পবিস্তর শিক্ষ বিস্তারেও সহায়তা করে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসাও তারা প্রদান করে। সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা কিছুতেই ছোট করে দেখার উপায় নেই।

এনজিওগুলো যতক্ষণ ক্ষুদ্র থাকে ততক্ষণ তাদের অবস্থান থাকে এক একটি আন্দোলনের মত। গ্রামীণ সমাজের অচলাবস্থা দূর করতে গিয়ে তাদেরকে নানাবিধ সমস্যা সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। সেবা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে গ্রামীণ মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, নারীর প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যযুগীয় মনোভাব, জীবনবিমুখ চিন্তাচেতনা এবং ভাগ্যবাদী ভাবনা এগুলো একযোগে গ্রামসমাজকে পশ্চাদপদ থাকতে বাধ্য করছে। সমাজের এ জটগুলো একটা আর একটার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটা খুলতে গেলে আর একটাতে হাত না দিয়ে উপায় থাকে না। এই দারিদ্র্য, এই হতাশা, এই অশিক্ষা, এই গতিহীনতা গ্রামীণ সমাজে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে সেগুলো গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে এমন একটি অনড় অবস্থানে টিকিয়ে রেখেছে যে, কোন একটি গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করতে গেলে ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এনজিওদের বড় কৃতিত্ব এই যে, তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হলেও তাতে কাঁপন লাগতে আরম্ভ করেছে। একটা সমাজ যখন ভেতর থেকে গতিশীলতা অর্জন করতে থাকে সে সমাজের মধ্যে একটা সার্বিক পরিবর্ত : আসতে বাধ্য। প্রশ্নটা সময়ের।

এনজিওরা অল্পস্বল্প সঞ্চয় প্রবৃত্তি জন্ম দিতে পেরেছে, অনেক নতুন ধরনের কাজকর্ম চালু করেছে, শিক্ষার প্রয়োজনকেও প্রায় অনিবার্য করে তুলেছে। এককথায়, মানুষের জীবনের যে দাম আছে, কাজের যে মূল্য আছে এবং কাজ করার মাধ্যমে মানুষ যে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে, এই উপলব্ধিটি সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এই সমস্ত নতুন চিন্তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অচলায়তনের দেয়ালগুলোতে অনেক ফাঁকফোকর সৃষ্টি করে ফেলেছে। এনজিওদের কাজকর্মের ফলে প্রগতিশীল রাজনীতির কর্মকাণ্ড অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। একথা সত্য, কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে সেই জিনিসটি স্পর্শ করব না।

এনজিওরা যতক্ষণ যাবত ক্ষুদ্র থাকে তাদের ভূমিকা থাকে আন্দোলনের মত। তাদেরকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়, মানুষের জীবনের মূল্য এবং মর্যাদাবোধের ব্যাপারে সজাগ করতে হয় এবং জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বোধগুলো দরিদ্র মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হয়। এই সমস্ত জিনিস দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বোধে এবং উপলব্ধিতে এমন একটা গুণগত পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যায়, যা সনাতন সমাজকাঠামোকে একটা নতুন ধরনের সংঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে। আমরা এই এনজিও বিষয়ক রচনাটির প্রথমে বলেছিলাম এনজিওদের কাজকর্মের একাধিক স্তর আছে। প্রাথমিক স্তরে এনজিও যখন ক্ষুদ্র থাকে তারা এক একটি আন্দোলনের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের সমস্ত উদ্যম এবং উদ্যোগ গ্রামীণ সমাজে গতিশীলতা সৃষ্টির কাজেই ব্যয় করা হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র এনজিওগুলো যখন বিদেশ থেকে বেশি পরিমাণ টাকা পেতে থাকে, তাদের আকার বাড়তে থাকে, তারা সেই প্রগতিশীল ভূমিকাটি পালন করতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের ভেতর এক ধরনের রক্ষণশীলতার শিকার হয়ে পড়ে এবং এনজিও কর্মকাণ্ড নিছক একটা রুটিনের বিষয় হয়ে পড়ে এবং এনজিও কর্মকাণ্ড নিছক একটা রুটিনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় প্রজেক্ট নেয়া, টাকা আনা, কর্মসূচি তৈরি করা এগুলোই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কাজকর্মে সেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিটি আর থাকে না। নিজেরাই একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শহর এবং গ্রামের যে ক্ষমতা কাঠামোটি টিকে রয়েছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

আমরা এই এনজিও বিষয়ক লেখাটিতে একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। একজন ধনী ব্যবসায়ী যেভাবে মূলধন নিয়োগ করে, শ্রমিক খাটায়, পণ্য উৎপাদন করে এবং পন্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে, বেশ কিছুদিন থেকে বৃহৎ এনজিওসমূহের অনেকটি সেভাবে মূলধন নিয়োগ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছে। ওই রচনাটিতে আমরা এই জিনিসটিও দেখিয়েছিলাম জাতীয়ভাবে যে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করছে তাতে ধনীদের কর দিতে হয়, শ্রমিক ধর্মঘটের সম্মুখীন হতে হয় এবং এক প্রস্থ বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু এনজিওদের ট্যাক্স দিতে হয় না, শ্রমিক ধর্মঘটের মোকাবেলা করতে হয় না, সেবাকর্মে নিয়োজিত রয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে জাতীয় ধনীদের মত তাদের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় না। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জাতীয় ধনতন্ত্রের সমান্তরাল আর একটি এনজিও নির্ভর ধনতন্ত্র আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করছে। জাতীয় ধনিকেরা যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পরিচিত সবগুলো পন্থা অনুসরণ করে, হালফিল বৃহৎ এনজিওসমূহ রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদের অধিকার কায়েমের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিছুদূর পর্যন্ত অধিকার এই সময়ের মধ্যে তারা আদায়ও করে ফেলেছে। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী

সংস্থাসমূহ তাদের এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বৃহৎ এনজিওসমূহকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে ছোট-বড়, দেশীয় এবং বিদেশি মিলিয়ে কত এনজিও রয়েছে তার সঠিক সংখ্যাটি আমাদের জানা নেই। তারপরেও আমরা একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বাংলাদেশে এনজিও খাতে যত টাকা আসছে তার শতকরা ৮০ ভাগ টাকা বৃহৎ এনজিওদের নামেই আসছে। এই বৃহৎ এনজিওরা যারা এই বিপুল পরিমাণ অর্থ এনে একদিকে দাতা দেশগুলোকে ফাঁকি দিচ্ছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে আমাদের দেশের মানুষকেও প্রতারিত করছে। টাকা আনার সময় দাতা দেশ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে তারা অঙ্গীকার করে থাকে বাংলাদেশের ব্যাপক অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যেই এই অর্থ আমরা দান এবং অনুদান হিসাবে গ্রহণ করছি। কিন্তু সেই অর্থ যখন তাদের হাতে আসে তারা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সমান্তরাল ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকে। জাতীয় ধনতন্ত্রের সমান্তরাল একটি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পরে তারা মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রযন্ত্রটির মধ্যে তাদের অধিকার কায়েম করতে চেষ্টা করে আসছে এবং এই সময়ের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রের উপর তাদের দখলদারিত্ব অর্জন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা দখল করা এবং ক্ষমতায় থাকার জন্যে যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে থাকে তাদেরকেও একই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে। উনিশ শ' ছিয়াশি সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখা গেল এই বৃহৎ এনজিওসমূহের প্রতিষ্ঠান এডাবের প্রভাবশালী সদস্যসমূহের একটা বিরাট অংশ জাতীয় ধনিক এবং আমলাদের সাথে মিলেমিশে সরকার পরিবর্তনের কাজে অংশগ্রহণ করছে। তাদের আন্দোলনের ফলে বিএনপি সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে নির্বাচন করতে হল এবং নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতে হল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের সমর্থকদের যে অনুগ্রহ বণ্টন শুরু করল তার থেকে এই বৃহৎ এনজিওসমূহের প্রতিনিধিরাও বাদ পড়েননি। একটি অনাচারী সরকারের বিরোধিতা করার মধ্যে দোষের কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু কথা হল, সে সরকারের অংশে পরিণত হওয়া সত্যি সত্যিই দোষের। বিএনপি সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে আমলা জাতীয় ধনিকদের একাংশ এবং এনজিওরা মিলে ক্ষমতা দখলের যে 'Made Easy' তৈরি করেছে বিএনপিও আগামীতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উত্থান-পতনে বড় এনজিওগুলো অংশগ্রহণ করছে। তার বড় একটা কারণ এই যে, ইতোমধ্যেই তারা একটি সমান্তরাল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সার্থকভাবে চালু করে ফেলতে পেরেছে।

রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশীদার হয়ে ওঠার কারণে বড় এনজিওসমূহের কর্মসূচিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ, অনগ্রসর জনসম্পদকে সামনে টেনে আনা, দরিদ্র জনসমাজে অধিকার

রক্ষা এগুলো আর অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। অথচ, তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকারের নামে বিদেশ থেকে টাকা আনছে এবং সেই টাকার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এখানে এক একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করছে। এনজিওসমূহের মুখ্য যে লক্ষ্য অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাকার বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়ছে। বাস্তবে যা ঘটছে সেটা হল এরকম দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর নামে বাইরে থেকে অর্থ এনে সেটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণের কাজে ব্যবহার করছে। তারা নানারকম গালভরা মুখরোচক বুলি শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করছে বটে, আসলে তাদের কাজকর্ম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপক্ষেই যাচ্ছে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র এনজিওদের যদি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেদের সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্যকোন পথ নেই। বৃহৎ এনজিও এবং ক্ষুদ্র এনজিওদের স্বার্থ এখন আর এক নয়। বৃহৎ এনজিওসমূহ দেশের বিরাজমান ধনতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ করে ফেলেছে। রাষ্ট্রের উপর চাপ প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের পথ থেকে তাদের সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। বৃহৎ ধনীদের মত তারাও শ্রমিক শোষণ করে এবং মুনাফা অর্জন করে। তফাৎ হল ধনিকদের ট্যাক্স দিতে হয়। শ্রমিক ঝামেলা মেটাতে হয়। বৃহৎ এনজিওদের এসব কিছুই করতে হয় না।

এ রচনার শুরুতেই আমরা বলতে চেষ্টা করেছি এনজিওরা তখনই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকারে আসতে পারে যতক্ষণ তারা আন্দোলনকারীর ভূমিকা পালন করে। তাদের যদি পুঁজিবাদীর ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে তাদের সে পথ থেকে সরে আসতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়ানো অসংখ্য ক্ষুদ্র এনজিও এই আন্দোলনকারীর ভূমিকাই পালন করছে। তারা নতুন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছে এবং নতুন একটি সামাজিক পুনর্গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি জনসমাজের মধ্যে বিকশিত করতে চাইছে। বড় এনজিওগুলোর সাথে অর্থশক্তি, জনশক্তি এবং সংগঠনশক্তির বিচারে তুলনা করলে তাদের অবস্থান প্রান্তিকতার স্তর অতিক্রম করতে পারে না। বড় এনজিওগুলো চাপ এবং প্রভাব বলয়ের ভেতরে এই ক্ষুদ্র এনজিওদের অবস্থানের কারণে তাদের চিন্তাধারা এবং শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ ক্রিয়াশীল হতে পারে না। এখন সময় এসেছে ক্ষুদ্র এনজিওসমূহকে এই সকল বিষয় অত্যন্ত খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে। একজোট হয়ে বড় এনজিওদের বিরুদ্ধে তারা যদি একটা চ্যালেঞ্জ রচনা না করতে পারে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। বৃহৎ এনজিওসমূহ তাদের হাতে কোন অর্থ আসতে দেবে না। অর্থ ছাড়া ছোট এনজিওদের টিকে থাকা অসম্ভব।

ক্ষুদ্র এনজিওগুলো একজোট হয়ে যদি এগিয়ে না আসে তাহলে বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে ফেলে, বৃহৎ এনজিওসমূহ তেমনি ক্ষুদ্র এনজিওদের গিলে ফেলবে। বৃহৎ এনজিওদের প্রতিষ্ঠান এডাব আসলে বৃহৎ এনজিওদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে, অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে এবং দেশের বাইরে বিশেষ করে

দাতা প্রতিষ্ঠান এবং দেশসমূহের কাছে প্রচার করে থাকে তারাই বাংলাদেশের সমস্ত এনজিওর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। এটা সত্য নয়। তারা বড় এনজিওদেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র এনজিও এডাবের সদস্যপদ লাভ করেছে তাদের মতামতের বিশেষ দাম নেই। বৃহৎ এনজিওসমূহ তাদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষুদ্র এনজিওসমূহের ওপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ক্ষুদ্র এনজিওসমূহ একজোট হয়ে সরকার এবং দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের চোখে আঙুল দিয়ে যদি দেখিয়ে দিতে না পারে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপকারের সবরকম কার্যকারিতা বৃহৎ এনজিওসমূহ হারিয়ে ফেলবে। তখন ক্ষুদ্র এনজিওর অস্তিত্ব রক্ষা করা সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে।

ক্ষুদ্র এনজিওসমূহের এডাবের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের একটা শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করানো ছাড়া অন্যকোন বিকল্প নেই।

বাংলাবাজার পত্রিকা
২৩ অক্টোবর-৬ নভেম্বর, ১৯৯৬

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের আসল কাজ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

এক

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর জনগণ অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিবর্তন করে একটা আপসে আসতে বাধ্য হয়েছে। দেশকে একটি গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্বের দাবিদার কেউ যদি থাকে সে হল আমাদের জনগণ। জনগণ অবিচলিতভাবে শান্তির প্রতি আস্থা রাখতে পেরেছিল বলেই দেশটি আবার স্বাভাবিক অবস্থার মুখ দেখতে পারছে।

অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার পর থেকে খালেদা জিয়ার ক্ষমতা ত্যাগ পর্যন্ত সময়ে যে সকল কাণ্ড ঘটে গেল, সেটাকে একটা যুদ্ধ ছাড়া আর কি বলব। ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের জনগণের উপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রাণহানির ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান করার কোন প্রশ্নই উঠে না। অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে পত্রপত্রিকায় নগদ টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। অবশ্য এই হিসাবের হেরফের আছে। প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ কত এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

খুব সহজভাবে বলতে গেলে জানমালের ওপর এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি যে হল তার জন্যে অবশ্যই বড় দলগুলোকে দায়ী করতে হবে। শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে ক্ষমতা ছাড়তে হল এবং বিরোধী দলগুলোকে ৬ষ্ঠ সংসদ কবুল করতে এবং এই সংসদে পাস করানো কেয়ারটেকার সরকারের বিলকে মেনে নিতে হল।

এই ধরনের একটি আপস কি আগে আদৌ করা যেত না? আমাদের জনগণের অপরাধ কি এতই অধিক যে, তাদেরকে এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হল। এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দেবে না।

আমাদের রাজনীতিতে যে সন্ত্রাস, যে প্রতিহিংসার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার কারণ আমাদের দেশের যারা প্রকৃত মালিক, সেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলমান রাজনীতির মূল প্রোথিত নয়। অনেকে বড় দলগুলোকে বুর্জোয়া দল বলে থাকেন।

আমি এই ধরনের কোন পরিভাষা ব্যবহার করার পক্ষপাতী নই। আমি বলব, এই মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গণবিচ্ছিন্নতায় তাদেরকে লোভী, সন্ত্রাসী, ক্ষমতালিপ্সু এবং সব রকমের মানবিক মূল্যবোধহীন ঠ্যাঙ্গারে সংগঠনে পরিণত করেছে। আমাদের রাজনীতিতে যে অস্থিতিশীলতা, যে প্রতিহিংসা চালু রয়েছে তার মূল কারণ দেশের কৃষক জনগোষ্ঠীর হাতে রাজনীতির কোন কর্তৃত্ব নেই। কৃষক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কারণেই শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কৃষক জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপ্তিতে, গভীরতায় এবং তাৎপর্যে অসামান্য মহিমা অর্জন করতে পেরেছিল। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান এই দেশের শতকরা ৮৫ জন মানুষ কৃষি কাজ করে জীবন ধারণ করে। এই কৃষকদের বাদ দিয়ে এই দেশটায় কোন কল্যাণমূলক রাজনীতি জন্ম নিতে পারে না।

এই মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কৃষক সমাজের প্রতি কোন অঙ্গীকার নেই এবং তাদের প্রতি কোন কর্তব্য আছে এই কথা স্বীকার করে না। দেশের জনগণকে বাদ দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করার এই যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল বিপত্তির উৎস। অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের যে যজ্ঞটা ঘটে গেল তার ব্যাখ্যাও এই জনবিচ্ছিন্ন মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনীতির মধ্যে সন্ধান করতে হবে।

দুই

পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কলামের জন্যে ভূমিকাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আমরা সেই জনগণের আশার কথাতে আবার ফিরে আসি। জনগণের আশাবাদই গোটা দেশকে বৃহত্তর একটা বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে এবং জনগণ মনে করছে, তারা বিজয়ী হয়েছে। কথাটা সত্য, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এমেকা, স্যার নিনিয়ান, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরিলসহ কতজন মধ্যস্থতা করতে এলেন এবং মধ্যস্থতা করতে যেয়ে সঙ্কটকে জটিল থেকে জটিলতর করেছেন। কিন্তু আমাদের জনগণ প্রমাণ করল তারাই সঙ্কট সমাধানের প্রকৃত নায়ক। তাদের শান্তির প্রতি অবিচলিত আস্থা এবং অঙ্গীকারের কাছে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলোর রণহুংকার পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতিতে যে রক্তপাত ঘটেছে, সেটা কাটিয়ে উঠতে অনেক বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। বিদেশে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাবমূর্তি যেভাবে মার খেয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করাও অনেক কষ্টের ব্যাপার। তথাপি আমাদের জনগণ মনে করছে, এখনো আশা আছে, এখনো সবকিছু ফুরিয়ে যায়নি।

আমাদের জনগণ বিরাজমান দুই রাজনীতিক শিবিরের রোষ, প্রতিহিংসা অনেক পরিমাণে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে— এই কথা সত্য। কিন্তু তারপরেও একটা কথা

থেকে যায়, জনগণ তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশটিকে গৃহযুদ্ধের প্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু তারা সমাজের সর্বস্তরে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেটা অনেকটা দুরাশার মত শোনাবে। কারণ যে মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো গত দু' বছর ধরে দেশটাকে একটি নরকে পরিণত করেছিল এখনও রাজনীতির মাঠে তারাই সক্রিয় রয়েছে। আগামী যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে সন্ত্রাস এবং কালো টাকা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে সেই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাজার আইন করা হোক, হাজার নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক, যে গণবিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইবে তাদের সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প পন্থা নেই।

বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো কৃষকের, শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গোটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডটাকে তাদের এখতিয়ারের বিষয় বলে মনে করছে— এটা এক রকমের সন্ত্রাস। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চেহারা অর্জন করতে হলে সেই রাজনীতিকে অবশ্যই নির্যাতিত জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অভিমুখী যাত্রা শুরু করতে হবে। এই মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে তার কি কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?

তিন

বিচারপতি হাবিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে পত্রপত্রিকাসমূহে নানা রকম পরামর্শ এবং দাবি তুলে ধরা হচ্ছে। কেউ কেউ তোষামোদমূলক নানাকথাও লিখছেন। কোন কাগজে, নাম মনে আসছে না, একজন কলাম লেখক বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে দার্শনিক শাসক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। হাবিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার চাক্ষুস পরিচয় নেই। একবার টেলিফোনে তার একটি বই নিয়ে আড়াই মিনিটের মত কথা হয়েছিল। তিনি আসলে দার্শনিক কি-না, যদি দার্শনিক হয়ে থাকেন তার দর্শনের পদ্ধতিটা কি, সেটাও আমার জানা নেই। দার্শনিক শাসকের প্রতি সাধারণ লোকের একটা দুর্বলতা অবশ্যই রয়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে দার্শনিক শাসক রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড এমন একটি নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে করেন, যেখানে সুবিচারের বোধটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু যে কোন শাসককে দার্শনিক আখ্যা দিয়ে প্রশস্তি রচনা করলে একটা মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। বর্তমান বাংলাদেশের যে বাস্তব পরিস্থিতি তাতে প্রধান প্রশাসকের দর্শনচর্চার অবকাশ সামান্যই আছে বলে আমার ধারণা। হাবিবুর রহমান যদি দার্শনিক হয়েও থাকেন তার কাছে আমি একটা আর্জি পেশ করব— এই মুহূর্তে আপনি দর্শনচর্চাটা বাদ দিয়ে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিন। অনেকে আপনার কাছে অনেক কিছু দাবিও করছেন। সব প্রত্যাশা, সব দাবি পূরণ করা আপনার কাজ নয়। দেশটিকে যদি

আপনি গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে আসতে পারেন, সেটাই হওয়া উচিত আপনার ভাবনার বিষয়। আপনি অসম্ভব কিছু করতে পারবেন না। যা সম্ভব তা করতে চেষ্টা করুন। একটি নির্বাচনের আয়োজন করুন। সৎ লোকেরা যাতে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে, সেরকম একটা নীতিমালা প্রণয়ন করুন। কালো টাকার মালিক এবং পেশীশক্তি বিলাসী লোকেরা আবার যাতে এই দেশটির ভাগ্যবিধাতা হয়ে না বসে সেরকম একটি আইনগত কাঠামো তৈরি করুন। দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে তার বিরুদ্ধে আপনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমাদের স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিন। আপনি অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে একটি ভঙ্গুর অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের মাধ্যমে আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, আপনার কোন ভাল কাজ যদি তাদের দলীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় আপনাকে ঠেলে ফেলে দেয়ার জন্যে আন্দোলন শুরু করবে। কেয়ারটেকার সরকারের কেয়ারটেক করার জন্যে আরো একটি সরকার দাবি করা হতে পারে।

আমরা একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, আপনি যদি জাতির জন্যে কোন ভাল কাজ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও সরাসরি দেশের জনগণের কাছে আবেদন করুন। প্রাথমিকভাবে আপনাকে আস্থা রাখতে হবে দেশের জনগণের প্রতি। এই জনগণ দেশটিকে রাজনৈতিক দলগুলোর শুরু করা গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছে। তাদেরকে যদি আপনি আপনার ভাল কাজের পক্ষে টানতে না পারেন আপনি অধিক কিছু করতে পারবেন এমন মনে হয় না। একমাত্র জনগণের আস্থা আপনার হাতকে শক্তিশালী করতে পারে। মনে রাখবেন আপনার আয়ু মাত্র তিন মাস। প্রায় দু'সপ্তাহ অতীত হতে চলল, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা মূল্যবান। আপনার সরকারকে যদি ঠেলে ফেলে দেয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায় সেটি হবে এই জনগণ এবং এই দেশটির সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য।

বাংলাবাজার পত্রিকা
১২ এপ্রিল, ১৯৯৬

ফারাক্কা ও কল্পনা চাকমা প্রসঙ্গে

এক

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র সচিক জনাব সালমান হায়দার আজ ঢাকা আসছেন। পত্রপত্রিকাগুলো জানিয়েছে, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। সালমান হায়দার যে সব দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, তাতে ফারাক্কার প্রশ্নটি অগ্রাধিকার পাবে এটা সকলে একরকম ধরে নিয়েছেন। শেখ হাসিনার সরকারের তরফ থেকে এ-ও জানানো হয়েছে, ফারাক্কা প্রশ্নে একটি জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করার জন্যে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের নানা দলের এবং মতের লোকদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক প্রয়োজন হলে ডাকবেন। এগুলো আশার কথা। ভারতবর্ষ যারা শাসন করেন, অন্তত তাদের একাংশ বোধকরি এতদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, গঙ্গার পানি বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার জীবন-মরণের ব্যাপার। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সকল বিতর্কিত বিষয় দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আড়ষ্ট জটিল এবং কন্টাকাকীর্ণ করে তোলেছে, ফারাক্কার পানির হিস্যা তার মধ্যে সর্বপ্রধান। দু' দেশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পানি ভাগাভাগির বিষয়টা যদি সমাধান করতে পারে, তাহলে দু' দেশের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার পথ অনেকখানি প্রসারিত হবে। দু' প্রতিবেশীর একজন যদি অপরজনের সংকটটা অনুভব করতে পারে, তাহলে সমাধানের একটা পথ অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।

বিগত প্রায় দু' যুগ ধরে ফারাক্কার প্রশ্নে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছে, তার প্রধান কারণ দু' দেশের মধ্যবর্তী একটা বিবদমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রাজনৈতিকভাবে এই সংকটের সমাধান করা না গেলে অন্যকোন পন্থা অবলম্বন করে সমাধান পাওয়া যাবে না। বর্তমানে ভারতবর্ষে একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নতুন সরকার প্রতিবেশীর সঙ্গে আচরণের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যে গ্রহণ করেছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের যেই সরকারটি এখন ক্ষমতায় আছে তারাও অহেতুক ভারতবিদ্বেষকে পুঁজি করে ক্ষমতায় আসেনি। সুতরাং এটা খুবই আশা করা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারটির প্রতি পূর্বের যে-কোন সরকারের তুলনায় ভারতের বর্তমান

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ অনেকখানি নমনীয় এবং সহনশীল হবে। এটা আশা করা অন্যায় হবে না, ভারতের বর্তমান শাসকদের অন্তত একটা বড় অংশ বাংলাদেশের পানির হিস্যার ন্যায্যতা মেনে নেয়ার একটি মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

দু'টি প্রতিবেশী দেশ পরস্পরের প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন হোক না কেন, কাজের বেলায় নিজের স্বার্থের প্রশ্নে কখনো অনড় অবস্থানটি ছাড়তে রাজি হয় না। বর্তমানে ফারাক্কা সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্যে আলাপ-আলোচনার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো দু'দেশের নেতৃবৃন্দের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ যদি বাংলাদেশের দাবির বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে, তাহলে তারা আমাদের প্রয়োজনীয় পানি দেবার তাগিদটি ভেতর থেকে অনুভব করবেন।

কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। এই পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার অবস্থান থেকে একচুলও নড়েনি। তারা দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার নামে ফারাক্কার সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যুক্ত করার জন্যে চাপাচাপি করে আসছে। যেমন— ভারতবর্ষ কিছু পরিমাণ পানি দেবে। তার বদলে ভারতবর্ষকে আমাদের বন্দর এবং রেলওয়ে ট্রানজিটের সুবিধা দিতে হবে। বেশ কিছুদিন থেকে একটি মহল বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় এই ধারণাটি প্রচার করে আসছে। তাদের মোক্ষম যুক্তি হল, ভারতবর্ষ একটা বড় দেশ। আমাদের যদি ফারাক্কার পানি আনতে হয়, তাহলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে হবে। গোয়ার্তুমি করে একটা অনড় অবস্থান নিয়ে বসলে ভারতবর্ষ আমাদের পানি দেবে না। আমরা বিশ্বময় হৈচৈ করতে পারি। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে না। এই পর্যন্ত দু'বার ফারাক্কা বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বসম্প্রদায় বাংলাদেশের দাবির প্রশ্নে খুব একটা সমর্থন ব্যক্ত করেছেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তার কোন বিকল্প নেই। গঙ্গার পানি আমাদের যেমন প্রয়োজন, ভারতেরও সে রকম প্রয়োজন। দু' দেশ পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে আপোসে গঙ্গার পানি বন্টনের একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা উদ্ভাবন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস থাকলে অনেক সঠিক কাজও সহজ হয়ে আসে। বর্তমানে সেরকম একটি সময় এসেছে। ভারতবর্ষ নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যে কথা বলতে এসেছে তার মধ্যেই এই প্রমাণ মেলে। আমরা আশা করব, ফারাক্কার বিষয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দু' দেশের রাষ্ট্রনায়করা উদ্ভাবন করে পারস্পারিক সদিচ্ছার পরিচয় রাখবে।

এই ধরনের একটি বলিষ্ঠ আশাবাদ ব্যক্ত করার পরেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের কিছু কথা বলার আছে। প্রথম কথাটি হল, ফারাক্কার বিষয়টিকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। কারণ, ভারত একরতফাভাবে গঙ্গার

পানি প্রত্যাহার করে আসছে। কাজটি যে উচিত হয়নি, এই কথা তারা অনুভব করে না, এমন নয়। আগের সরকারগুলোকে ভারতের বিগত সরকারগুলো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। তার নানা কারণও ছিলো। অনেকেই মনে করেন, গঙ্গার পানি উজানে প্রত্যাহার করে নিয়ে ভারতীয় সরকারগুলো বাংলাদেশের সরকারসমূহকে একটা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এখন ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আসার কথা। বাংলাদেশের অসহায় জনগণ ভারতের কাছ থেকে শাস্তি পাবার পাত্র হতে পারে না— এই বিষয়টি হয়ত তারাও ধর্তব্যের মধ্যে এনে থাকবে। সুতরাং ফারাক্কার বিষয়টি এককভাবে দু' দেশের আলোচনার ব্যাপার হয়ে উঠার পক্ষে কোন বাধা নেই বলেই আমরা মনে করি। ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী সরকারগুলো রেলওয়ে ট্রানজিট, বন্দর সুবিধা এই সমস্ত ইস্যুর সঙ্গে ফারাক্কাকে একটা প্যাকেজ আলোচনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের মানুষ ফারাক্কার সঙ্গে অন্য সমস্ত দ্বি-পাক্ষিক ইস্যুকে মিলিয়ে এক করে দেখা কোনভাবেই মেনে নিতে পারবে না। এই বিষয়টি শুরুতেই পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। দু'টো দেশের মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য এবং বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তাহলে অনেক কিছুই একসঙ্গে করা সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি, সেই সময় এখনও আসেনি। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র দেশ। তার রয়েছে একটি নাজুক অর্থনীতি। ভারতের সঙ্গে যেমন বাংলাদেশকে অনেক বিষয়ে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। তেমনি বাংলাদেশকে তার একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি করার জন্যেও সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছাড়া কোন জাতি তার অবস্থান কিছুতেই সংহত করতে পারে না। ভারত পৃথিবীতে নবম শিল্পোন্নত রাষ্ট্র। তার ক্রমপ্রসারমান অর্থনীতির চাপ ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশগুলোর পায়েও যে লাগছে না এমন নয়। আজকে যদি ফারাক্কার পানি বণ্টনের সঙ্গে রেলওয়ে ট্রানজিট, বন্দর সুবিধা এগুলোকে এক প্যাকেজের আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলা হয়— স্বভাবতই বাংলাদেশের জনগণের আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠার কথা। দুর্বলের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আতংকিত হয়ে ওঠার ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে কোন বিপদ নেই, সেখানেও সে বিপদের আশংকা করে। বাংলাদেশ যদি ফারাক্কার পানির বদলে ট্রানজিট এবং বন্দর সুবিধা ভারতকে প্রদান করে, তাহলে তার আতংকিত হয়ে ওঠার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বিভাগপূর্ব আমলে এই অঞ্চল ছিল ভারতীয় অর্থনীতির হিন্টারল্যান্ড অর্থাৎ পশ্চাদভূমি। আজকে যদি আমরা ভারতকে আপোসে বন্দর সুবিধা এবং রেলওয়ে ট্রানজিট ইত্যাদি দিয়ে বসি শিল্পোন্নত ভারতের অর্থনীতি আমাদের নাজুক অর্থনীতির ওপর চাপ প্রয়োগ করে এই অঞ্চল আবারো ভারতের হিন্টারল্যান্ডে যে পরিণত করবে না সেই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় এই বিষয়টি সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব-সম্প্রীতি উত্তম জিনিস। কিন্তু নিজের স্বার্থটা রক্ষা করা আরো উত্তম।

দুই

নির্বাচনের আগের দিন পার্বত্যচট্টগ্রাম থেকে কতিপয় চাকমা ছাত্রসহ কল্পনা চাকমাকে আটক করা হয়েছিল। অন্যদের পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কল্পনার কোন খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী এবং পার্বত্যচট্টগ্রামের জনসংহতি পরিষদ কল্পনাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে। পার্বত্যচট্টগ্রাম ছাড়াও উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীরা ঢাকায় পথসভা করে তাদের ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করেছে এবং বলেছে, কল্পনাকে ছেড়ে দাও।

এই পর্যন্ত কল্পনা চাকমাকে কোন আদালতে সোপর্দ করা হয়নি। তাকে কারা নিয়েছে, কেন নিয়েছে, তার অপরাধ কী— এইসব কিছুই জানানো হচ্ছে না। এরকম একটি ঘটনা আমাদের দেশে ঘটেছে। সেটা আমাদের সকলের জন্যে লজ্জা, দুঃখ এবং ক্ষোভের ব্যাপার। পার্বত্যচট্টগ্রামের অত্যাচার-নির্যাতনের কথা আমি এই রচনায় উত্থাপন করব না। তার জন্য একটি বড়সড় লেখা লিখে পুরো পটভূমিটি ব্যাখ্যা করতে হবে। পার্বত্যচট্টগ্রামে যা ঘটছে, আমরা কেউ তার নীরব দর্শক থাকতে পারি না। আমাদের অবশ্যই কিছু একটা করা প্রয়োজন। উপস্থিত মুহূর্তে আমি কল্পনা চাকমার মুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে তোলে ধরতে চাই।

একটি অসহায় মেয়েকে যদি কোন অপরাধও থাকে— এইভাবে বিনা বিচারে এতদিন আটকে রাখা ভয়ঙ্কর অন্যায়। তারও চাইতে বড় অন্যায় হল, কল্পনাকে কোন আদালতে সোপর্দ করা হয়নি, তার অপরাধ কী শনাক্ত করা হয়নি। কল্পনা কোথায় আছে, তাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে— এতদিন তার পরিবার পরিজনের কাছে তার কোন সংবাদ কেন জানানো হল না কর্তৃপক্ষকে তার একটি কৈফিয়ত অবশ্যই দিতে হবে। আমরা সকলেই চাই, পার্বত্যচট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক, একটা সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হোক। কিন্তু কল্পনাকে আটক রাখা সেই সম্ভাবনাটা আরো দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এটা কোন সভ্য মানুষ মেনে নিতে পারে না।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৯৯৬

সেই কুয়াশা সর্বনেশে

এই কথাগুলো আমি সবসময় সকলের কাছে বলে আসছি। মৌলবাদ বলতে আমি সেই জিনিসটাই বুঝি যা অতীতকে আগামীর পথে স্থাপন করতে চায়। অর্থাৎ মানুষ সব সময়ে সামনে যায়। সঠিক প্রেক্ষিতটা তার সামনে স্পষ্ট নয় বলেই সে অতীতটাকে টেনে আনতে চায়। একটা উদাহরণ দেই। রোমের পোপ এবং পুরুততন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং বললেন, এই পোপতন্ত্রের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। সুতরাং চলুন আমরা সেই নাযারেথের যিশুর সরল-সহজ ধর্মটি সকলে মিলে পালন করি। মার্টিন লুথার ব্যাখ্যা করলেন তিনি অতীতকে নতুন করে জীবন্ত করছেন। কিন্তু আসলে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন এক নতুন ধর্মমত।

একই জিনিস ইসলামেও ঘটেছে। ওয়াহাবিদের নেতা আবদুল ওয়াহাব বললেন, হযরত মুহম্মদের ধর্ম এখন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এতে ইসলামের মৌলিক রূপটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং চলুন এই প্রাণহীন অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান ঝেঁটিয়ে বিদায় করে আমরা ইসলামের সেই সহজ-সরল নিরাভরণ রূপটি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আবদুল ওয়াহাব ইসলামের সেই নিরাভরণ সৌন্দর্য ফেরত আনতে যেয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করলেন একথা বলব না, তিনি একটি নতুন সম্প্রদায় গঠন করলেন।

বেশিদিনের কথা নয়। উনিশ শতকের হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি আলোকিত অংশ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শে সঞ্জীবিতবোধ করে তাদের নিজেদের জন্যে একটি নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন। আর সেটি হচ্ছে প্রাচীন ভারতকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হবে। প্রাচীন ভারতকে কতটুকু আবিষ্কার করলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল তারা একটি নতুন সামাজিক দিকদর্শন খাড়া করলেন। আসলে একজন মানুষ যেমন তার মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে পারে না, একটি জাতিও তার অতীতে অবগাহন করতে পারে না। মানুষ সবসময় সামনে যায়। যখন সে মনে করছে সে অতীতকে ফিরিয়ে আনছে তখনো সে সামনে যাচ্ছে। কিন্তু অতীত ফিরে আসে না। এই সত্যটি দর্শনগতভাবে যারা মানে না তারাই হল মৌলবাদী।

মৌলবাদের নানান রকমফের রয়েছে। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ মৌলবাদী হয়, এটা সত্যি নয়। আরো অনেক ব্যাপারেই মানুষ মৌলবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন— মৌলবাদ সবকিছুকেই আশ্রয় করে নির্বিবাদে অবস্থান নিতে পারে।

অতীত থেকে আগামীর পথ, পথরেখা নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। মেধা, সততা এবং দৃঢ়চিত্ত মনোভাব— এইসব না থাকলে শুধু সদিচ্ছা দিয়ে মৌলবাদের প্রকোপ রোধ করা সম্ভব নয়। সঠিক পন্থা এবং পদ্ধতি অনুসরণ না করলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, অনেক সময় আগুনে আঘাত করে যেমন আগুনের তেজ বাড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি মৌলবাদকে আক্রমণ করে মৌলবাদী শক্তির বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া হয়।

আমাদের দেশে এই জিনিসটিই ঘটছে। যারা বিশ্বাসের দিকে মৌলবাদী এবং ঘোষিতভাবে মৌলবাদের প্রতি সমর্থন জানায় তারা শতকরা ১০০ ভাগ মৌলবাদী। আমাদের দেশে যারা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মী বলে নিজেদের দাবি করেন ফিতে দিয়ে মাপতে গেলে দেখা যাবে কেউ শতকরা বিশ ভাগ প্রগতিশীল, কেউ শতকরা তিরিশ ভাগ— শতাংশ কষে লাভ নেই, ব্যাপারটি এরকম। মৌলবাদকে প্রতিরোধ করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল মানুষকে সঠিকভাবে চিন্তা করতে শেখানো। মানুষ সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারলে মৌলবাদ পরাজিত হতে বাধ্য।

কিন্তু আমাদের দেশের যেসকল পত্রপত্রিকা দাবি করে থাকে আমরা মৌলবাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছি, তাদের আত্মপ্রসাদ অনুভব করার জন্যে তা যথেষ্ট। কিন্তু তারা মৌলবাদকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে এটা নিজেরাও হয়ত ভাল করে বোঝে না।

একটা জাতির আকাঙ্ক্ষা তার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। সমুদ্রের জলে যেমন লবণ থাকে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যদি প্রগতিশীলতার লবণ না থাকে, যে ভঙ্গিতেই প্রচার করা হোক না কেন, আসলে সেগুলো মৌলবাদের সহায়ক ভূমিকাই পালন করে থাকে।

আমি উপরের কথাগুলো বললাম, আমাদের দেশের একটি পত্রিকা, যেটা মুক্তচিন্তার দৈনিক বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে, সেই কাগজের সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। একটু বিষয়টা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসে এবং সেটা বিব্রতকরও বটে। কিন্তু যেই জিনিসটা বলছি তার মধ্যে সামান্য মজাও আছে। কাগজটিতে গত দু' বছর থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একজন লেখককে উদ্দেশ্য করে লেখা পাঠকের চিঠি ছাপানো হয়ে আসছে। প্রথম প্রথম এই চিঠিগুলো পড়ে আমার ভাল লাগত। মনে করতাম, আমাদের পাঠকদের মধ্যে এমন একটা সচেতনতা জন্ম নিয়েছে, একজন লেখক যখন ভাল কিছু লেখেন তাতে উৎসাহিত করার সামাজিক দায়িত্বটি পালন করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই চিঠিগুলো ক্রমাগত পড়তে পড়তে আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাধে। একই ভাষা, একই ভঙ্গি, একই রকমের নির্জলা তারিফ— চিঠি পড়ে লেখক সাহেবের রচনাগুলো আমি পাঠ করতে আরম্ভ করি। তখনই আমার সন্দেহটা গাঢ়মূল হয়। চিঠি লেখকেরা বলছেন, এই

লেখকের লেখা অমৃত সমান। কিন্তু পাঠ করে আমার মুখটা খাট্টা হয়ে গেল। ওই পত্রলেখকদের প্রতিবাদ করে চার পাঁচটা পত্র ওই পত্রিকার অফিসে পাঠাই। অর্থাৎ আমিও একজন পত্রলেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপই বলতে হবে। আমি যত চিঠি প্রতিবাদ করে পাঠিয়েছি তার একটিও ছাপার যোগ্য মনে করেন না সম্পাদক সাহেব। আমি যে একজন বোকা আহাম্মক পত্রলেখক সেই জিনিসটি বুঝতে চার পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। শুরুতে বোঝা উচিত ছিল এই চিঠিগুলো পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা হয় এবং চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয়। এই জিনসটি যদি শুরুতে বুঝতে পারতাম সময় অপচয় হত না এবং ডাকখরচও বেঁচে যেত।

এই স্বঘোষিত প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো মৌলবাদের বিরুদ্ধে কী রকম পদ্ধতিতে মহান জেহাদটি করে যাচ্ছে তার একটিই নমুনা দিলাম।

আমাদের ডানে তো পাহাড়ের মত মৌলবাদ সটান দাঁড়িয়ে আছে এবং বামে যে জিনিসটি প্রগতিশীলতার ঢাক পিটাচ্ছে তার চরিত্রটা কী আমি ওই পত্রিকার লোকজনের সঙ্গে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে ওই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিলাম। বলেছিলাম, এ ধরনের চানাচুর মার্কা লেখকদের আপনারা সামাজিক হিরো হিসাবে প্রচার করেন কেন? একটা সহজ জবাব পেয়েছি— এখন মুক্তবাজারে যুগ, যা কিছু পাঠক খাবে— সত্য হোক মিথ্যা হোক, খাঁটি হোক নকল হোক আমাদের পরিবেশন করতে হবে। এর পরে তো আর কথা চলে না। তাদের প্রগতিশীলতা এরকমই।

এই তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকাসমূহ নানাভাবে তুচ্ছ জিনিসকে উচ্চে তুলে পরিবেশন করে আমাদের সংস্কৃতির যে ক্ষতি করছে, মৌলবাদী প্রচার যন্ত্রও সেরকম অতটা করছে না। মৌলবাদীরা আঁধার ছড়াচ্ছে, সেটা চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এরা যে কুয়াশা ছড়াচ্ছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একরকম অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই গানটির চার লাইন উদ্ধৃত করে লেখাটি শেষ করছি।

"ও আমার আঁধার আলো
আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে
আলোকে যে লুট করে খায়
সেই কুয়াশা সর্বনেশে ॥"

বাংলাবাজার পত্রিকা
২৫ জানুয়ারি, ১৯৯৬

রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন কিন্তু কিছু কথা আছে

প্রতিটি জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এমন কতিপয় গ্রন্থিচ্যুত সময়সন্ধি দেখা দেয় যখন জাতি নানান ধারায়, উপধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়সন্ধি যে কোন জাতির জন্যে একটা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে আসে। এরকম পরিস্থিতিতে জাতির মধ্যবর্তী অন্তর্বিরোধ এমন প্রবল, এমন বেগবান হয়ে ওঠে, যে কেউ কাউকে বুঝতে চায় না। যুক্তির জায়গা আবেগ, প্রতিযোগিতার স্থান প্রতিহিংসা দখল করে বসে। বর্তমান বাংলাদেশ সেরকম একটি সময়সন্ধি অতিক্রম করছে। বাংলাদেশে সরকারি এবং বিরোধীদলের মধ্যবর্তী সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং প্রতিহিংসার ভাবটি এতই অধিক, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালনা করার জন্যে সেটাকে কিছুতেই অনুকূল বলা যাবে না। একটা ভয়, একটা ত্রাস, একটা আতঙ্ক সরকার এবং বিরোধীদলের লোকদের মনোজগত এমনভাবে.আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তারা একে-অপরের সহযোগী এবং একে-অন্যের প্রতি যুক্তির ভাষা যে প্রয়োগ করতে সক্ষম সেই জিনিসটি একেবারেই অনুপস্থিত মনে হয়।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের মত একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়া একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সাহেবের প্রতি এই দেশের মানুষের আস্থা অপরিসীম। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মাত্র অল্প ক'দিন হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি এমন একটা হাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তাশীল মানুষ মনে করতে পারছেন আমাদের দেশের একটি আত্মা রয়েছে। সাহাবুদ্দিন সাহেব দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিন নেতার মাজার জিয়ারত করেছেন। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানে·' কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং আসার সময়ে জিয়াউর রহমানের মাজারেও ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন তিনি সন্তোষে গিয়ে মওলানা ভাসানীর মাজারও জিয়ারত করবেন। সাহাবুদ্দিন আহমদ সাহেব দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় কেউ কেউ রসিকতা করে মন্তব্য করেছিলেন, কবর জিয়ারত করে বেড়ানো ছাড়া তার আর কোন কাজ থাকবে না। সাহাবুদ্দিন আহমদ সত্যি সত্যি কবর জিয়ারত করে বেড়াচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই উপহাসপ্রিয় ভদ্রলোকদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা এই কবর জিয়ারতের বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাই। আমাদের জাতীয় রাজনীতির গতিমুখ

যতটা ভবিষ্যতের দিকে, তারও চাইতে বেশি অতীতমুখী। এখানে অধিকাংশ সময় চুপে চুপে অতীত এসে আগামীর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারপরেও সাহাবুদ্দিন আহমদের কবর জিয়ারতের বিষয়টির একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা আমরা দাঁড় করাতে চাই। কবর মানে তো অতীত এবং অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব হয়েছে। এ কবরগুলো আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একেকটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সমস্তটা অগৌরবের নয়, আবার সমস্তটা গৌরবেরও নয়। উজ্জ্বল প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত যেমন আছে তেমনি মসীলিপ্ত দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কলঙ্ক, গৌরব, ভাল-মন্দ সবটা মিলিয়েই ইতিহাস। এই ইতিহাসের দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকাতে পারা এটা কম সাহসের পরিচায়ক নয়। ব্যক্তি মানুষ নিজের ব্যাপারে যখন বিচার-বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, সেই জিনিসটির সঙ্গে সিংহ দর্শনের তুলনা করা যেতে পারে। সিংহের দিকে তাকালে যেমন অন্তরে আতঙ্কের উদ্রেক হয় তেমনি নিজের দিকে তাকানোও একটা আতঙ্কের ব্যাপার। এই কথা ব্যক্তির বেলায় যেমন তেমনি জাতির বেলায়ও সত্য। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মাজার জিয়ারত করেছেন তাদের রাষ্ট্রদর্শন এবং সমাজবোধ সর্বক্ষেত্রে এক নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তারা সকলে আমাদের জাতির ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের এই মাজার চর্চার মধ্যে একটা জিনিস মূর্ত হয়ে উঠেছে, তিনি আমাদের জাতির অন্তরাত্মা স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছেন। অনুভব করতে চাইছেন রাজনীতির প্রধান, অপ্রধান, চলিত এবং অচলিত আপাত বিবদমান এবং সংঘাতপূর্ণ ধারাসমূহের অন্তরালে একটা ঐক্যের বোধ কাজ করে যাচ্ছে। সেই বোধটিই হল এই জাতির আত্মা।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের গতিবিধির সুফল আমাদের সমাজে ইতোমধ্যে পড়তে আরম্ভ করেছে। এই ধরনের মাজার জিয়ারত অন্যকোন ব্যক্তি করলে মানুষ নানারকম ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করতে চেষ্টা করত। কিন্তু সাহাবুদ্দিন সাহেবের এ কাজ সকলে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন এবং মনে করছেন এটা তাঁর উপযুক্ত কাজ।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতার বাইরেও একটা রেষারেষির ভাব রয়েছে, সেটা এই জাতির সকলেই অনুভব করেছেন। তাঁরা পারতপক্ষে কেউ কারো ছায়া মাড়ান না। কিন্তু সাহাবুদ্দিন আহমদ যখন বলেন, তিনি প্রধনামন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করবেন; তার পক্ষে সেটা করা অসম্ভব হবে তা কেউ মনে করেন না। কেননা এই ভদ্রলোকটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে, তার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা শক্তিমত্তা নিহিত রয়েছে, গোলযোগপূর্ণ সময়েও তিনি প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে জাতিকে মঙ্গল এবং কল্যাণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন। এ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এরকম একজন বিরল ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আসন অধিকার করেছেন সেটা এই জাতির জন্যে অবশ্যই একটা শুভ সংবাদ।

দুই

সম্প্রতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ঘোষণা করেছেন কিছুদিনের জন্যে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত। একথা তার বদলে যদি অন্য কোন মানুষের মুখ থেকে বের হত প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেত। রাজপথে মিছিলের ঢল নামত। কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের মুখ থেকে ঘোষণাটি আসার পর যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিরোধী তাদেরও থমকে দাঁড়াতে হয়েছে এবং মাথা চুলকে চিন্তা করতে হচ্ছে, তিনি একথা বললেন কেন? তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও তিনি যে অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলেছেন এমন কথা কেউ অদ্যাবধি উচ্চারণ করেননি।

আমরা সাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত, কিছুদিনের জন্যে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে না দিলে এই জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যাবে। অনেকে বলছেন রাজনীতি ছাত্রদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হরণ করলে লাভের চাইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির নামে যে ধরনের খুনোখুনি এবং হিংস্র কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, তাদের কথা মেনে নিলে সেগুলোকেও মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এটা সকলেই জানেন, রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের রাজনীতির শিশু শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণাটিও অনেকে নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি। পত্রপত্রিকা, সভাসমিতিতে অনেকেই তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। সাধারণ ছাত্ররা এই ঘোষণায় মিছিল করে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই মিছিলকারী ছাত্রদের ওপর নানা ছাত্র সংগঠনের লোকেরা হামলা করেছে— এই সংবাদও পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত কিনা, এ নিয়ে সারাদেশে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, ছাত্ররা জাতির সবচাইতে সচেতন এবং অগ্রসর অংশ, তারা যদি রাজনীতি বিবর্জিত একটি পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে তাহলে দেশ এবং জাতির দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কোন ভূমিকাই পালন করতে পারবে না। একথা যারা বলছেন তাদের যুক্তির মধ্যে সত্য আছে, একথা মেনে নিয়েও খুব সম্ভবত এটা বলা যায়, এ পর্যন্ত ছাত্ররা নিজেদের অধিকারের চর্চা করতে গিয়ে এমন একটা অবস্থার জন্ম দিয়ে ফেলেছে যে, তারা তাদের ছাত্রত্বের পরিচয় টিকিয়ে রাখতে পারছে না। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেগুলো মাসের পর মাস বন্ধ থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে কবে বেরুবে তারা বলতে পারে না, তেমনি তাদের শিকক্ষক এবং পরিচালক সমাজও বলতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুনোখুনি, চাঁদাবাজি এমন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে,

শিক্ষকদের একাংশ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সমগ্র জাতির এই পরিস্থিতির অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তার ফল এই হয়েছে, দলে দলে ছাত্রছাত্রী স্নাতক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করার জন্যে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যাচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে ভারতে আমাদের প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করার জন্যে চলে গেছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। একটি অসমর্থিক হিসাবে প্রকাশ, বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পেছনে আমাদের দেশের অভিভাবকরা বছরে ৫শ' কোটি টাকা খরচ করে থাকেন। এসবের সবটাই বিদেশে চলে যায়।

এটা হল পরিস্থিতির মাত্র একটা দিক। পাশাপাশি আরো একটা চিত্র পাওয়া যাবে। রাজধানীর যত্রতত্র প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিচ্ছে। যে কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সরকারের শিক্ষা বিভাগে জমা দিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও খুলে বসতে পারেন। এ সময়ের মধ্যে প্রায় এক ডজন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় স্বীকার করে নিয়ে ভর্তিও হচ্ছে। পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে অনতিবিলম্বে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে, গরিব মানুষের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ একরকম বন্ধ হযে যাবে। এ সময়ের মধ্যেই শিক্ষা একটা কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষার ক্রয়মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাবে যে, সাধারণ আয়ের মা-বাবার পক্ষে ওই অর্থ ব্যয় করে উচ্চ শিক্ষা ক্রয় করা সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে।

আমরা যদি ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকারটা মেনে নিই তবে এই সমস্ত অনাচারকেও আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, দেশের বিরাজমান রাজনীতি থেকেই তার সবগুলোর উদ্ভব। অন্তত কিছুকাল ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে না দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতি আইন করে বন্ধ করার পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতি আইন করে বন্ধ করার পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতা এবং শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, সে বিষয়েও আমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকি। সেকথা একটু পরে আলোচনা করব।

যৌবন দিনে বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এবং তার স্ত্রী ডোরা রাসেল শিশুদের জন্যে একটা স্কুল করেছিলেন। বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে রাসেল সাহেব এবং তার স্ত্রী একপ্রস্থ নিয়ম-কানুন তৈরি করেছিলেন। সে সময়ে ব্রিটেনের কতিপয় অতি উৎসাহী মহিলা শিশুদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্যে স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা অত্যাবশ্যকীয় এই দাবিতে একটা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা রাসেল সাহেবের কাছে আবেদন রাখেন তিনি যেন তাদের নীতি মোতাবেক শিশুদের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। রাসেল সাহেব শিশু অধিকারের হোতা। মহিলাদের পাল্টা প্রশ্ন করলেন, শিশুদের সব বিষয়ে স্বাধীনতা মেনে নেয়া উচিত?

ধরুন, তর্কের খাতিরে এ বিষয়টি আমি মেনে নিলাম। কিন্তু শিশুরা যদি সকলে স্বাধীনভাবে আলপিন খেতে চায় তখন আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত বলে আপনারা মনে করেন? রাসেলের উল্টো মন্তব্য শুনে ভদ্রমহিলারা চটে আগুন। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, রাসেল সাহেব সব বিষয়ে খারাপ যুক্তি দেওয়ার প্রতিভা এত অধিক যে, কোন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে সম্মান বাঁচিয়ে তর্ক করতে রাজি হবেন না। ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকারটি এখন আলপিন ভক্ষণ করার মত অবস্থায় এসে ঠেকেছে। ওপর থেকে কোন রকম চাপ প্রয়োগ না করে আপনা থেকে এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরাময় করা যাবে— বর্তমান পরিস্থিতিতে সে বিষয়ে কোন রকম ধারণা করাও সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, ছাত্রদের রাজনীতির অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে ছাত্র রাজনীতি চালু রাখা হল। কিন্তু রাজনীতির গুণাগুণ বিষয়েও একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আমাদের প্রয়োজন। কোন কাজগুলোকে ছাত্ররাজনীতির আওতাভুক্ত বলে শনাক্ত করব এবং কোনগুলোকে করব না— বর্তমানে যে ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে তাতে করে সবচাইতে নৃশংস, নীতিহীন এবং যা তা ছেলেরাই ছাত্র রাজনীতির নেতার ভূমিকা পালন করছে। অন্যবিধ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী ছাত্ররা কখনো নেতৃত্বের আসন অধিকার করতে পারে না। এই ষণ্ডামার্কা ছাত্রনেতারাই মন্ত্রির গদি দখল করছে। তার ফলে জাতীয় রাজনীতির মান কিভাবে নেমে আসছে, সেটাও আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক কাজকর্ম সামরিকভাবে বন্ধ করার জন্যে জাতীয় রাজনীতির মান উন্নত করা সম্ভব হবে না। সাহাবুদ্দিন সাহেব ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সাহসী ঘোষণাটি দিয়ে তার উচিত কাজ করেছেন। এ বিষয়টি আমি মনে করি সকলের অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা উচিত।

এখন পূর্বের কথায় ফিরে আসি। আমরা বলেছিলাম আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণার পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসের ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এবং ছাত্রদের তারা সন্ত্রাসী কাজকর্মের শিশুশ্রমিক হিসেবে এ পর্যন্ত ব্যবহার করে আসছে। তাদের এটি করতে গিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাসের কারখানা খুলে দিতে হয়েছে। তারা যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করছে, সে ভিত্তির একেবারে মূল ভূমিকা তারা কিছুতেই নষ্ট করে দিতে পারে না। তাহলে তাদের রাজনীতিটাই অচল হয়ে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সন্ত্রাস চলছে আসলে সেটা সমাজে বিরাজমান সন্ত্রাসের একটি সম্প্রসারিত স্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন করে বন্ধ করলে সন্ত্রাস থেমে থাকবে না। গত মাসগুলোতে যারা আমাদের জাতীয় সংসদের কাজকর্ম টেলিভিশনে দেখেছেন তারাও একমত হবেন যে, সেখানে একটি সন্ত্রাসী পরিস্থিতি বলবৎ রয়েছে। তথাপি আমার সাহাবুদ্দিন সাহেবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণাটি এ কারণে অভিনন্দিত করছি যে, সন্ত্রাস না করার একটি ব্যাপক কর্মসূচির

ভিত্তিভূমি হিসাবে এ ঘোষণাটি গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা অধিকতর ফলদায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। সে কর্মসূচির রূপরেখাটা হবে এরকম— মায়ের দুধে যেমন শিশুদের অধিকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তেমনি অধিকার রয়েছে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর। গুটিকয় সন্ত্রাসী তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ করে দেয়, প্রত্যক্ষ এবং প্রাথমিকভাবে এই ছাত্রছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

এই ছাত্রছাত্রীরা আছে বলেই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠন চালু রাখতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ছাত্রছাত্রী না থাকত তাহলে ছাত্র সংগঠন ক্রিয়াশীল রাখার কোন প্রশ্নই উঠত না। সন্ত্রাসের কারণে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৪ বছরের কোর্স তাদের ১০ বছরে শেষ করতে হয়। যখন পাস করে বেরোয় তখন চাকরির বয়স পার হয়ে যায়। মেয়েদের বিয়ের বয়স ফুরিয়ে যায়। মা-বাবার দুর্দশার অন্ত থাকে না। এই ছাত্রছাত্রীরাই যদি একজোট হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় রাজনৈতিক দলগুলো হাজার চেষ্টা করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস চালু রাখতে পারবে না। এ ধরনের নির্দলীয় ছাত্ররা তখনই সন্ত্রাস প্রত্যাখ্যান করতে পারবে যদি তারা একটি সন্ত্রাসবিরোধী সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রাসবিরোধী ঐক্য জোরদার করার কথা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আইন করে সন্ত্রাস বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

১৮-১০-১৯৯৬

বাংলাবাজার পত্রিকা
২৩ অক্টোবর, ১৯৯৬

কুকুরের রক্তভক্ষণ প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

বর্তমান সময়ে সাপকে লম্বা আর ব্যাঙকে গোল বলা যায় না। অনেকেই উল্টো ব্যাখ্যা করেন, তথাপি আমি মনে করি, এখন কিছু কথা বলা প্রয়োজন, জ্ঞানী লোকেরা মৌনতাকে যে সোনা বলে থাকেন সে বাক্য এই সময়ের জন্যে খাটে না। আমি বুঝতে পারছি আমার কথাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তটিতে যা দরকারি মনে করছি, বলছি।

১. একটা জাতির জীবনে বারবার সুযোগ আসে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি কোন ধরনের আকার ধারণ করেছে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিটির সঙ্গে আমি একটা গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত কাহিনীর তুলনা করব। কোরবানির পরে পথেঘাটে ছড়ানো হাড় বিস্তর পাওয়া যায়। রাস্তার চালাক কুকুরেরা মনে করে এই হাড় সংগ্রহ করে নিবিষ্ট মনে চিবালে হাড় ফেটে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসবে। আর সারমেয়টি সেই লোহিত রস পরমানন্দে মজা করে খাবে। এই আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে সবগুলো দাঁত দিয়ে জোরের সঙ্গে হাড় চিবাতে থাকে। এক সময় কুকুরের আকাঙ্ক্ষিত রক্ত সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসে। কিন্তু হাড় থেকে নয়, নিজের মাড়ি ফেটে। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে যে মজাদার রক্ত বেরিয়ে আসছে, আমাদের যুদ্ধরত রাজনৈতিক দলগুলো সেই জিনিসটি উৎসব করে ভক্ষণ করছে।

২. একটি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির যখন অবনতি হয়, সেই ধরনের পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে নানা ধরনের গ্রুপ এবং দল ওৎ পেতে বসে থাকে। আজকের রাজনীতিতে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক রক্তপ্রবাহ অচল হয়ে পড়ায় নানারকমের মাফিয়া নানা বেশে সমাজে জাঁকিয়ে বসে জনগণের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করছে। এটাকে রাজনীতির ব্যাধি বললে বেশি বলা হবে না। রাজনীতি রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, অন্য কিছু নয়। মূল রাজনৈতিক প্রবাহটাকে অস্বীকার করে কিংবা পাশ কাটিয়ে নানা দেশি বিদেশি খুচরো শক্তি যখন রাজনীতির এলাকাটায় প্রভুত্ব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় তখন বুঝে নিতে হবে দেশের সর্বনাশের অধিক বাকি নেই।

৩. একটি জাতির জীবনে সুযোগ বারবার আসে না। আমরা যদি এই সময়ে গণতন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ অকেজো হতে দেই বছরের পর বছর আমাদের স্বৈরাচারের

অধীনে বসবাস করতে হবে। আমরা আন্দোলন করে, সভা করে, মিছিল করে পুরনো স্বৈরাচারের বদলে নতুন স্বৈরাচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। কেউ কেউ এমন রণহুংকার দিচ্ছেন, বছরের পর বছর প্রয়োজন হলে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাব। এই সমস্ত মানুষ হয়ত বোকা, নয়তো মতলববাজ। আমরা সকলেই এক দেশের মানুষ, সকলেই একটি ইতিহাসকে ধারণ করছি। যদি আমরা ইতিহাসকে মেনে নিই, যারা আমাদের মত কথা বলে না, আমাদের দলের সদস্য নয়, আমাদের রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করে না তাদেরকেও মেনে নিতে হবে। এটাই হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং শোষকদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে দাঁড়াবার এখনই সময়। বাঁচলেই আমরা সকলে বাঁচব।

৪. আমি পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করব। ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী এক সময় চিন্তা করলেন, সুরজিৎ সিং বার্নালা অকংগ্রেসী সরকারের মোক্ষম উপায় উদ্ভাবন করলেন, স্বর্ণমন্দিরের তরুণ পুরুষ উগ্র শিখনেতা ভিন্দ্রানাওয়ালেকে বার্নালাকে উৎখাত করার বিরুদ্ধে লাগালেন এবং টাকা-পয়সা, অস্ত্র সবকিছু দিয়ে ভিন্দ্রানাওয়ালেকে সাহায্য করলেন। ভিন্দ্রানাওয়ালে বার্নালাকে হটালেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীমতি গান্ধীকেও স্থির থাকতে দিলেন না। শ্রীমতি নিজের প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ করলেন। কাঁটা দিয়ে এই কাঁটা তোলার কথাটা শুনতে চমৎকার। কিন্তু বাস্তবে উল্টো ফল দেখা দেয় বেশিরভাগ সময়েই। বর্তমান বাংলাদেশের ভিন্দ্রানাওয়ালেদের অন্ধ গলি থেকে রাজনীতির সদরে যারা অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছেন তারা কি চিন্তা করতে পারেন এর পরিণতি কি? আমি সেই বন্ধুদের প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষায় রইলাম, যারা আমার প্রতিটি নিবন্ধের মধ্য থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিএনপির সমর্থন খুঁজে বের করেন। খতম।

বাংলাবাজার পত্রিকা
২৩ মার্চ, ১৯৯৬

গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা

লোকজনকে বলাবলি করতে শুনেছি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় অসামরিক আমলারা রাজনৈতিক দৃশ্যপটের শিরোভাগে ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছিল। সাম্প্রতিক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান প্রয়াসে সামরিক আমলারা রাজনীতির গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং এতে বিএনপি রাজনৈতিক দলটি কিছু অংশে হলেও লাভবান হয়েছে।

এগুলো মানুষের মুখের কথা। পথেঘাটে অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের বেলায় সামরিক কিংবা বেসামরিক উভয় প্রকারের আমলাদের হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত এবং দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভয়ংকর ক্ষতিকর।

একটি কথা আমি বারবার বলে এসেছি, আমাদের রাজনীতির যেটা মুখ্য সংকট, প্রকৃতপক্ষে তা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সংকট যেমন ছিল না, তেমনি সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষারও সংকট নয়। আসলে আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর দেশের আপামর জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না-করে দলীয়ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করার অনমনীয় এবং উগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এ সংকট জন্ম নিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটা এক জোয়ালের তলায় দুই ঘোড়ার গাড়ির মত। ঘোড়া দুইটির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব থাকতে পারে এবং সেটাই ঘোড়া দুটিকে একটার চাইতে আরেকটাকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায়। কিন্তু ঘোড়া দুটি যদি মনে করে তারা একে-অপরের শত্রু না হলে একসঙ্গে একপথে যাবে না। একটি যদি ডানে যায় আরেকটিকে বামে মোচড় দিতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত দু' বছরে সরকার ও বিরোধীদলগুলোর মধ্যে এই এনিমি ইমেজ তথা শত্রু প্রতীকের ভাবটি সবসময় ক্রিয়াশীল হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলনের ফল কি হয়েছে? বিরোধীদল— আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তারা বলছে, তাদের জয় হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি বলছে, তারা সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। সুতরাং তাদেরও জয় হয়েছে। দুই দলই জিতেছে। কিন্তু হারল কারা? এ অসহযোগ আন্দোলনে পরাজিত পক্ষ হল বাংলাদেশের জনগণ। বিএনপি বিএনপির জায়গায়

রয়েছে, আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদলগুলো তাদের জায়গায় রয়েছে। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর আর কোন রাজনৈতিক গোলযোগ থাকবে না এবং সুশৃঙ্খলভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে যে জিনিসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাকে এক জোয়ালের তলায় গাই-বলদকে একসঙ্গে জুড়ে দেয়া বললে অধিক বলা হবে না। আবদুর রহমান বিশ্বাস তার পথে যাচ্ছেন, বিচারপতি হাবিবুর রহমান ভিন্ন একটি অবস্থান গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করে লাভ হল কোথায়?

সেনা ছাউনিগুলোতে কি ঘটেছে তার পুরো বিবরণ এখনো দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। পরস্পর বিরোধী গুজবে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। বিশ্বাসপন্থীরা বলছেন, সেনাপ্রধান নাসিম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস নাসিমসহ কতিপয় সেনাকর্মকর্তাকে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। আবদুর রহমান বিশ্বাসের যারা বিরোধী তারা বলছেন, সামরিক প্রশাসনের মধ্যে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করে তিনি বিএনপির ষড়যন্ত্রের যে নীলনকশা ছিল সেটিকেই বাস্তবায়ন করেছেন।

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, গোটা বিষয়টার ওপর তদন্ত করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে কমিটি তদন্ত-অন্তে কি রিপোর্ট দেবে সেটা আগে ভাগেই অনুমান করার উপায় নেই।

আজকে যে জিনিসটি এ জাতির সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষকে বিচলিত এবং আতঙ্কিত করে তুলেছে, ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে যাচ্ছে তাতে করে নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সম্ভাবনা ক্রমশ সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে।

বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো কেউই জনরায় মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। জনরায় যদি তাদের পক্ষে না আসে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না এতেও বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। বিএনপি-আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের বেলায় তারা যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছেন সেটা কিছুতেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের অনুকূল নয়। যে সমস্ত কোটিপতি এন্তার অর্থ ব্যয় করে জনগণের ভোটের অধিকার কিনে নিতে পারবে তাদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। দলীয় আনুগত্য, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাজনৈতিক আদর্শবাদ এগুলো বড় দল কোনকিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে যেভাবেই হোক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। চোর-চামার-খুনি-ডাকাত যাদেরকে দলে ভিড়ালে বিজয় সুনিশ্চিত হয় তাদের সকলকেই দলে ভিড়ানো হয়েছে। কালো টাকা যেমন সাদা টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয় তেমনি সমাজের খারাপ মানুষগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নে শিরোভাগ দখল করে আছে।

শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে এ ক্রিড়াক্ষেত্রে টেনে আনা হল, সেটা এ তাবৎকাল রাজনীতির অঙ্গনে যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল তার একটা যৌক্তিক সম্প্রসারণ মাত্র। সরকার এবং বিরোধীদলের কর্মকর্তারা এতবেশি ক্ষমতামনস্ক হয়ে উঠেছেন, তারা সকলে মনে করছেন সেনাবাহিনীর সহায়তা ছাড়া নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব। মুখ্যত পরস্পরের প্রতি এ জিঘাংসামূলক মনোবৃত্তির কারণেই সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এতে কার অংশ কতটুকু এখনো পুরোপুরি স্পষ্টতা লাভ করেনি।

যে সমস্ত রাজনৈতিক বিতর্ক গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে এবং জনপদের জনগণকে সমাধান করার কথা ছিল তাদের সমাধান করার কোন অধিকার নেই বলেই রাজনীতি ছুটতে ছুটতে ঢাকার রাজপথ, সচিবালয় ছাড়িয়ে সেনা ছাউনিতে পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করেছে।

এই পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়ন একটি বাক্যেই করা সম্ভব। দেশের জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে মধ্যশ্রেণীভুক্ত দলগুলো রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার করার উগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই সমাধানের অতীত সংকট জন্ম নিয়েছে।

বাংলাবাজার পত্রিকা
২৬ মে, ১৯৯৬

গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব কে নিতে যাচ্ছে

এই মুহূর্তে আমার ডব্লিউ বি ইয়েটসের সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ছে। একজন বন্দি আইরিশ সৈনিক বলছে, যাদের পক্ষ হয়ে আমি লড়ছি তারা আমার বন্ধু নয়, যাদের বিপক্ষে লড়ছি তারা আমার শত্রু নয়। অর্থাৎ আইরিশ সৈনিকটি তার মন্দভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিল, কারণ সে এমন একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে যার সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক নেই।

আমার অবস্থাও এই আইরিশ সৈনিকটির মত। আমি বিএনপির সমর্থক নই, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব অনেক সময় মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু এ দলটির ওপর কখনো আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। আজকে বিএনপি-আওয়ামী লীগ এবং অন্য দলগুলো মিলে দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সেখানে আমি বা আমার মত লোকেরা সত্যি সত্যিই অসহায়। আমি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে, সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ করে শিউরে উঠছি এবং যথাসাধ্য হুশিয়ারি উচ্চারণ করতে চেষ্টা করছি। এই যুদ্ধরত দলের সমর্থকরা মনে করেন আমি একটি সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে ধর্মকথা বলার চেষ্টা করছি। এটা আসলে কোন অবস্থানই নয়। অনাবশ্যক নিজের উপর মহত্ত্ব আরোপ করতে চেষ্টা করা। বর্তমানে সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর সমর্থকদের মানসিক অবস্থা এমন, তারা অনায়াসে মনে করেন, যে বা যারা আমাদের সঙ্গে নয় সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আমাদের শত্রু। এই শত্রুর অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পূর্বে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কোন সম্রাট যদি জনগণের হৃদয় জয় করতে পারতেন, প্রিটোরিয়ান গার্ডরা রাতের অন্ধকারে সম্রাটকে খুন করে লাশ টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দিত। আবার সম্রাট যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে জনগণের উপর অত্যাচার শুরু করত জনগণ সমবেত বিদ্রোহে ফেটে পড়ত এবং সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে একইভাবে লাশ টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দিত। এই সময়টিতে রোম সাম্রাজ্যের সুবিবেচনাসম্পন্ন মানুষদের অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত করুণ। দয়া, মমতা, মেধা, প্রজ্ঞা, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচিন্তা ইত্যাকার যেসব মানবীয় গুণ মানুষের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, গরিয়ান করে সেই মানবিক গুণাগুলো একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিল।

আজকের বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম ক্ষণটির মত। মানুষের সুবিবেচনা, প্রীতি, যুক্তি, শক্তি এবং দেশপ্রেম এই মহৎ বোধগুলো কোন কাজেই আসছে না। যারা সৎ, বিবেকবান, ভাল মানুষ তারা এখানে সবচাইতে অসহায় বোধ করছেন।

আগামী ১৫ তারিখে কি ঘটতে যাচ্ছে, সরকার হয়ত পুলিশ, মিলিটারি, বিডিআর এই সকল বাহিনীর সাহায্যে নির্বাচনপূর্ব সমাপ্ত করে ফেলবে। বিরোধীদল মরিয়া হয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু নির্বাচন ঠেকাতে পারবে এমন তো মনে হয় না। সরকারি দল বিপুল ভোটে জয়ী হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিন শ' আসনের মধ্যে হয়ত চল্লিশটা কি পঞ্চাশটা আসন অন্যদের পাইয়ে দেবে, না-হলে তারা সাংবিধানিক পবিত্রতা রক্ষা করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রেখেছে—এই কথা জোর গলায় বলবে কেমন করে।

সরকার তো বিপুল ভোটে জয়ী হবে, কিন্তু তারপরের অবস্থা কি দাঁড়াবে? ১৫ তারিখ পর্যন্ত কি ঘটবে, কি ঘটতে পারে তা অনুমান করা যায়। তারপরে কি ঘটবে সে ব্যাপারে আগাম কিছু বলার ক্ষমতা দক্ষ জ্যোতিষীরও নেই।

সরকার ভোটে জয়ী হয়ে সংসদে বসবে এবং বিরোধীদলগুলো রাজপথে তাদের অবস্থান অধিকতর সংহত করবে। এখন যে খুন-জখম, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও চলছে তার মাত্রা লক্ষগুণে বেড়ে যাবে এবং ট্রেনটি এঁকেবেঁকে যেভাবে নিরাপদে শেষ স্টেশনে পৌঁছে যায় তেমনি আমাদের প্রিয় দেশটি গৃহযুদ্ধের এলাকার মধ্যে নির্বিবাদে হাসতে হাসতে ঢুকে পড়বে। মজার কথা হল, সরকার এবং বিরোধীদলগুলো জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে দেশটিকে বনের হরিণের মত তাড়িয়ে গৃহযুদ্ধের ফাঁদের মধ্যে ফেলে দিল। এই অবস্থার জন্যে আমরা কাকে দায়ী করব? বিএনপি যেভাবে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার নামে অনড় অবস্থান নিয়েছে এবং বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে আন্দোলন এবং বিক্ষোভের যে পথ বেছে নিয়েছে তার মাঝখানে কোন ফাঁকা জায়গা আর অবশিষ্ট নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা একে-অন্যের সঙ্গে আলোচনায় বসে আপোষের একটা পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সাংবিধানিক পবিত্রতা এগুলো হল বাইরের কথা। আসল কথা হল, সরকার এবং বিরোধীদল কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একে-অন্যকে শত্রু হিসেবে দেখছে। এই শত্রু হিসেবে দেখার প্রবৃত্তি থেকেই অবিশ্বাস এবং ঘৃণা এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে জমেছে, সেখানে শুভবুদ্ধির অনুপ্রবেশের চুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই।

এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো শান্তিপ্রিয়, দরিদ্র, অসহায় জনগণের উপর এমন একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে সেই যুদ্ধ জনগণের কোনদিনই আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। এই দলগুলোর একটিরও যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার এবং শ্রদ্ধাবোধ থাকত অন্য দলের লোকদের মধ্যে আস্থা

এবং বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করতে পারত। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ কাঠামোটা পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সেখানে প্রতিযোগিতার স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রতিহিংসার কোন স্থান নেই। বর্তমানে এই প্রতিহিংসার বিষবৃক্ষটি ডালপালা মেলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার বিষক্রিয়ার হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে এমন আশা করার কোন কারণ নেই।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। এই দেশের মানুষ কখনো কামনা করেনি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ করে হতভাগ্য দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দোরগোড়ায় টেনে নিয়ে আসুক। তারা কামনা করছে, রাজনৈতিক দলগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করুক যাতে করে এই হাজার সমস্যা আক্রান্ত দেশটির জনগোষ্ঠীর সামনে আশার আলো তুলে ধরা সম্ভব হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সে দায়িত্বের কথা একটু স্মরণ না করে যে সংঘাত এবং হানাহানির পথ বেছে নিল সেটি জনসমাজের আকাঙ্ক্ষার বুকে লাথি মারা বললে বেশি বলা হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোর এই ধরনের আচরণ থেকে একটি জিনিসই স্পষ্ট বেরিয়ে আসে, দেশ-জাতির কল্যাণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও তাদের নেই। দেশ এবং দেশের জনগণের অবস্থা যা-ই হোক না কেন তাদের ক্ষমতা চাই।

আমি সোলায়মান পয়গম্বরের সেই গল্পটি বলে রচনাটি শেষ করব। এক কাঠুরে মেয়ে তার বাচ্চাটিকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। এই সুযোগে অপর একটি কাঠুরে মেয়ে বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। বাচ্চাটির আসল মা বন থেকে ফিরে দেখে তার বাচ্চা নেই, সে কিছুদূর গিয়ে অপর কাঠুরে মেয়েটির দেখা পেল। তখন বাচ্চাটির মা দাবি করল, আমার বাচ্চাটি চুরি করে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? অন্য মেয়েটি চিৎকার করে বলল, তোমার কি দুঃসাহস। আমার বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা বলে দাবি করছ। বাচ্চার দাবি নিয়ে দু'কাঠুরে মেয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। ঝগড়ার একপর্যায়ে অপহরণকারী নারীটি প্রস্তাব দিল, চল, আমরা সোলায়মানের দরবারে গিয়ে নালিশ করি। উনি সূক্ষ্ম বিচারক। বিচার করে আসল মা যে তার কাছে সন্তান ফিরিয়ে দেবেন।

সোলায়মানের দরবারে যখন শিশুর মাতৃত্ব নিয়ে আপন আপন দাবি পেশ করল— সোলায়মান বললেন, তোমরা যে বিবাদ করছ তার একটি সহজ সমাধান আমার হাতে আছে। আমি বাচ্চাটিকে কেটে দু'ভাগ করছি। তোমরা একেক অংশ নিয়ে ঘরে চল।

সোলায়মানের রায় শুনে অপহরণকারী নারীটি ধন্যধ্বনি উচ্চারণ করে বলল, বাদশা নামদার যথার্থ বিচার করেছেন। আমি একটা অংশ পেলেই খুশি। বাচ্চাটির আসল মা বলল, আপনার বিচারে কোন ভুল হয়নি। কিন্তু তারপরেও আমার একটি নিবেদন আছে। আল্লার দোহাই লাগে, বাচ্চাটিকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করবেন না। যে

নারী তার মা বলে দাবি করছে তার কাছে সম্পূর্ণ বাচ্চাটি ফিরিয়ে দিয়ে দেন। অন্তত বাচ্চাটি বেঁচে থাকবে। তখন সোলায়মান কি রায় দিয়েছিলেন সে-কথা নতুন করে বলে লাভ নেই।

বাংলাদেশে বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো বাচ্চার শরীরের একেকটি অংশ দাবি করছে, কিন্তু কেউ চাইছে না বাচ্চাটি বেঁচে থাকুক এবং সে বাচ্চাটি হল আমাদের জনগণের অতি আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র।

১১-০২-১৯৯৬ বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

তলোয়ার যুদ্ধে হাসিনা-খালেদা যে পারে বিজয়ী হোক

আজ মাসের ১২ তারিখ। এ মাসের বাড়ি ভাড়া আমি দিতে পারিনি। আমার অফিস থেকে সামান্য টাকা পাই। ব্যাংক বন্ধ বলে অফিস টাকা দিতে পারেনি। আমার বাড়িওয়ালা একজন গরিব মানুষ। বাড়ি ভাড়ার টাকার উপর নির্ভর করে তাকে মাসের অন্তত ১০ দিন চলতে হয়। ঠিক সময়ে আমার কাছ থেকে ভাড়াটা পাননি বলে তারও কষ্টের শেষ নেই। প্রকাশকরা বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারির মেলার পরে কিছু কিছু রয়ালটির টাকা শোধ করবেন। আমি যখন অন্তত বাড়ি ভাড়ার টাকাটা প্রকাশকদের পৌঁছে দিতে বললাম, তাদের একজন জানালেন, তিনিও বাড়ি ভাড়া শোধ করতে পারেননি। এদিকে আমার বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ার উপক্রম। অবস্থা যদি আরো দু'চার দিন চলে আমার বাড়িওয়ালাকেও উপোষ দিতে হবে। এই অবস্থা আমার একার নয়। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, অনেককেই এই কঠিন সময় সামাল দিতে হচ্ছে।

বিরোধীদলগুলো সরকারকে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করার জন্যে এই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। কিন্তু সরকারি অফিসগুলো দিব্যি চলছে। আমি ক'দিন আগে ইডেন বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, শতকরা ৮০ ভাগ চাকুরে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন। বিরোধীদলের সঙ্গে সরকারের বিরোধ রয়েছে অথচ সরকারি অফিসগুলো ঠিকঠাক চলছে। সেখানে তারা কোনরকম বাধা সৃষ্টি করছেন না। অথচ সমগ্র দেশের জীবনপ্রবাহ তারা এক রকম স্তব্ধ করে দিয়েছেন। গাড়ি-ঘোড়া চলছে না, দোকান-পাট খুলছে না, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, স্কুল-কলেজ অচল— এককথায় দেশের জনজীবন চূড়ান্ত অসহায়তার মধ্যে দুর্দশার ভার বহন করে চলছে।

বিরোধীদল যদি সরকারি অফিসগুলো দখল করে সকল প্রশাসন যন্ত্রটা অকেজো করে দিত তার মধ্যে আমি একটা যুক্তি খুঁজে পেতাম। প্রশাসন যন্ত্রটাকে চলতে দিয়ে বিরোধীরা জনজীবনটা অচল করে দিয়েছেন এটা একটা জঘন্য অন্যায়— একথা বলার মানুষও বাংলাদেশে নেই।

এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মত দুর্নীতিপরায়ণ, সুযোগ-সন্ধানী ও অসৎ বুদ্ধিজীবী বোধকরি দুনিয়ার কোন দেশে নেই। বিবৃতি দেয়া' ছাড়া তাদের অন্যকোন কাজকর্ম নেই। আমার এক তরুণ সাংবাদিক বন্ধু রসিকতা করে মন্তব্য করেছিলেন, দুনিয়াতে

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাই সবচেয়ে বেশি বিবৃতি দান করে থাকেন। সারাবছর তারা স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। সেই সরকারটির পতন যখন আসন্ন হয়ে ওঠে তারা কল্লিদার পাঞ্জাবি এবং আলোয়ান পায়ে চাপিয়ে রাজপথে ছুটে এসে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। এই হল অবস্থা। যখন শেখ মুজিবুর রহমান এক পা এক পা করে স্বৈরাচারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এই বুদ্ধিজীবীরাই তাকে বাহবা দিয়ে সপরিবারে নিহত হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। যদি তারা সেদিন শেখ মুজিবকে হুঁশিয়ার করতেন ও তাঁর স্বৈরাচারী পদক্ষেপসমূহের বিরোধিতা করতেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রাখতে বাধ্য করতেন আজকের বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই জিনিসটি ঘটতে পারত না।

ধরে নিলাম, খালেদা সরকারের পতন হবে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় বসবেন। তখনো তো এই নৈরাজ্য চলতে থাকবে। '৯১তে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন হয়েছিল। সকলে ধরে নিয়েছিরেন, এরশাদ ও তার দল আর কোনদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়ে গেল, এরশাদ এবং তার দল একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আমাদের দেশে বহাল-তবিয়তে টিকে রয়েছে। সুতরাং খালেদা সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশে প্রবলভাবে বিএনপির অস্তিত্ব থাকবে। শেখ হাসিনার সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এখন শেখ হাসিনা যে ধরনের হরতাল, অসহযোগ, ভাংচুর, সন্ত্রাস করছেন, খালেদা জিয়াও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন। দেশের মানুষের ভরসা কোথায়? গম পেষার যাঁতার দুই পাথরের মধ্যবর্তী স্থানটিতে জনগণের অবস্থান। জনগণের উপর জুলুম করা ছাড়া রাজনৈতিক দলের অন্যকোন কাজ নেই। অদূর ভবিষ্যতে দেশে কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার বেছে নেবে ও ফেলে দেবে, আগামীতে তার তো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সেই অতি পরিচিত প্রবাদটির কথা আমি উল্লেখ করব। একটি দেশের জনগণের নৈতিক মান যতটুকু তার শাসকদের মানও ততটুকুই। বাংলাদেশে বারবার স্বৈরাচার নেমে আসে। তার কারণ এই হতে পারে যে, এ দেশের মানুষ অবচেতনে স্বৈরশাসনকেই কামনা করে থাকে।

এই লেখাটি আমি দীর্ঘ করব না। একটি প্রস্তাব রেখে ইতি টানব। সরকার ও বিরোধীদলের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্যে কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা এসেছিলেন। এমেকার পর স্যার নিনিয়ান। নিনিয়ান ক্ষান্ত দেয়ার পর সংকট সমাধানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরিল এগিয়ে এসেছিলেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খালেদা ও হাসিনার কাছে ছোটাছুটি করেছিলেন। বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি, বরং আরো ভয়াবহ এবং তীব্র হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের ঘাড়ে দায়িত্বটা চেপেছে। শেখ হাসিনা ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়েছেন। এই লেখা

যখন পাঠকদের হাতে পৌছবে সেই ২৪ ঘণ্টা অতীত হয়ে যাবে। এই মূল্যবান ২৪ ঘণ্টা সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা করে যখন চলে যাবে কি হবে কেউ বলতে পারে না। অনুমান করা যায়, অনেক মায়ের বুক খালি হবে। অনেক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। আমরা কে মরে যাই, কে বেঁচে থাকব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি আমার প্রস্তাবটি রাখতে চাই। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে দু'জনের হাতে দু'খানি তলোয়ার দিয়ে টেলিভিশনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হোক। তারা দু'জনে যুদ্ধ করুক। যে অন্যকে খুন করে নিজে জিততে পারে তাকে আমরা ক্ষমতাসীন মহারানী বলে মেনে নেব এবং অনুগত প্রজা হিসেবে জয়ধ্বনি করব।

বাংলাবাজার পত্রিকা
১১ মার্চ, ১৯৯৬

বইমেলাটিকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র বানালেন কেউ করলেন খুন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে, বাংলা একাডেমীতে যে বইমেলাটি উদ্বোধন করলেন, তার এক মাস আগে অর্থাৎ ১ জানুয়ারিতে বিজয় সরণিতে ঢাকা বইমেলাটিও উদ্বোধন করেছিলেন। ওই মেলাটিতে আমন্ত্রিত হয়ে আমি গিয়েছিলাম এবং মেলাটি বর্জন করে চলেও আসতে হয়েছে। আমার মেলা বর্জনের কারণ ছিল অতিথিদের আসন সংস্থাপনের বেলায় আমলা এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের জন্যে সামনের আসনগুলো বরাদ্দ হয়েছিল। লেখকদের মেলায় লেখকদের কোন সম্মানজনক আসন রাখা হয়নি বলেই প্রতিবাদ করে আমি চলে এসেছিলাম। তারপরে বাংলাবাজার পত্রিকায় এ নিয়ে একটি নাতিক্ষুদ্র নিবন্ধও লিখেছিলাম। বাংলাবাজারের পাঠকদের স্মরণ থাকার কথা। তিন চার সপ্তাহ আগের ঘটনা।

এবার প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং পুলিশ জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্মম নির্যাতন করল। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, লেখক, সাহিত্যিক সকলের কাছে এ মেলার অনুষ্ঠান বর্জন করার আবেদন জানালেন। আমাদের ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা (ভোরের কাগজ) সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে টেলিফোন করে বলল তারা লেখক-সাহিত্যিকদের মতামত জানতে চাইছে। তারা মেলায় যাবেন কিনা এবং এ বিষয়ে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বিএনপি আওয়ামী লীগ উভয় দলের ভূমিকার সমালোচনা করে আমার অবস্থানটি ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম, একুশে ফেব্রুয়ারি মেলা আমার ভাইয়ের রক্তের ওপর তৈরি হয়েছে এবং আমি মেলায় যাব। তারপরের দিন ভোরের কাগজে দেখা গেল, শুধু একটি লাইন ছাপা হয়েছে— আমি মেলায় যাব। আমি যে আমার অবস্থানটা ব্যাখ্যা করেছিলাম সে ব্যাপারে একটি শব্দও লেখেনি। সৎ সাংবাদিকতার এটা একটা নমুনা বটে! আমি এমন একজন লেখকের কথা জানি, যিনি বিএনপির সঙ্গে সর্ব ব্যাপারে অপ্রকাশ্যে সহযোগিতা করে থাকেন। যে গ্রামটিতে তিনি জন্মেছেন সেখানে একটি স্কুল করতে যাচ্ছেন এ বিষয়টির উপর অন্তত পুরো দু' কলম সংবাদ এ বছরে অন্তত বিশবার ছেপেছে। মজার কথা হচ্ছে, সে স্কুলটির সবেমাত্র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। মুক্তচিন্তার দৈনিকটির অর্থাৎ অবজেকটিভ সাংবাদিকতার সেটাও একটা দৃষ্টান্ত বটে।

আমি কিছু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং নাগরিকের সঙ্গে মিলেমিশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের প্রতিরোধমূলক কিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। আমার সঙ্গে যেসব ছাত্রছাত্রী কাজ করেন তাদের একটা বিরাট অংশ জগন্নাথ হলের ছাত্রছাত্রী। তারা এসে আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে বসল এবং বলল প্রধানমন্ত্রীর এ মেলা উদ্বোধনকে উপলক্ষ করে পুলিশ জগন্নাথ হলে নজিরবিহীন নির্মম নির্যাতন চালিয়ে গেল। তার প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি মেলা বর্জন করতে বলেছেন, অথচ আপনি সেই মেলায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। আমার ছাত্ররা বললেন, আপনি সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করুন। আমি বললাম, ঢাকা বইমেলাটি আমি বর্জন করে এসেছিলাম এবং বর্জন করার পর বাংলাবাজার পত্রিকায় যে নিবন্ধটি প্রকাশ করেছিলাম তাতে প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোন সরকারি ব্যক্তির মেলা বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলাম। আর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী যখন মেলা উদ্বোধন করলেন আমি সে অনুষ্ঠানটিতে যাইনি, যদিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। আর পুলিশ আমার সঙ্গে পরামর্শ করেও জগন্নাথ হল আক্রমণ করেনি। কিন্তু আক্রমণ করার কাজটি অত্যন্ত জঘন্য এবং বর্বরোচিত সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মেলার অনুষ্ঠান বর্জন না করেও এ নিষ্ঠুর কর্মের প্রতিবাদ অন্যভাবে করা যায়। আমার বন্ধুরা আমার কথা শুনলেন। তারপরও বললেন, আরেকবার চিন্তা করে দেখুন। আমি একটুখানি বিরক্ত হলাম এবং বললাম, তোমরা পুরুত-টুরুত কাউকে যদি পাও নিয়ে এস। হিন্দু হয়ে যাব। আমি যদি মুসলমান না হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন হয়ে যাই সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজ হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করে সে জন্যে আমাকে দায়ী এবং লজ্জিতবোধ করতে হবে না এবং সংখ্যালঘু হিন্দুরাও যে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করে সেটা জোর গলায় বললে আমাকে কেউ দোষতে পারবে না। কথা এ পর্যন্ত গড়াল। একটি মুসলিম ছাত্রী বলল, আপনি এটা অসম্ভব কথা বলছেন। আপনি হিন্দু হিসেবে যদি না জন্মান, আপনি হিন্দু হতে পারবেন না এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের তরফ থেকে যে অত্যাচার-নির্যাতন হয় তার দায়ভাগ এড়াবারও উপায় নেই। আমাদের অবস্থানটি এতই নাজুক মানবিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে সেটা একটা বিমূর্ত আকার পেয়ে যায়।

সেদিনের আলোচনার পর কেন আমি মেলায় যাব এ শিরোনামে আজকের কাগজে একটি উপসম্পাদকীয় লিখলাম। বন্ধুবান্ধব অনেকেই বলেছেন। লেখাটিতে আমি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কিছু সুস্থ কথাবার্তা বলতে পেরেছি। এই লেখাটা যেদিন প্রকাশিত হল তারপরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্ররা এসে আমাকে বললেন, আগামীকাল অধ্যাপক নোবান হত্যার অপরাধীদের শাস্তি এবং জগন্নাথ হলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে আমরা একটি মৌন মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি, নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের লোকদের আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেছি। আপনি যদি আসেন আমরা খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করব। তার পরদিন সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অপরাজেয় বাংলার পাশে আমি গেলাম। গিয়ে দেখি সম্মিলিত নারী সমাজের ফরিদা

আক্তার আরো কেউ কেউ অপেক্ষা করছেন। আমার আশংকা ছিল, এ উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে এরকমের একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে হয়ত ছাত্রছাত্রীরা সাড়া দেবে না। কিন্তু ১১টা না বাজতেই দেখা গেল প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিলে দাঁড়িয়ে গেছেন। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন মনওয়ারউদ্দিন আহমেদ সাহেব আমাকে বললেন, আপনাকে মিছিলের সামনের দিকে থাকতে হবে। আমি একটু দ্বিধা করছিলাম। আমার হাঁপানির টান বেড়ে গিয়েছিল। অতটা পথ হাঁটতে পারব কিনা। কিন্তু যখন হাঁটতে শুরু করলাম দেখলাম বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। আমরা প্রেসক্লাবে এসে গেলাম। তখন সকলে বললেন, যেহেতু লেখক হিসেবে আপনার পরিচিতি আছে, সুতরাং কিছু কথা আপনাকে প্রথমে বলতে হবে। আমি সংক্ষেপে উপাচার্যের অপসারণ দাবি করলাম। হামলার প্রতি নিন্দা জানালাম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারাদেশে রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আবেদন রেখে বক্তব্য শেষ করলাম।

আমি যখন আমার কথা শেষ করেছি, জগন্নাথ হলের কিছু ছাত্র এসে আমার কাছে সবিনয় আবেদন জানালেন। তারা বললেন, জগন্নাথ হলের কিছু ছাত্র এ প্রেসক্লাবের সামনে অনশন ধর্মঘট করছেন আপনি তাদের সঙ্গে একটু দেখা করেন এবং আলাপ করেন। আপনি গেলে ছাত্ররা খুশি হবেন। আমি বললাম, অবশ্যই যাব। এটা আমার কর্তব্য। তারপর অনশনরত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। আমার ভীষণ খারাপ লাগল। আমি জানতে চাইলাম, আপনারা অনশন কতক্ষণ চালাবেন। তারা বললেন, সন্ধ্যাবেলায় অনশন ভাঙব। আমি কথা দিলাম, আমি সে সময়ে আবার তাদের সঙ্গে এসে দেখা করব।

আমি চলে এসেছিলাম। এ সময়ে একজন লিকলিকে চেহারার ছাত্র এসে আমার কাছে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে কৈফিয়ত দাবি করলেন আমি মেলায় যাব একথা কেন বলেছি। ছাত্রটির কথার ধরন দেখে আমি একটু চমকে গেলাম। বললাম, কেন যাব সেকথা তো লেখায় বলেছি। তিনি বললেন, শিক্ষক সমিতি নিষেধ করেছেন। তারপরেও আপনি মেলায় যেতে সাহস করেন কি করে। আমি বললাম, শিক্ষক সমিতির নির্দেশ আমাকে মানতে হবে কেন। শিক্ষক সমিতি একটা দলের হয়ে কথা বলেছেন। আমি নির্দলীয় স্বাধীন মতামতের লেখক। বিবেক ছাড়া আমি কারো নির্দেশ মানতে রাজি নই। শান্তভাবে কথাবার্তা চালিয়ে গেলে অনেকক্ষণ কথা বলা যেত। কিন্তু আমি দেখলাম, ছাত্রটির মেজাজ উত্তরোত্তর চড়ে যাচ্ছে। ওই মিছিলে আমার মতামত সমর্থন করেন এমন লোক কম ছিলেন না। আমার মনে হল, এখানে যদি একটি বিতর্কের সৃষ্টি করি সেটা একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে তুলতে পারে। সে আশংকায় কাউকে কিছু না বলে প্রেসক্লাব থেকে দু' কিলোমিটার পথ হেঁটে আমি কি করে বাসায় এসেছি বলতে পারব না।

তারপরের দিন শুনলাম, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মনসুর মুসা আজিমপুরে তার সমন্ধিকে দাফন করে ফেরার সময় প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়েছেন এবং

জখম এত প্রবল ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে না গেলে হয়ত বাঁচানো যেত না। মনসুর মূসা আহত হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি সংবাদ এখানে আমি প্রথম প্রকাশ করব। মনসুর মূসার মা থাকেন চট্টগ্রামের একটি গ্রামে। হাসপাতালে নেয়ার পর মূসা কি রকম জখম হয়েছেন টেলিভিশনে এক মিনিট কি ৯০ সেকেন্ড সে ছবিটি দেখানো হয়েছিল। মনসুর মুসার বৃদ্ধ মা এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মারা যান। তার মা যে মারা গেছেন এ সংবাদটি এখনও ডাক্তাররা তাকে জানাতে দেননি।

একটুখানি বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করলাম। তার একটা কারণও আছে। আমি তো বলেছি, বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করব। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন একটা দুটো করে হুমকি আমি টেলিফোনে পাচ্ছি। তারপরেও আমি ঠিক করেছি, আমি যাব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মেলা বর্জনের ডাক দিয়ে একটা বড় ধরনের ভুল করে ফেলেছে। আমার ধারণা, এটা তারা নিজেরাও অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন। যদি তারা এখনো মনে করেন যে, তারা ভাল কাজ করেছেন আমি তাদেরকে আওয়ামী লীগের মামুলি সমর্থকদের বেশি কিছু মনে করব না। একজন শিক্ষক, একজন সাংবাদিক, একজন লেখক তার দলীয় পরিচয়ের বাইরে দেশবাসীর কাছে যে সম্মান পেয়ে থাকেন তারা দেশের এমন কিছু কর্তব্য পালন করেন তার সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ।

গত ১৫ তারিখে যে অভূতপূর্ব চড়ুইভাতির নির্বাচন হয়ে গেল, সে বিষয়ে আমি বাংলাবাজার পত্রিকায় পরের কলামটি লিখব। এখন একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। বাংলা একাডেমীর বইপত্রের বিক্রি বাট্টা কি রকম হচ্ছে আশা করি পত্রপত্রিকার কল্যাণে সচেতন লোকদের জানার বাকি নেই। এই মেলাটি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব বললে বেশি বলা হবে না। এ মেলায় একেকজন প্রকাশক যে পরিমাণ বইপত্র বিক্রি করেন সারাবছরে তার দশভাগের একভাগও বিক্রি করতে পারেন না। মূলত এ বইমেলাটির ওপর অনেকাংশে আমাদের সৃজনশীল প্রকাশক নির্ভরশীল। বছরের শুরু থেকেই প্রকাশকেরা এ মেলা ধরার উদ্দেশ্যে বইপত্র ছাপার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। মেলাতে যে বইপত্র বিক্রি হয় তার ওপর প্রকাশক, বইয়ের দোকান কর্মচারী, প্রেস, বাঁধাইকার এবং লেখক বিপুল পরিমাণ মানুষ নির্ভর করে থাকেন। এ বছর মেলাটি কাল হয়ে গেল। কমসে কম এক শ' কোটি টাকা মূলধন এ মেলার বইপত্র ছাপা উপলক্ষে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। মেলায় লোক সমাগম হচ্ছে না বলেই চলে। বেচাবিক্রি একেবারেই নেই। প্রকাশকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। লেখকদেরও একাংশ এ মেলার বই বিক্রির উপর গোটা বছর ভরসা করে থাকেন। একুশে ফেব্রুয়ারির আর দু'তিন দিনও বাকি নেই। এ সময়ের মধ্যে প্রকাশকরা যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার দু'শতাংশও তুলতে পারেননি। আবার এ ভাঙ্গা মেলা জোড়া লাগবে তেমন কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। যে

সকল শিক্ষক ও লেখক-সাহিত্যিক বিবৃতি দিয়ে এ মেলাটিকে এমনভাবে কানা করে ফেললেন তারা আমাদের সংস্কৃতির যে বিরাট ক্ষতি করেছেন সেটা কি বুঝতে পেরেছেন? দেশের সাধারণ মানুষ তাদের এই কাজটিকে কি নিন্দনীয় বলে মনে করবেন না?

পরিশেষে আর কয়েকটা কথা বলে এ নিবন্ধটি শেষ করব। সমাজ এবং রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রহীন সমাজের অস্তিত্ব এখনো পৃথিবীতে অনেক আছে। সমাজ যদি রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে তাহলে রাষ্ট্রের চরিত্র শুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি পদে পদে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে আসে সেখানে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রথম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে আশ্রয় নিয়ে বাংলা একাডেমীর মেলাটিকে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করলেন এবং আওয়ামী লীগ মেলাটিতে পুরোপুরি যুদ্ধের মহড়া দিয়ে দিয়ে মেলাটিকে খুন করে। আমাদের ভাগ্য এ ধরনের দুষ্ট রাজনীতির মধ্যে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে।

বাংলাবাজার পত্রিকা
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

ইলিয়াসনামা : খোয়াবনামা

উনিশ শ' চুরানব্বইয়ের দিকে কোলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা এই সভাটির উদ্যোগ আয়োজনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের লেখক হুমায়ূন আহমেদ, কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী প্রমুখ কবি সাহিত্যিক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে কোলকাতা গিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার লেখক এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন।

ইলিয়াস ভাই মানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ওই সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন এবং তিনি কোলকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে খেতে এসেছিলেন। আমার বাড়িতে কনিয়াক এবং হুইস্কি ছিল। দু' ধরনের পানীয়ই ইলিয়াস ভাইয়ের ভীষণ পছন্দ। পান করার পরে ইলিয়াস ভাইয়ের মেজাজ শরীফ অসম্ভব রকমের সুন্দর হয়ে উঠত এবং তিনি অনেকটা গীতিকবিতার ভাষায় কথাবার্তা বলতে থাকতেন। ইলিয়াস ভাইকে যাঁরা ড্রিঙ্ক করতে দেখেননি তাঁদের কাছে তাঁর চরিত্রের এই দিকটি অপ্রকাশিত থেকে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ড্রিঙ্ক করার পরও দেখলাম তাঁর মেজাজটি অসম্ভব রকম খাট্টা। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত ড্রিঙ্ক করার পরে আমি আর ইলিয়াস ভাই উর্দুতে বাতচিৎ করতে থাকতাম। সেদিন দেখলাম অন্তত চার পেগ পান করার পরও ইলিয়াস ভাইয়ের মুখ থেকে এক লব্জ উর্দু বেরিয়ে এল না। এটা অস্বাভাবিক। আমি জানতে চাইলাম ক্যায়া? আপকা মেজাজ শরীফ আচ্ছা নেহি? কুয়ি খারাপ খবর?

ইলিয়াস ভাই টেবিলে ঘুষি দিয়ে বললেন, 'শোনেন ছফা, কোলকাতায় কী ঘটেছিল। হাইকমিশনের আলোচনা সভাটিতে অনেক প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। সব কথা বলব না। এক সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা কী হবে সে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়।' আমাদের দেশের কতিপয় লেখক-কবির নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'একমাত্র হুমায়ূন আহমেদ ছাড়া আর সকলেই মতামত প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার ভাষারীতির মধ্যে কোন রকম রকমফের হওয়া উচিত

না।' ইলিয়াস ভাই বললেন, 'আমি বলেছি বাংলাদেশে সাহিত্যের ভাষা পশ্চিম বাংলার ভাষার চাইতে আলাদা হতে বাধ্য। এ নিয়ে এক বিশ্রী বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেও এ বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হয়।'

সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সাহিত্যসভার আলোচকদের গ্র্যান্ড হোটেলে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। একমাত্র ইলিয়াসকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ইলিয়াস ভাই মনে করেন তাঁকে অপমান করার জন্যই আনন্দবাজার ইচ্ছে করে ডিনার পার্টির অতিথি তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়েছে। আবার ঘুষি দিয়ে বললেন, 'দেখেন, কী রকম হারামজাদা।' তিনি বললেন, 'আপনাকে বলে রাখি, দেখবেন, আনন্দবাজারকে আমি একটু শিক্ষা দেব।'

আমি ইলিয়াস ভাইকে কদাচিৎ রাগ করতে দেখেছি। সেদিন দেখলাম, রাগে তার নাকমুখ লাল হয়ে উঠল। এক প্রজাতির সাপ আছে ক্ষেপে গেলে লেজের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফোঁস ফোঁস করে। ইলিয়াস ভাইয়ের ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটি দেখে আমার লেজের ওপর দণ্ডায়মান সাপের কথা মনে পড়ে গেল।

তারপরে ইলিয়াস ভাই ঠিক করলেন, 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি লিখবেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'আপনার প্রতিভা উপন্যাস-লেখকের। আপনি আজেবাজে কাজে ক্ষমতার অপচয় করছেন। মনে করে দেখুন, বঙ্কিম যদি উপন্যাসগুলো না লিখতেন, তাঁর কথা কে মনে রাখত?'

আমার সব সময় জ্বরজ্বারি থাকত। তার ওপর সর্বক্ষণ হাঁপানি। ইলিয়াস ভাই সব সময় বলতেন, 'শরীরটার দিকে নজর রাখবেন। আমাদের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা প্রয়োজন। চিন্তা করে দেখুন, রবীন্দ্রনাথ যদি ষাট বছর বয়সেও মারা যেতেন, সেটাকেও আমাদের অকালমৃত্যু হিসেবে মেনে নিতে হত। কারণ তখনো রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় হাত দেননি, 'সভ্যতার সংকট' লেখেননি। 'বলাকা', 'শেষের কবিতা', 'চতুরঙ্গ' এগুলো সব রবীন্দ্রনাথের ষাটোর্ধ বয়সের রচনা।'

একটা বিষয়ে আমার সঙ্গে ইলিয়াস ভাইয়ের মতের চমৎকার মিল ছিল। আমরা দু'জনই মনে করতাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি জাতির মস্ত ক্ষতি করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিমাণ ক্ষতি করে গেছেন সেই জিনিসটি প্রাঞ্জলভাবে যদি ব্যাখ্যা করা না হয় বাঙালি জাতি আপন মেরুদণ্ডের ওপর থিতু হয়ে দাঁড়াবার অবস্থানটি খুঁজে পাবে না। তাঁর বাড়িতে আমি একদিন খেতে গিয়েছিলাম। খাওয়ার আগে তিনি তার 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের বিষয়বস্তুটি আমার সঙ্গে আলোচনা করে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'জানেন ছফা, ভবানী পাঠক এবং ফকির-মজনু শাহ দু'জন মিলে যখন বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করছিল, সেই সময়ের আবহের মধ্যে আমি 'খোয়াবনামা'টি স্থাপন করতে চাই। আসলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত যুদ্ধকে বঙ্কিম একা হিন্দুদের যুদ্ধ দেখিয়ে 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস দু'টি লিখেছেন। আধুনিক বাঙালি জাতীয়তার সামগ্রিক বিকাশের আদিপাপ

কোথাও যদি সন্ধান করতে হয় উপন্যাস দু'টির মধ্যেই করতে হবে। বঙ্কিম যে ঐতিহাসিক অন্যায় করে গেছেন আমার লেখাটি হবে তার একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ।'

ইলিয়াস ভাই তো 'খোয়াবনামা' লিখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর বাড়িতে গেলেই শুনি খটখট টাইপ রাইটারের শব্দ হচ্ছে। এখানে বলে রাখা উচিত, ইলিয়াস ভাই সমস্ত লেখা টাইপ রাইটারে লিখতেন, মায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পর্যন্ত। তাঁকে খবর দিয়ে অনেকক্ষণ ড্রইং রুমে বসে থাকতে হত। ধরুন আধঘণ্টা অনেক সময় তারও বেশি। তিনি পাজামার ফিতা আটকাতে আটকাতে দুঃখ প্রকাশ করতেন, 'সরি ছফা, অনেকক্ষণ বসে আছেন। লেখাটি আটকে রাখল।' বাড়িতে ইলিয়াস ভাই সব সময় পাজামা পরতেন। যাহোক, তিনি ড্রইং রুমে এসে পাইপ খোঁচাখুঁচি করতেন। এক সময় ইলিয়াস ভাই পাইপের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি যখন সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছিলাম, ইলিয়াস ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার জন্য কী আনব?' তিনি বললেন, 'আমার জন্য একটা ডাটিয়াল পাইপ আনবেন।' আমার বিশেষ টাকাপয়সা ছিল না। তথাপি জুরিখ থেকে সাইত্রিশ ফ্রাঙ্ক খরচ করে ইলিয়াস ভাইয়ের জন্যে পাইপ কিনেছিলাম। সেটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি পাইপটি মুখে দিয়ে বলতেন, 'আপনার জিনিসের বরকত পরীক্ষা করে দেখুন। এই পাইপ টানতে টানতেই লেখাটা লিখছি।' আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'কেমন হচ্ছে?' তখন তার চোখে মুখে একটা স্বপ্নালু ছায়া নেমে আসত। 'খুব ভাল হচ্ছে ছফা। যখন লিখি আনন্দে বিভোর হয়ে থাকি। কোন কিছু জ্ঞান থাকে না।' ইলিয়াস ভাই তাঁর রচনার কোন অংশ কাউকে দেখাতে চাইতেন না।

পনের বিশ দিন পরে আরো একবার ইলিয়াস ভাইয়ের কে. এম. দাস লেনের বাড়িতে গেলাম। সে রাতে খাওয়ার কথা এবং ভাবীর রান্নার হাত চমৎকার। ইলিয়াস ভাইয়ের মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। তিনি তার ড্রইং রুমে স্তূপাকার পরীক্ষার খাতা দেখিয়ে বললেন, 'জানেন ছফা, মাত্র দশ হাজার টাকার জন্যে আমাকে এ জঞ্জাল-স্তূপ পরিষ্কার করতে হবে। লিখব কখন। সে সময়ে ইলিয়াস ভাইয়ের মাও অসুস্থ হয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতে এসেছিলেন। ইলিয়াস ভাইকে বাইরে দেখতে ছন্নছাড়া মনে হলেও তিনি ছিলেন পুরোপুরি পারিবারিক মানুষ এবং পরম মাতৃভক্ত সন্তান। মায়ের সামান্যতম অসুবিধার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। আমার এখনো মনে হচ্ছে, মায়ের সুবিধার জন্যে টয়লেটে একটি কমোড বসাতে তিনি কী রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন।

ইলিয়াস ভাইয়ের 'চিলেকোঠার সেপাই' আমি অনেক দেরিতে পড়ি এবং সে জন্যে মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হয়ে যাই। সে গ্লানিবোধ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বইটির ওপর একটি অনুপ্রাণিত রচনা লিখি। বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করি। মুখ্যত এ রচনাটি আমাকে ইলিয়াস ভাইয়ের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এ লেখাটি লিখতে গিয়ে ইলিয়াস ভাই কত বড় লেখক সে ব্যাপারে একটা ধারণা নির্মাণ করার সুযোগ আমি পেয়ে যাই।

ইলিয়াস ভাইয়ের সেকথাটি আমার মনে খুব রেখাপাত করেছিল 'মাত্র দশ হাজার টাকার জন্যে আমাকে এ জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে।' আমি টেলিফোন করে বললাম, 'ইলিয়াস ভাই, খাতা আপনি ফিরিয়ে দেন, টাকা আমি ম্যানেজ করে দেব। তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই তো গরিব মানুষ, টাকা কোত্থেকে দেবেন।' আমি বললাম, 'সে আমার ব্যাপার।' তিনি বললেন, 'আপনার টাকা থাকলে অবশ্যই আমি খুশি হয়ে নিতাম। অন্যের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে আমাকে দেবেন সে টাকা আমি নিতে পারি না।' তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ।'

আমার ভাইয়ের ছেলে নূরুল আনোয়ার ঢাকা কলেজে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সামান্য ঘাটতি ছিল। ইলিয়াস ভাই আপনা থেকে উদ্যোগী হয়েই ইতিহাসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন ছেলেটির একটি হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করে দেন। কে. এম. দাস লেনের ভাড়াটে বাড়ি থেকে আজিমপুর সরকারি কোয়াটারে আসার এক সপ্তাহ আগে আমাকে টেলিফোন করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'বর্তমান অধ্যক্ষ খুব তাড়াতাড়ি বদলি হতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে আমি আনোয়ারের সিটের কথা বলেছি। আনোয়ার যেন চেষ্টা করে।'

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'স্টুডেন্ট ওয়েজ' আমার ৫টি উপন্যাস একসঙ্গে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। ইলিয়াস ভাইকে আমি একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। বলাবাহুল্য ইলিয়াস ভাই এক সপ্তাহের মধ্যে সে ভূমিকা লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ইলিয়াস ভাইয়ের ওপর লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করার জন্যে আমি দুঃখিত।

ইলিয়াস ভাই যখন লিখতেন সে বিষয়ে কোন কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন না। লিখতে কোথাও ঠেকে গেলে, মনে কোন সংশয় জন্মালে টেলিফোন করে বলতেন, 'ঠেকে গেছি উদ্ধার করে দিন।' একদিন বললেন, 'আপনি আমাকে এমন একজন মুসলিম নেতার নাম বলুন যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছিলেন।' আমি কৃষক নেতা হাজী দানেশের নাম বলেছিলাম। তিনি বললেন, 'চলবে না। হাজী দানেশ অনেক পরের মানুষ। আমার একজন পূর্ববর্তী সময়ের মানুষ প্রয়োজন।' আমি বললাম, 'মনে আসছে না, পরে বলব।' তিনি বললেন, 'কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু।' আরেকবার ফোন করলেন। 'এই যে মুসলমানরা যে পুঁথিসাহিত্য রচনা করেছেন তার কিছু নমুনা আমার প্রয়োজন। আপনি তো পুঁথি নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। এ বিষয়ে আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন কি না।' আমি জানালাম, 'আমি কোন জিনিস সঞ্চয় করে রাখি না। আপনি এক কাজ করুন সোজা ইসলামপুর চলে যান, ওখানে তাজ লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি এরকম অনেক ইসলামী প্রকাশনার দোকান দেখতে পাবেন। ওই সমস্ত দোকানে ইউসুফ-জুলেখা, আমীর হামজা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, কাসাসুল আম্বিয়া এরকম অনেক ইসলামী বিষয়ের পুঁথি কিনতে পাওয়া

যায়। দু' চারদিন এসব পুঁথি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে পুঁথির ভাষাটা খুব সহজেই আপনি আয়ত্ত করে ফেলবেন, তারপর দেখবেন নিজেই আপনি পুঁথিসাহিত্য রচনা করছেন।' এ গ্রন্থে পাঠকের জ্ঞাতার্থে এটা জানানো প্রয়োজন, যে সকল পুঁথির পংক্তি কিংবা অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে সবগুলো ইলিয়াস ভাই নিজেই লিখেছেন। পুঁথিসাহিত্য আসলে মধ্যযুগীয় মানসফসল। ইলিয়াস ভাই পলাশীযুদ্ধ পরবর্তী সময়টাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে যেয়ে এই মধ্যযুগীয় মানস হুবহু উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। এগুলো কোন পুঁথি থেকে আহরণ করে তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন বলা হলে, খুব কম পাঠকের মনে কোনো রকম সন্দেহ জন্মাবে। আমি যখন 'খোয়াবনামা' তৃতীয়বার পাঠ করি, মাত্র একটি জায়গায় আমার হোঁচট খেতে হয়েছে। একটি পংক্তিতে ইলিয়াস ভাই 'কার্পাসের বালিশ' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। এখানেই একটু লাগে। মধ্যযুগের কোন পুঁথি লেখক 'কার্পাসের বালিশ' শব্দবন্ধটি এভাবে ব্যবহার করতেন না। মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে ইলিয়াস ভাই এন্তার পুঁথিসাহিত্যের স্তবক, অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে ব্যবহৃত পুঁথিসাহিত্যের পংক্তিগুলো এক জায়গায় গ্রথিত করে প্রকাশ করলে ছোটখাটো একটা পুঁথি দাঁড়িয়ে যাবে। এ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব। ইলিয়াস ভাই কত সতর্কতার সঙ্গে 'খোয়াবনামা'র কাহিনীটি বিকশিত করে তুলেছেন।

এখন আবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আরেকদিন ইলিয়াস ভাই টেলিফোন করে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিলেন। সেদিনই দেখলাম, তিনি ভয়ানক চটে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'জনকণ্ঠ' পত্রিকা ধারাবাহিক খোয়াবনামাটি প্রকাশ করে আসছিল। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে তারা উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে বললেন, জানেন ছফা, কী রকম অভদ্র। লেখাটির প্রকাশ বন্ধ করছে সে সংবাদটি পর্যন্ত আমাকে জানানোর প্রয়োজনবোধ করেনি। ইলিয়াস ভাইয়ের মৃত্যুর পর 'জনকণ্ঠ' পত্রিকার তরফ থেকে এক ভদ্রলোক 'ইত্তেফাকে'র শুক্রবাসরীয় সংখ্যায় সাফাই গেয়ে লিখেছেন, মাত্র তিন চার কিস্তি বাকি থাকতেই লেখকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি না পেয়ে তারা 'খোয়াবনামা'র প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'খোয়াবনামা'র এক জায়গায় আনন্দ বাজারের সমালোচনা ছিল। আমার ধারণা, সে কারণেই প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিল। 'জনকণ্ঠ' পত্রিকার এ সাফাই কাটা গায়ে নুনের ছিটার মত মনে হয়েছে। শুধু 'জনকণ্ঠ' কেন, 'দৈনিক সংবাদ'-এ যখন 'চিলেকোঠার সেপাই' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল মাত্র তিনটা কিস্তি ছাপার পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ একতরফা 'চিলেকোঠার সেপাই' প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই সমস্ত কথা বলার কোন অর্থ হয় না। তবু বলছি এ কারণে, আমাদের দেশের যেসব পত্রিকা নিজেদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলে বড়াই করে, সংস্কৃতির প্রতি তাদের অঙ্গীকার কতটুকু গভীর, সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে এ কথাগুলো বললাম।

'খোয়াবনামা' লেখার শেষ পর্যায়ে ইলিয়াস ভাই ক্রমাগত বলতে থাকলেন, আমার কোমরে ভীষণ ব্যথা। টাইপ রাইটারের সামনে বসতে পারি না। লেখাটি শেষ করতে পারবেন কি না মাঝে মাঝে এরকম হতাশাও প্রকাশ করলেন। তারপরেও তিনি টাইপ রাইটারের লিখে যেতে থাকলেন। মাওলা ব্রাদার্সে বইটি ছাপা হচ্ছিল। যতটুকু টাইপ করছেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ইলিয়াস ভাই ডাক্তার দেখাতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারদের অনেকেই মনে করলেন, এটা নিউরোলজি সংক্রান্ত কোন রোগ হবে। তাদের কেউ কেউ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বেদনানাশক ওষুধ তাঁকে ব্যবহার করতে দিলেন। এই কষ্ট, এই দুঃখ, এই যন্ত্রণার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে 'খোয়াবনামা' লেখার কাজ শেষ কররেন। বইটি প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই এখানকার ডাক্তাররা বললেন, তাঁর রোগটা আসলে ক্যান্সার। ইলিয়াস ভাইকে চিকিৎসার জন্যে কোলকাতা যেতে হল এবং সেখানে তাঁর একটা পা কাটা গেল।

ইলিয়াস ভাইয়ের জৈবিক অস্তিত্ব যখন অর্ধেকে রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ তার শরীর থেকে একটা অঙ্গ বাদ দিয়েছে সে সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানালেন, তাঁর 'খোয়াবনামা' গ্রন্থটিকে তারা আনন্দ পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইলিয়াস ভাই তখন শিশুর চাইতে অসহায়। দেশ-গ্রাম, আত্মীয়-স্বজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রতি মুহূর্তে টাকার প্রয়োজন। তথাপি তিনি বললেন, 'আমার এ বইতে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকার' বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছি। আমাকে আনন্দবাজারের পুরস্কার দেওয়া উচিত হবে না।' আনন্দবাজার বললো, 'তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা একটি সাহিত্য গ্রন্থকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করছি।'

ইলিয়াস ভাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যে মতামত প্রকাশ করে, রাজনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে তার প্রতিবাদ করার জন্যেই 'খোয়াবনামা' গ্রন্থটি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইলিয়াস ভাইকে 'আনন্দবাজার পুরস্কার' গ্রহণ করতে হল। আনন্দবাজারের দুর্ভাগ্য এই জায়গায় যে, মাত্র দু'বছর আগে যাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করার অযোগ্য একজন লেখক ধরে নিয়েছিল সে আনন্দবাজার পুরস্কার দিল ইলিয়াসকে। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। ইলিয়াস ভাইয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় ছিল না।

যা ঘটে গেছে আর তো ফেরানো যাবে না। তথাপি আমরা লেখক শিবিরকে অভিযুক্ত করব। ইলিয়াস ভাই ছিলেন লেখক শিবিরের সভাপতি। লেখক শিবির দীর্ঘদিন থেকে আনন্দবাজারীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আসছিল। কষ্টে পড়ে ইলিয়াস ভাইকে যখন আনন্দবাজারের টাকা নিতে হল লেখক শিবিরের কর্তাব্যক্তিরা ইলিয়াস ভাইয়ের জন্যে কিছু করতে এগিয়ে এলেন না। তাঁরা যদি দেশের সংস্কৃতিপ্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখতেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিকিৎসার জন্যে তিন লাখ টাকার একটি তহবিল আমাদের সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ যতই গরিব হোক না কেন, সে অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব হত

না। একথা জোরের সঙ্গে আমি বলতে পারি। 'খোয়াবনামা' গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ের পুরো ক্ষমতা এখনো আমার হয়নি। তথাপি এই বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, তা হল ভাষা। প্রসঙ্গত উনিশ 'শ চুরানব্বই সালে কোলকাতার সেই সাহিত্য সম্মেলনটির কথা উল্লেখ করতে চাই। যে সভায় ইলিয়াস ভাই জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রকাশরীতিটি পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের প্রকাশরীতির চাইতে আলাদা হবে। এই কথা বলার জন্যে আনন্দবাজার ইলিয়াস ভাইকে ডিনারে নিমন্ত্রণ না করে অপমান করেছিল। ইলিয়াস ভাই বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে ইলিয়াস ভাইয়ের গদ্য কতদূর সরে এসেছে 'খোয়াবনামা'র পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়, ইলিয়াস ভাই এ গ্রন্থে তা প্রমাণ করেছেন। যে 'আনন্দবাজার' বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা আলাদা হবে, একথা বলায় ইলিয়াস ভাইকে অপমান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম হিসেবে 'খোয়াবনামা'কে পুরস্কৃত করতে বাধ্য হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলা নেয়া প্রয়োজন। আধুনিক যে বাংলাভাষা, তার জন্ম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অভিধান ঘেঁটে আধুনিক বাংলা ভাষার জন্ম প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে যে একটি ভাষারীতি গড়ে উঠছিল, বৃটিশ শাসনের পর তাতে একটি ছেদ পড়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার সময় ফারসি-উর্দু মিশ্রিত বাংলা ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাষা রীতিটি আলালীরীতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য সে পথে অগ্রসর হয়নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের সৃষ্ট ভাষারীতিটির সঙ্গে ভাগিরথী পাড়ের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষার সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষে আধুনিক বাংলা ভাষাটি বিকশিত হয়েছে। এই বাংলা ভাষা বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা নয়। সরকারি ইশতেহার, সংবাদপত্র, মুদ্রণালয় এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এই ভাষাটি বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই ভাষার উন্মেষ, বিকাশ সবটাই ঔপনিবেশিক আমলে ঘটেছে। ইলিয়াস ভাইয়ের এ রচনাটির ঔপনিবেশিক আমলসৃষ্ট বাংলা ভাষাকে পাশ কাটিয়ে জনগণের মুখের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির একটা মহৎ প্রয়াস বলে অনায়াসে ধরে নেয়া যায়।

পশ্চিম বাংলার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ এ রচনাটিকে অভিনন্দিত করেছিল, তার একটা কারণ এই যে, বাংলা ভাষার বিকাশ সেখানে একটা পর্যায়ে থমকে আছে। হিন্দি ভাষার বাতাবরণ ভেদ করে জাতীয় জীবনে কোন ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা বাংলা ভাষায় নেই। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে প্রাণরস আহরণ করে ভাষা প্রাণশক্তিতে বেগ-আবেগ সৃষ্টি করবে সেরকমও কোন পথ খোলা নেই। ইলিয়াসের এই নতুন ভাষারীতিটির মধ্যে পশ্চিম

বাংলার কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ নতুন একটি প্রাণশক্তির দ্যোতনা অনুভব করেছেন। সে কারণে ইলিয়াস ভাইয়ের এ রচনাটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে তাঁদের আটকায়নি।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি কথাও ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচনার পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের যে যৌথ জাতীয় অস্তিত্ব তা খণ্ডিত করা হয়। ইতিহাসের অধিকার থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করে হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী অংশকে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি এই দুই বিচ্ছিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে বিকশিত হতে থাকে। তার পেছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবদান অবশ্যই রয়েছে। ইলিয়াস ভবানী পাঠক এবং মজনু শাহকে সংগ্রামের একই পাটাতনে দাঁড় করিয়ে একটি অবিভাজ্য জাতীয় অবস্থান নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছেন। বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীদের বিরাট একটি অংশ এ অখণ্ড জাতীয় অবস্থানকে মনে মনে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা ইলিয়াস ভাইয়ের গ্রন্থটা অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

ইলিয়াস ভাইয়ের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় তাঁর ওপর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'খোয়াবনামা'র বিষয়েও অনেকে অনেক কথা বলেছেন। সেগুলো আমাদের ব্যথিত এবং হতাশ করেছে। যেহেতু পশ্চিম বাংলার গুণী ব্যক্তিরা 'খোয়াবনামা'র অজস্র তারিফ করেছেন সে জন্যে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্যে তাঁরা ইলিয়াস ভাইকে পাস মার্ক দিতে বাধ্য হয়েছেন।

সে সমস্ত কথা থাকুক। আমার এই বিক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় আমি একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই যে, 'খোয়াবনামা' প্রকাশের পর বাংলাদেশের সাহিত্য বিশ্ব পরিসরে একটি অবস্থান নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের কাছে রচনাটি আমরা তুলে ধরতে পারব না, সে আমাদের অক্ষমতা। কিন্তু ইলিয়াস ভাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন কার্পণ্য করেননি। এ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। শুধু বাংলাদেশের নয়, বাংলা সাহিত্যের লেখক-পাঠকের সামনে ইলিয়াস ভাই একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। আমরা সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং পথপ্রদর্শকের গৌরব অবশ্যই তাঁকে দেব।

উত্থানপর্ব
প্রথম সংখ্যা : ১লা চৈত্র্য ১৪০৩, ১৫ মার্চ ১৯৯৭

যৎকিঞ্চিৎ বিনয় মজুমদার

আমি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আমার যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন আমাকে কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে আমি যেভাবে শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম সে অনুভবটি আমার মনে এখনো তাজা রয়েছে। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা পুকুর ছিল। চারপাশটা ছিল গাছগাছালি দিয়ে ঢাকা। বাড়ির মেয়েরাই এ পুকুরটা ব্যবহার করত। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে ছিল একচিলতে জমি। সেখানে সুদিনের সময়ে মাচা করে করলা এবং শশার চাষ করা হত। এই শশাক্ষেতের পাশে বসেই এক বিকেলে আমি নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' পাঠ করেছিলাম। আমি তখন নিতান্তই ছোট। অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের মর্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা তখনো আমার জন্মায়নি। তথাপি শব্দের পাশে শব্দ বসিয়ে একজন মানুষ অন্তরের প্রচণ্ড আবেগকে এমনভাবে মুক্তি দিতে পারে আমার জীবনে প্রথমবারের মত সেরকম একটা অভিজ্ঞতা হল। এই কবিতার রেশ আমাকে প্রায় মাসখানেক ধরে চঞ্চল এবং উতলা করে রেখেছিল। আমি ১৯৬০ সালের দিকে কবি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থটি আগাগোড়া পাঠ করি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, খুব সম্ভবত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'গীতাঞ্জলি'-র একটা সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশ করেছিল কে মনে নেই, হতে পারে বিশ্বভারতী কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করার পর অন্যরকম একটা ভাবাবেগ আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে।

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রকাব্যের বাঘা বাঘা সমালোচকদের আলোচনায় রবীন্দ্রদর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে অনেক গভীর এবং অনেক গহনতত্ত্ব আমাকে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে, যেগুলো কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করে যে একটা চরাচরপ্লাবী শান্ত আবেগ আমার মনের চারধারে ঘনিয়ে উঠেছিল, যেভাবে আমি নিজেকে আকাশ-বাতাস, পাখ-পাখালি, তরুলতা-চরাচরের অংশ বলে মনে করতে পেরেছিলাম সেই উপলব্ধিটি আমার ধারণা মৃত্যুর ক্ষণটিতেও আমি বিস্মৃত হতে পারব না।

রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে নানা সময়ে অনেক অপ্রিয় এবং অশোভন মন্তব্য আমাকে করতে হয়েছে। আর সেজন্য আমার মনে কোন ধরনের অনুশোচনাও নেই। তথাপি আমি বলব কিশোর বয়স পেরিয়ে যৌবনের সিঁড়িতে পা রাখার সময়

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য আমাকে এমন একটা বিশুদ্ধ অনুভূতির জগতে পৌঁছে দিয়েছিল যে সেটাকে সমগ্র জীবনের একটা মূল্যবান সঞ্চয় হিসেবে গ্রহণ করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।

আমার স্কুল-কলেজের পড়াশুনা হয়েছে গ্রামে। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র খুবই সীমিত। হঠাৎ করে যখন প্রকাশ পেয়ে যায় কোন লোক কবিতা কিংবা গল্প লিখছে সে বেচারার দুর্দশার অন্ত থাকে না। আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান সমাজে কবি আলাওলের প্রচণ্ড প্রভাব। যে বাড়িতে আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র পুঁথিখানি পাওয়া যেত সে বাড়িকে সম্ভ্রান্ত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হত। আর যে ব্যক্তি 'পদ্মাবতী' পুঁথির অর্থ আমজনগণের কাছে বোঝাতে পারতেন, তাকে বলা হত পণ্ডিত। এই অল্প কিছুদিন আগেও জনসমাজে এই ধরনের পণ্ডিতদের খুব কদর ছিল। চট্টগ্রামে কবি বা লেখক মাত্রকেই বলা হত আলাওল। কোন কৃষক যখন কবিতা বা গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হত এবং সেটা যখন অন্য দশজন জেনে যেত, সে লেখক বা কবি দশজনের চোখে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠত। সকলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলত, অমুকের ছেলে কিংবা অমুকের নাতি অমুক আলাওল হয়ে যাচ্ছে। আমার কৃতকর্মের গুণে আলাওল টাইটেলটা আমার ভাগ্যেও জুটেছিল, হাজার চেষ্টা করেও ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। আমার কিশোর বয়সের বন্ধু-বান্ধব এখনো যারা বেঁচে রয়েছে তাদের কেউ কেউ বাজারে আমাকে দেখলেই গলার স্বরটা লম্বা করে চিৎকার করে ডাক দিয়ে থাকে, এই আলাওল এদিকে এ।

গ্রামের আলাওল পরিচয়টা ধারণ করে আমি শহরে এসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন-এর বাইরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন লেখকের লেখা পড়ার সুযোগ বড় একটা ঘটেনি। অবশ্য শরৎচন্দ্রের অনেকগুলোর বই আমি পড়ে ফেলেছিলাম। এ ছিল বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান গরিমার পরিধি।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হলাম, আমার অবস্থা হল বাঁশবনে ডোমকানার মত। বন্ধু-বান্ধবেরা যে সমস্ত কবি-লেখকদের নিয়ে মাতামাতি করছে তাদের একজনকেও আমি চিনিনে। আমার স্কুল-শিক্ষক শিববাবু আমাকে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ এ সমস্ত কবিদের কাব্য পাঠ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য এমনকি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কেও কোন রকম উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীন, শরৎচন্দ্রের লেখা পাঠ করেছিলাম।

আমরা যে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, সে সময়টাও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। তরুণ যারা লেখালেখি করছেন তাদের একদল জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করতেন। অন্যদল যারা বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন অথবা বামপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কবিকিশোর সুকান্ত তাদের চিন্তা-ভাবনার অনেকখানি অধিকার করে

নিয়েছিল। আমি সেই গ্রাম থেকেই একটি রাজনৈতিক ঘরানার অনুসারী হিসেবে এসেছিলাম। তাই সুকান্ত আমার প্রিয় কবি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু একটা ছোটখাট অঘটন ঘটে গেল।

রফিক আজাদ এবং শহীদুর রহমান আমার ক্লাসফ্রেন্ড। রফিক কবিতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিল এবং শহীদ লিখত গল্প। আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এই যে, সে অল্পবয়সে মারা যায়। নানা কারণে মারা যাওয়ার অনেক কাল আগে থেকেই তার লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। রফিক এবং শহীদেরা একসঙ্গে একটি নতুন সাহিত্যাদর্শ সন্ধান করছিল। তার ফলে জন্ম নিয়েছিল স্বাক্ষর গোষ্ঠী। এই স্বাক্ষর গোষ্ঠীর কবি-লেখকেরা নিজেদের কখনো এ্যাংরি, কখনো হ্যাংরি কিংবা কখনো স্যাড জেনারেশনের লেখক-সাহিত্যিক বলে নিজেদের চিহ্নিত করতে চাইতেন। অল্প কিছুদিন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে মেশামেশি করলেও তাদের মতবাদ গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরেও রফিক এবং শহীদের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক আমার ছিল।

রফিক আজাদ একদিন আমাকে একটি ছিপছিপে কবিতার বই পড়তে দেয়। মলাটে নাম দেখলাম 'রূপসী বাংলা'— কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। এই 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করার পর আমি অনুভব করতে থাকি আমার মধ্যে একটা নীরব বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করে আমি যেরকম অভিভূত হয়েছিলাম 'রূপসী বাংলা' পাঠ করার পর আমার মধ্যে সে বিস্ময়বোধ জন্ম নিচ্ছিল। গুণগতভাবে 'অগ্নিবীণা' এবং 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করার বিস্ময়বোধের সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'অগ্নিবীণা' এবং 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করার পর আমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু 'রূপসী বাংলা' পাঠ করার পর আমার মনে হচ্ছিল একটা বোধ, এটা উপলব্ধি আমার মনে পাষাণের মত নিরেট হয়ে জমছিল।

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমি জীবনানন্দে অনুপ্রবেশ করি। অদ্যাবধি জীবনানন্দ দাশ পাঠ করা আমার সমাপ্ত হয়নি। প্রতিবার পাঠ করার পর নতুন নতুন উপলব্ধি আমার মানসে জমে ওঠে। তথাপি জীবনানন্দ দাশের মধ্যে একটি প্রবাহমান মর্বিডিটি রয়েছে, সেটা আমি পছন্দ করিনে। তাছাড়া জীবনানন্দ দাশ মূলত অবচেতনের কবি। আমার ধারণা জীবনানন্দ দাশের সমালোচকেরা তার মূল্যায়নের বেলায় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এরপর আমি বিনয় মজুমদারের কথা বলব। ১৯৬৮ সালে শরৎকালে এক সন্ধ্যাবেলায় প্রয়াত তরুণ কবি আবুল হাসান বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং-এ আমাকে বিনয় মজুমদার রচিত 'ফিরে এসো, চাকা' বইটি পড়তে দেয়। বিউটি বোর্ডিং ছিল শিল্পী-সাহিত্যিকদের জমজমাট আড্ডাস্থান। হৈ চৈ এবং চিৎকারের মধ্যেও আমি যখন বিনয় মজুমদারের কবিতাগুলো পড়তে আরম্ভ করি, আমার মনের ভেতরে অন্যরকম একটা দোলা অনুভব করতে থাকি। এইটা একটা ব্যাপার, অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করে বললে ভেতর থেকে ধাক্কা দেয়ার সঙ্গে

তার তুলনা করা যায়। সাহিত্য শিল্পে যখন কোন লেখক কিংবা কবির লেখায় নতুন উপাদান ভর করে পাঠকের মনে অনিবার্যভাবেই একটা ধাক্কা দিয়ে থাকে। তবে সব পাঠকের নয়। সব পাঠকের মন-মানসিকতা নতুন জিনিসের মর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে না। যা হোক, বিনয় মজুমদারের কথায় আসি। আবুল হাসান আমাকে 'ফিরে এসো, চাকা' বইটি এক সপ্তাহ মত সময় রাখতে দিয়েছিলেন।

আমি আধুনিক কবিতার ঠিক একনিষ্ঠ পাঠক ছিলাম না। অন্য অনেক বিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি আধুনিক কবিতাও পাঠ করতাম। তাই কবিতার ভালমন্দ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন সিদ্ধান্ত আসার মত একরৈখিক মনোভাবও আমার জন্মাতে পারেনি। তারপরেও কমল কুমারের কবিতাগুলো পাঠ করার পর আমার মনে হতে থাকল আমার ভেতরে একটা দাহনক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই কবির রচনার শরীরে এমন একধরনের সুপ্ত আগুন রয়েছে যা আমার মনের ভেতর একটা মৃদু প্রীতিপদ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আমি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। তাঁর কাব্যিক উচ্ছ্বাসের তারিফ করতেও আমার বাধেনি। বিষ্ণু দে'র কবিতার মর্ম গ্রহণ করার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, অন্যরকম নির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য একসময়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ত্রিশের প্রধান কবিদের রচনা পাঠ করার পেছনে যে সময় এবং শ্রম আমি ব্যয় করেছি তার শতাংশের এক অংশ কমলকুমারের জন্য করিনি। দীর্ঘদিন পর যখন আমি কবিতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়ার চেষ্টা করছি, আমি বুঝতে পারছি কমল কুমার আমার মনে একটি বড় জায়গায় অধিকার করতে বসে আছে। এটা কী করে সম্ভব হল? এই প্রশ্ন আমি নিজেকেই করেছি। নিজেই একটা উত্তর টেনে আনার চেষ্টা করছি। কতিপয় কবি রয়েছেন, যাঁরা কবিতার ধারার ভেতর থেকে জন্মান। তাঁদের সাফল্য অল্প হতে পারে কিংবা বেশি হতে পারে, সেটা বড় কথা নয়। পূর্বাপর কবিতার ধারা পরম্পরার মধ্যেই তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা বিচার করতে হবে। আর কিছু কিছু কবি আছে চেতনাগত দিক দিয়ে তাঁদের কবি হওয়া প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এই ধরনের কবিরা কবিতার ধারার মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ করেন। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকত্ব এত প্রখর যে সেটাই তাঁদের চেনার নিশানা হিসেবে গণ্য করা যায়। এই রচনাটি দীর্ঘ করার বিশেষ অবকাশ নেই। বিনয় মজুমদার সম্পর্কে আমার মনে যে কথাগুলো জমেছে বলে ফেলতে চাই। বিনয় নানাগুণে গুণান্বিত পুরুষ। তিনি যদি কবিতা না লিখে অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করতেন, আমার ধারণা অনায়াসে সিদ্ধি অর্জন করতে পারতেন। তাঁর নানারকম যোগ্যতা এবং পারঙ্গমতা ছিল। তিনি সব বাদ দিয়ে শুধুই কবিতার সঙ্গে লটকে রইলেন। এইটা একটা অবাক ব্যাপার। অথচ বিনয়ের ক্ষেত্রে এটাই সত্য হল। আমাদের মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। একজন মানুষ যখন প্রেমে পড়ে সেখানে ভালমন্দ বাছবিচারের প্রশ্নটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। কবিতার প্রতি তাঁর আত্যন্তিক প্রেম এবং অনুরাগ বিনয় মজুমদারকে অনেকটা মানসিকভাবে

আত্মহননের পথে ধাবিত করে নিয়ে গিয়েছে। অথচ বিনয় যদি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারতেন, তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভার সম্যক বিকাশ যদি ঘটত, তাহলে বাংলা সাহিত্য একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে পেত না শুধু, পাশাপাশি একজন মনীষী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে ধন্য হতে পারত।

যে সমাজের মধ্যে বিনয় মজুমদার বসবাস করে আসছিলেন, সে সমাজের সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের স্বীকার বিনয়কে হতে হয়েছিল, এটা আপাত সত্য, কিন্তু পুরো সত্য নয়। বিনয়কে নানা কারণে বারবার ঠাঁই নাড়া হতে হয়েছে, যা তাঁর সাহিত্যচর্চা নয়, জীবনটাই আগাগোড়া পাল্টে দিয়েছে। শুরুতেই যদি বিনয় একটি সংগ্রামী অবস্থান গ্রহণ করতেন, তাঁকে অভিমানী বালকের মত জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বেড়াতে হত না। হ্যাঁ, বিনয়ের মনে একটা প্রবল অভিমান ছিল এবং এখনো আছে। আর সে অভিমান মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের একাংশের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন হল তিনি কি তাঁদের বাইরে যেতে পেরেছেন? এখন বিনয়কে যাঁরা অনুকম্পাসহকারে স্মরণ করেন, তাঁর কবিতার মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে নিজেদের অপরাধ বোধের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান তাঁরাও তো মধ্যবিত্ত-প্রায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদেরই একটা অংশ।

লেখক, বিনয় মজুমদার সংখ্যা
বইমেলা ২০০১

অচ্যুতবাবুর কথা

আমি জীবনে অচ্যুতবাবুর মত পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ অধিক দেখিনি। এই ভদ্রলোকটিকে আমি কোন অবস্থায় ধৈর্য হারাতে অথবা খেল হতে দেখিনি। তিনি সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতেন। নিজের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন এবং সংসারের নানাবিধ কর্তব্যকর্ম করে যেতেন।

অচ্যুতবাবুর ব্যবহারিক পরিচয়ের বাইরে আরেকটি পরিচয় ছিল। সে বিষয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্যে আমার এই রচনা। তিনি ছিলেন অক্লান্ত জ্ঞানসাধক। নতুন প্রকাশিত কোন বই হাতে নিলে তাঁর চোখে মুখে একটা আনন্দের ঝিলিক খেলে যেত। আমি খুব কাছ থেকে এই জিনিসটি দেখেছি। আরও দেখেছি পড়তে গিয়ে কোন আকর্ষণীয় অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তাঁর চোখজোড়া স্থির হয়ে যেত। একটা মানসিক চাঞ্চল্য তাঁর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি শোয়া অবস্থায় থাকলে উঠে বসতেন এবং বসা থাকলে একটু পায়চারী করতেন। আমার এখনো মনে পেতে পারেন— এ ব্যাপারে টেলিফোনে অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তখন ছিল স্কুল সীজন। বই-পত্র ছাপানোর ধুম পড়ে গেছে। আর অচ্যুতবাবু ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী। দিনরাত অবিরাম কাজ চলছিল। বলতে গেলে তাঁর কোন ফুরসত ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'অচ্যুতদা আপনি অধীর হয়ে বই-এর খোঁজখবর নিচ্ছেন, কিন্তু পড়বেন কখন?' তিনি স্মিত হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কাজ তো আছেই, যতদিন বেঁচে আছি কাজ তো থাকবেই। এরই মধ্যে এক ফাঁকে পড়ে নেব।

এই-ই হল অচ্যুতবাবু, যতই কাজ থাকুক প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়বেন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান এই এতগুলো বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞের মত কথা বলতে পারে। সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কলকাতা শহরে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিকে তাঁর নয় নম্বর এ্যান্টনী বাগানের বাড়িতে আমি আসতে দেখেছি। এই সকল বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করে যেতেন। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসার খুঁটিনাটিও তদারক করতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

তিনি জ্ঞানী ছিলেন। অনেক বিষয়ে প্রায় বিশেষজ্ঞই ছিলেন। অথচ তাঁকে সে ব্যাপারে কোন অভিমান প্রকাশ করতে কখনো দেখা যায়নি। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন এবং সকলকে সমান উদারতায় টেনে নিতেন। একবার যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে আমার বিশ্বাস, তাঁকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে ফুলের মত সুন্দর হাসিটি। এমন হাসি হাসতে পারে কয়জন? বিদ্যা, বিনয় এবং ঔদার্য এই তিনটি জিনিসই তাঁর চরিত্রে সমানভাবে মিল খেয়েছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে অচ্যুতবাবুর গোটা জীবনটাই একটা শিল্পকর্মের মত ছিল। দীঘলদেহী, গৌরবরণ এই সুদর্শন মানুষটি সবদিক দিয়েই ছিলেন সুন্দর। কোন রকমের মালিন্য কিংবা কুশ্রিতা তাঁকে স্পর্শই করতে পারত না।

অচ্যুতবাবুর স্বভাবের মধ্যে সৌন্দর্য এবং সারল্যের এমন একটা সম্মিলন ঘটেছিল যে অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির মানুষও তাঁর কাছাকাছি এলে সংযত হয়ে যেত। অচ্যুতবাবু দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। নিরন্তর জ্ঞানসাধনা তাঁকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। একবার দেখা করলে আবার দেখা করার ইচ্ছা জন্মাত। একবার কথা বললে আরেকবার কথা বলার পিপাসা জাগ্রত হত।

'মানুষ অমৃতের সন্তান' একথা অচ্যুতবাবুকে দেখলে ছাঁত করে মনে পড়ে যেত। তাঁর জিহ্বা দিয়ে কথাবার্তার আকারে অমৃতধারাই প্রবাহিত হত। বাইরের পৃথিবীর অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। সবটা তিনি করতেন একান্ত অনাসক্তভাবে। অত্যন্ত ছোট কাজটি করতেও তিনি কখনো কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তাঁর কাজ করার ধরনের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলাবোধ ছিল। সব কাজ যেন আপনা থেকেই হয়ে উঠছে। কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাড়াহুড়ো নেই। কোন কিছুর প্রতি আসক্তিহীনতার কারণেই সমস্ত কাজকর্ম অমন নিখুঁতভাবে করে যেতে পারতেন, অচ্যুতবাবুর জীবনযাপন প্রণালী দেখে তা মনে হয়েছে। একজন লোকের সর্বদিক দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠার জন্য কবি, লেখক, শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের ভেতরে জ্ঞান চর্চ্চার আরেকটি জগত সৃষ্টি করে নিতে পারলে সেই জগতের সূক্ষ্ম এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

আজ অচ্যুতবাবু বেঁচে নেই। তাঁর জ্ঞান সাধক মূর্তিটি আমার কাছে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। মৃত্যুর দশ-পনের দিন পূর্বে আমি এ্যান্টনী বাগানের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেটিই শেষ দেখা। দু'দিন থেকেই মানুষজনকে চিনতে পারছিলেন না। আমি যখন গেলাম তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং নাম উচ্চারণ করলেন। তারপর সে চূড়ান্ত অসুস্থ অবস্থাতেই কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। শারীরিক কষ্টের কথা কিছু বললেন না। স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। শুধু বললেন যে-সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করবেন বলে ঠিক করেছিরেন, সে সমস্ত বিষয়ে বিশদ জ্ঞানলাভ করতে হলে আরেকবার জন্মাতে হবে। আরেকবার কি জন্মাব? তাঁর দু'চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়েছিল।

অচ্যুতবাবুর তুলনারহিত সংযমের কথা বোধহয় লেখার শুরুতে উল্লেখ করেছি। তিনি চোখ মুছে নিয়ে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ যতটা স্বাভাবিক হতে পারে সেভাবে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। আমাকে জানালেন, তাঁর এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাটি পুরো একটা নতুন এডিশনের সেট সংগ্রহ করার খুবই ইচ্ছা ছিল। এবারে বোধহয় তা আর ঘটে উঠল না।

তার পরের দিন তো আমি কলকাতা থেকে ঢাকা চলে এলাম। তিন কি চার দিন পরে শুনলাম অচ্যুতবাবু আর বেঁচে নেই। এই মানুষটির কাছে এত ঋণে ঋণী যা শোধ করার চিন্তা করলেও মনে হয় পাপ করব। শুধু স্মরণ করে যাব।*

* 'অচ্যুতানন্দ সাহা স্মারক গ্রন্থে' এ লেখাটি ছাপা হয়েছিল। অচ্যুতানন্দ সাহা স্মৃতি রক্ষা কমিটি পুথিপত্র (কলিকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।—নূ. আ.

প্রস্তাবনা : সম্প্রীতি সুর

বাংলা গানের এই সংকলনটির নামকরণ করেছি 'সম্প্রীতি-সুর'। তার একটা হেতু আছে। সঙ্গীত সর্বাত্মকসাধিকা সাধনা। অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুর সাধনা করা সম্ভব। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবকিছুই সঙ্গীতের দ্বারা লভ্য। এরকম অত্যুচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমান অতি ব্যস্ত সময়ে সঙ্গীতসাধনা করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সঙ্গীত যে-কোন সংস্কৃতির প্রাণবহ্নিস্বরূপ। বাঙালি সংস্কৃতির সবচাইতে উজ্জ্বল মধুর অংশ তার সঙ্গীত।

বাংলা-জার্মান সম্প্রীতির মুখ্য উদ্দেশ্য এদেশের মানুষের সর্বমুখী উন্নয়নপ্রবাহে আরো একটু তেজ, আরো একটু গতি সঞ্চার করা। উন্নয়ন বলতে আমরা সমাজের বস্তুসম্পদের পাশাপাশি প্রাণসম্পদের উন্নয়নও বুঝিয়ে থাকি। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না, তার আরো কিছু প্রয়োজন। এই আরো কিছু হল তার সংস্কৃতি। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে, মাছ যেমন জলে বাস করে, ফুল যেমন গাছে ফোটে, তেমনি মানুষও তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বসবাস করে। সংস্কৃতির একেবারে অন্তরাল থেকে তার প্রাণের ইশারাটুকু উস্‌কে না দিয়ে বাইরের দিক দিয়ে মানুষকে যতই বস্তুসম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হোক না কেন, আখেরে তাতে বিশেষ ফল হয় না। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষকে ধনবান হতে হবে, কিন্তু তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস করি মানুষকে প্রাণবান হতে হবে। সংস্কৃতির নিবিড় গভীর কর্ষণ ছাড়া প্রাণবান হওয়া অসম্ভব। প্রাণ যদি না জাগে, যদি চিত্তের উর্ধ্বমুখী স্ফুরণ না ঘটে, তাহলে জন্তু-মানুষে, মানুষ-মানুষে উত্তরণ ঘটা অসম্ভব। সংস্কৃতি একটা স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল দর্পণস্বরূপ, যার বুকে জাতির চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধিত হলে মানুষের সর্বমুখী কল্যাণের পথ নির্বিঘ্ন এবং নিষ্কণ্টক হয়। আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত বটে, কিন্তু সংস্কৃতিকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক গুরুত্ব প্রদান করি বলেই গান আমাদের কাছে একটা বিশেষ আদরের বস্তু। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বংশানুক্রমে যে সঙ্গীতভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তা আমাদের পরম গর্বের বিষয়। বাংলা গান রচয়িতারা যে বিশাল চিত্তসম্পদের ভাণ্ডার রেখে গেছেন, আকাশের নক্ষত্রের মত তার পরিমাণ অজস্র এবং নক্ষত্রের কম্পমান তালের মতই উজ্জ্বল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে গরীয়ান সঙ্গীতের

ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন তা আমাদের জাতির জন্যে অমৃতভাণ্ডারস্বরূপ। আমাদের সংস্কৃতিকে যদি বৃক্ষ কল্পনা করা হয়, তার উজ্জ্বল, সুন্দর পুষ্পগুলো হল তার গান। বাঙালি কবির প্রথম ছন্দোবন্ধ উচ্চারণ হল চর্যাগীতি।

বাঙালি কবিদের চিত্তলোক থেকে পিঠেপিঠি ভাইবোনের মত গান এবং কবিতা দুই-ই জন্ম নিয়েছে। বাংলার প্রায় সমস্ত নামকরা কবি সেই আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগের সূচনাকাল পর্যন্ত কবিতার পাশাপাশি গান রচনা করেছেন। এটা শুধু বড় কবিদের বেলায় নয়, চারণ কবি, বাউল, সুফি-সাধক, কালীভক্ত, খ্রিস্টপ্রেমিক সকলের বেলায়ই কমবেশি প্রযোজ্য। গান বাঙালি জনগণের যেমন প্রার্থনার ভাষা, বিদ্রোহের অহঙ্কার, তেমনি সংগ্রামের প্রেরণা ও ভালবাসার উচ্চারণ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হাজার রকম বৈচিত্র্যের প্রকাশ এই গানের মধ্যেই ঘটেছে। মোটা দাগের শ্রেণীকরণ করে বাংলা গানের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা আমরা মনে করি সম্ভব নয়। এই অনতিবৃহৎ সংকলনটিতে নমুনাস্বরূপ প্রধান প্রধান গীতিকারদের কিছু কিছু গান স্থান পেয়েছে। লালন, হাসন রাজা, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দীন— এসকল মহাজন রচিত গান সংকলনটির মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত অনেক লোককবি, গ্রাম্য সাধক, প্রায়বিস্মৃত গীতিকার, যাঁদের নাম সচরাচর শোনা যায় না, তাঁদের রচিত গানও গ্রন্থভুক্ত করার একটা আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। কবিয়াল রমেশ শীল, মরমী সাধক জালালউদ্দীন, রাধারমণ, মনোমোহন দত্ত, বিজয় সরকার প্রমুখ গীতিকারের গানও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সঙ্গীত শুধু অতীতের ব্যাপার নয়। আমাদের সংস্কৃতিতে জীবন্ত। তার প্রমাণ প্রায় প্রতিবছরই নতুন নতুন গান লেখা হচ্ছে। সেগুলো আমাদের জনচিত্তে আসনও লাভ করছে। তাছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ঘটনার অভিঘাতে যেসব গান লেখা হয়েছে, সেগুলোও প্রাণসম্পদের বলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করবে, এরকম আশা করা অবান্তর নয়। এই ধরনের কিছু গান এ গ্রন্থে জায়গা করে নিয়েছে। লোকগীতি ও সাম্প্রতিক কিছু গান ছাড়া অন্যান্য গানগুলো নির্বাচনের বেলায়—

(ক) প্রার্থনা
(খ) প্রকৃতি
(গ) সামাজিক সম্প্রীতি
(ঘ) ঐতিহ্য বন্দনা
(ঙ) দেশাত্মবোধ

এই সকল বিষয়ে অধিক দেয়া হয়েছে। সে-কারণে আমরা বিশিষ্ট কবি ও গীতিকারদের অনেক বিখ্যাত গানও এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

যেহেতু '৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচাইতে বড় দিকনির্দেশকারী ঘটনা, সেজন্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানগুলো

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার বেলায় একটুখানি পক্ষপাত দেখানো হয়েছে এবং বোধকরি সেটা যুক্তিসঙ্গত।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গান নির্বাচনের কাজটি সারতে হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত এমন কথাও আমরা বলতে পারব না। একটা কথা অকপটে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে সকল ছাত্রছাত্রী গান গেয়ে থাকে, তাদের ঝোঁক এবং পছন্দের কথাটিও আমাদের মনে রাখতে হয়েছে। আরও একটু সময় যদি পাওয়া যেত, যদি আরও বিশারদ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেয়া সম্ভব হত, এই গীতিসংকলনটি আরও সমৃদ্ধ হতে পারত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যা হয়নি তার জন্যে আক্ষেপ করে লাভ নেই। বাংলা-জার্মান সম্প্রীতির উপদেষ্টা ফ্যাদার ক্লাউস বুয়েলের ক্রমাগত তাগাদা এবং অনুরাগের কারণেই এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারল।

দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আপেল মাহমুদ ও বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী মুক্তিযুদ্ধের গান এবং লোকগীতিশিল্পী কিরণচন্দ্র রায় লোকগীতি সংগ্রহের ব্যাপারে যে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তার জন্যে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এখানে একটি বিশেষ কথা বলতে চাই, এই সংকলনের সঙ্গীত সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিশেষত অনেক গানের রচয়িতার নাম হাজার চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম প্রকাশ করতে পারিনি। এ জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে কেউ যদি এ ব্যাপারে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন এবং বিভিন্ন গীতিকারের নাম সংগ্রহে সহযোগিতা করেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এবং অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন ও উল্লেখিত সকল রচয়িতা ও গীতিকারদের নাম লিপিবদ্ধ করব।

পরিশেষে যাদের জন্যে এই সংকলন, সেই পাঠক ও সঙ্গীতানুরাগীরা যদি এর দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।*

---

* এই লেখাটি 'সম্প্রীতি সুর' নামে একটি বইয়ের ভূমিকা আকারে লিখিত হয়েছিল। বইটি একটি গানের সংকলন। আহমদ ছফা সম্পাদনা উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি নামের একটি বেসরকারি সংস্থা বইটি প্রকাশ করেছিল। সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আহমদ ছফা।—নূ. আ.

প্রাক-কথন : আহমদ ছফার কবিতা গান ইত্যাদি

কবিতা দিয়ে আমার লেখালেখির শুরু। তবু বলব, লেখার কাজে এ পর্যন্ত যে সময় আমার গেছে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র কবিতার পেছনে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। অন্যবিধ কাজ যখন প্রত্যাখ্যান করে নিজের কাছে নিজেকে করুণার পাত্রে রূপান্তরিত করেছে, সেই সময়ে বেঁচে থাকার কিঞ্চি স্বাদ গ্রহণ করার তাগিদে আমাকে কবিতার কাছে আসতে হয়েছিল। লোকে আমাকে কবি মনে করে কিনা জানিনে, করলে ভাল, না করলেও কিছু আসে যায় আসে না। তবু আমি ঘোষণা করতে একটুও ইতস্তত বোধ করব না। কবি ও কবিতার বিষয়ে আমার নির্দিষ্ট কিছু মতামত রয়েছে। যদি আগাগোড়া নিষ্টাবান থাকতে পারতাম, হয়ত কিছুটা সিদ্ধির দাবি আমিও করতে পারতাম। অন্যবিধ কাজকর্মে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সেটি যখন ঘটেনি আফসোস করে লাভ কি! জীবনের কোনও কাজ তো একবারে তুচ্ছ নয়।

আমি পত্রপত্রিকায় খুব বেশি লেখা প্রকাশ করিনি। আমার বয়স পঞ্চাশ হতে চলেছে। এ পর্যন্ত তিনটি কবিতাগ্রন্থ একটি ছড়ার এবং একটি অনুবাদ কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি গ্যোতের 'ফাউস্টের' কথাই বলছি। কবিতার বই তিনটি উনিশ শ' পঁচাত্তর থেকে সাতাত্তুর সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি কাব্য গ্রন্থের আয়তন এত ক্ষুদ্র ছিল, তিনিটিকে একই মলাটের মধ্যে ধারণ করে প্রকাশ করলে একটুও অস্বাভাবিক দেখাত না। 'জল্লাদ সময়' উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে ৯ বাংলাবাজার, প্রকাশ ভবন থেকে বেরিয়েছিল। ঠিক তিন মাস পরে 'দুঃখের দিনের দোহা' বইটি বাংলাবাজারের বর্ণমিছিল প্রকাশন থেকে বেরিয়েছিল। তারপরে উনিশ শ' সাতাত্তুর সালে 'একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা' লেখাটি ৩৮ বাংলাবাজার বুক সোসাইটি থেকে বেরিয়েছিল। শুধুমাত্র একটি কবিতা দিয়ে একটি বই প্রকাশ করা সঙ্গত হয়েছে কিনা বলতে পারব না, তবু অপকর্মটি আমি করেছিলাম। প্রথম বইটি কবি সিকানদার আবু জাফর এবং কবি আল মাহমুদকে উৎসর্গ করেছিলাম। কবি হিসেবে আল মাহমুদ সফল এবং সার্থক। কিন্তু সেই সময়ে তিনি দরবেশ হয়ে উঠেননি, বিপ্লবী ছিলেন। দ্বিতীয় বইটি করেছিলাম— 'তোমাকে'— মানে একজন মহিলাকে। তখন যখন তাঁর নাম বলতে পারিনি। সুতরাং এখনো বলার প্রশ্ন ওঠে না। তৃতীয় বইটি আমি মিসেস হুসনে আরা হককে উৎসর্গ করেছিলাম। এই

নামগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন একারণে বোধ করছি যে, ওই লেখাগুলোর কখনো আবার দ্বিতীয় মুদ্রণ হবে, আমার তেমন মনে হয় না। যাঁদের নামে বইগুলো উৎসর্গ করেছিলাম, আমি মনে করি তার একটা প্রমাণ থাকা উচিত। তিনটি গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতায় অধিকাংশই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রচনার কালানুক্রম অনুসরণ করে বর্তমান সংকলনে কবিতাগুলো সাজানো হয়নি। যাঁরা গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছিলেন সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে 'একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা' গ্রন্থটির প্রকাশক মোস্তফা কামালও আর বেঁচে নেই।

'গো-হাকিম' গ্রন্থটিকে ছড়াকাব্য বলতে পারলে আমি খুশি হতাম। একটা ছড়া দিয়েই একটা বই করা হয়েছে। বাংলা ১৩৮৩ সালে ৩৪ বাংলাবাজার, কালিকলম প্রকাশনী থেকে এম. এ. আলিম লেখাটি ছেপেছিলেন। তিনিও আজ বেঁচে নেই। ওই বইটি যেসব বাচ্চাদের উৎসর্গ করেছিলাম, তারা আজ কেউ বাচ্চা নেই। সকলেই বড় হয়েছে। মাঝে মধ্যে দেখলে আমি চমকে যাই। বাচ্চা বয়সে যে নাম ব্যবহার করত, এখনো সে নামে ডাকলে তারা সাড়া দেবে কিনা জানিনে। অনেকের পোশাকী নামও আমার জানা নেই। ড. মুজফফর আহমদ এবং বেগম রওশন জাহানের কন্যা মুনা, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের পুত্র-কন্যা দীপু, শুচি, অধ্যাপক নরেনের কন্যা শাসা, প্রয়াত কবি হুমায়ন কবিরের পুত্র-কন্যা ভিতিয়া, সোনিয়া, ভানিয়া (এ নামগুলো আমার দেয়া, ভাল নাম জানিনে) এবং আমার বন্ধু হাবিবুল্লাহর পুত্র মিঠুর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। মিঠু নামটি মনে আসার সঙ্গে মনটা বেদনায় ভরে গেল। এই শিশুটি আমার খুব ন্যাওটা ছিল। সে সমস্ত ছড়াটা মুখস্থ বলতে পারত। এই শিশুটি বেঁচে থাকলে আজ যুবক হত। ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি আমার মনে চিরদিনের জন্য ফুটে রয়েছে।

পরিশেষে আমার গানগুলো সম্বন্ধে কিছু কথা আমি বলব। বাংলা কবিতা এবং বাংলা গানের সম্পর্ক খুব প্রাচীন। অনেক প্রধান অপ্রধান কবি কবিতার পাশাপাশি গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবিদের কেউ গান রচনা করেছেন এবং সুরের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন, এ সংবাদ আমার জানা নেই। এই মন্তব্যের জন্য কেউ যেন মনে না করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি এবং অতুল প্রসাদের নাম আমার স্মরণে নেই। বাংলা কাব্যের সঙ্গে সঙ্গীতের বিচ্ছেদ হওয়ায় আমি মনে করি বড় রকমের একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। আমার যে গানগুলো এই সংকলনে স্থান পেল, তার কোন কোনটা টেলিভিশন, বেতারে গীত হয়েছে। ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। কোন কোন পত্রিকা অনেকগুলো গান গীতি কবিতা হিসেবে ছেপেছে। গানগুলো কবিতা এবং কবিতাগুলো গীত হওয়ার যোগ্য হয়েছে কিনা বিচারের ভার আমার ওপর নয়।

এই কবিতা, গান, ছড়া, অনুবাদের সংকলনটা এইভাবে প্রকাশিত হওয়ারই কথা ছিল না। কেন যে জেমিনি প্রিন্টার্সের তরুণ বন্ধু আবুল বাশার হঠাৎ করে ব্যয়সাধ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করতে এগিয়ে এলেন, তা আমার কাছেও খানিকটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আমার ছাত্র এবং সহকর্মী মো. আবেদুর রহমান, এমদাদুল হক, সুশীল চন্দ্র সিং, হেলাল উদ্দিন, তপন আলী, এবং ইদ্রিস আলীর সহায়তা ছাড়া এ বই এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পেত না। শিল্পী অশোক কর্মকার একটি সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।*

আহমদ ছফা
১৬/এ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা-১১০০
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

* এই লেখাটি 'আহমদ ছফার গান কবিতা ইত্যাদি' বইয়ের ভূমিকা। ১৯৯৩ সালে বইটি জেমিনি প্রিন্টার্স প্রকাশ করেছিল। এই প্রকাশনায় এটাই একমাত্র বই, পরে আর কোন বই প্রকাশ করেনি।—নূ. আ.

ভূমিকা : আহমদ ছফার কবিতা

কবিতা দিয়েই আমার লেখালেখির শুরু। কিন্তু অনবচ্ছিন্নভাবে কবিতা লেখার অভ্যাসটি আমার দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কৈফিয়তস্বরূপ আমি একটা কথাই বলতে পারি, জীবনের দায় কবিতার দায়ের চাইতে অনেক বেশি নিষ্ঠুর। শুধু কবিতা নয়, যে সমস্ত রচনাকে সাহিত্য পদবাচ্য লেখা হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা সম্ভব, তার বাইরেও অনেক ধরনের লেখা আমার কলম থেকে জন্ম নিয়েছে। কখনো সামাজিক দায়িত্ববোধের তাগিদ, কখনো একটি নতুন বিষয়ের প্রতি অধিকার প্রসারিত করার প্রয়াস কিংবা কখনো ভেতরের তাপ চাপের কারণে নতুন নতুন বিষয়ের ওপর আমাকে মনোনিবেশ করতে হয়েছে।

জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমি যখন নিজেকে প্রশ্ন করি– আমি কী কবি? আমি কী উপন্যাস লেখক, প্রবন্ধকার, ছোটগল্প লেখক অথবা অনুবাদক কিংবা শিশু সাহিত্যিক? আমার পক্ষে কোন কিছুই হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। একটা গভীর অতৃপ্তিবোধ এবং দহনবেদনা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

তারপরেও আমার কবিতা সম্পর্কে কিছু কথা অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। কবিতা ভয়ঙ্কর জিনিস। প্রাণে কবিতার বীজ প্রবিষ্ট হলে অবশ্যই কবিতা লিখতে হয়। তথাপি সার্বক্ষণিকভাবে কবিতা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমার জীবনে এমন অনেক সময় এসেছে অন্যবিধ রচনার মাধ্যমে মনের তৎকালীন অনুভবটি প্রকাশ করা যখন অসম্ভব মনে হয়েছে তখনই কবিতা লিখেছি। কবি হিসেবে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার চাইতে তাৎক্ষণিক মনের ভাব লাঘব করার প্রয়োজনেই আমাকে কবিতা লিখতে হয়েছে। নানারকমে লিখিত কবিতাগুলি দিয়ে উনিশ শ' চুয়াত্তর সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমার চারটি ছিপছিপে কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও একটি ছড়ার বই বেরিয়েছিল। এই বছর আবার সেই ছড়ার বইটির নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যের সবগুলো মাধ্যমের মধ্যে একমাত্র কবিতাই হল সবচাইতে স্পর্শকাতর। কে প্রকৃত কবি, কে কবি নয়, কার কবিতা যথার্থ অর্থে কবিতা, কে ভনিতা লিখেই জীবন অপচয় করে, এ নিয়ে কবিদের মধ্যেই বিতর্কের অন্ত নেই। যেহেতু আমার আত্মপ্রকাশের অন্যবিধ মাধ্যম ছিল তাই বুক ঠুকে নিজেকে কবি হিসেবে জাহির করার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার হয়নি। তবু কোন ব্যক্তি যখন আমাকে কবি শনাক্ত করতে চেষ্টা করেছেন, সেটাকে আমি নেহায়েত সৌজন্যের প্রকাশ বলে ধরে নিয়েছি। কবি

হিসেবে পরিচয় অপরিচয়ের ব্যাপারটি কখনো আমার চিত্তদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। বরঞ্চ উল্টো আমি মনকে ওই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি, তোমাকে সবকিছু হয়ে উঠতে হবে কেন?

গত বছর, মানে— উনিশ শ' নিরানব্বই সালটি ছিল আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই সালটিতে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগের আয়োজন চলছিল। এই বছরের মাঝামাঝি সালটি ছিল আমার জন্য নতুনভাবে জেগে ওঠার, কবি হিসেবে নতুনভাবে জেগে ওঠার সময়। আমি অনুভব করেছিলাম আমাদের দেশের কবিদের কাব্যচর্চার মধ্যে ভাবের ঘরে চুরির ব্যাপারটি অহরহ ঘটে চলছে। আমার বিশ্বাস শুক্রহীনতার মর্মান্তিক ঘটনার মত কবিরাও এই বিষয়টি বিশদভাবে অবগত আছেন। নেহায়েত সামাজিক সম্মানহানির ভয়ে কেউ কারো থলের বিড়াল বের করে দেখাতে সাহসী হতে পারেন না। আমার আরো মনে হয়েছিল— নানা দলের নানা মতের কবিরা আপোষে একটা সৃষ্টিনাশা পথ অনুসরণ করে সৃজনশীলতা হননের প্রতিযোগিতায় রত আছেন। আমি চোখ কান মেলে যেদিকেই তাকিয়েছি, মনে হয়েছিল সুদূর আফ্রিকা থেকে সাহারা মরুভূমির একটা অংশ আমাদের চিন্তা-কল্পনা গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে এবং আমি হু হু করা একটা শূন্যতার মধ্যে বসবাস করছি। এই ধরনের একটা অসহনীয় পরিস্থিতির তাপ এবং চাপ আমাকে 'লেনিন ঘুমোবে এবার' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লিখতে বাধ্য করেছে। আমার এ যাবতকালের লেখা কবিতার সঙ্গে 'লেনিন ঘুমোবে এবার' কাব্যগ্রন্থটিও চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আরো একটি সংবাদ সকলের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করছি। 'লেনিন ঘুমোবে এবার' এবং 'আহমদ ছফার কবিতা' এই দুটি গ্রন্থ যে দু'জন ভদ্রলোক প্রকাশ করেছেন, তাঁদের কেউ পেশাদার প্রকাশক নন। তাঁরা যদি ভবিষ্যতে প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, আমার পক্ষে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার একটিই কারণ থাকে, তাঁরা আমার লেখাকে ভালবেসে প্রকাশক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। যে প্রকাশনার নাম এখনো স্বপ্নলোকে হামাগুড়ি দিচ্ছে, সেই শ্রীপ্রকাশের হবু স্বত্বাধিকারী আমার বন্ধু শিবনারায়ণ দাশের অনেক টাকা এই গ্রন্থ ছাপতে বেরিয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটা বন্ধুকৃত্য বলে মনে করতে পারলে আমি ভীষণ খুশি হব।*

আহমদ ছফা

১২/১, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা-১০০০

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ সাল

---

* আহমদ ছফার মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর কবিতার সংকলন 'আহমদ ছফার কবিতা' প্রকাশ পেয়েছিল, এ লেখাটি তারই ভূমিকা। শ্রী শিবনারায়ণ দাশ বইটি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশনার নাম ছিল শ্রী প্রকাশ।—নূ. আ.

Islam in Bangladesh

The expansion of Islam has a very close relation with city. The prophet of Islam started his mission of preaching his faith from Medina. Medina is an Arabic word, which means city. The word Tamaddun is derived from Medina and the meaning is culture. The city and the Islamic culture in the formative stage of Islam became almost identical.

But in case of Bangladesh, city played little role in the expansion of Islam. Since its very inception, rural areas of Bangladesh became the object of attention. As a result bulk of the people who got converted into this new faith, were rural folk eighter peasants or artisans, Birth process of Islam in Bangladesh is not similar to those of other countries. In a new surrounding, Islam, when started flowering in its perception and expression attained a few striking characteristics. Rather it came through practice, not as dogma. In the rural background, there was a new synthesis between the religious principle and the indigenous culture.

The most of often quoted phrase, that Islam was preached through sword was not true, at least in the case of Bangladesh. Of course, royal patronisation was there, the lure of promotion and mild compulsion, these factors contributed to a great extent in advancing the cause of Islam. But this is one part of the truth, not the whole truth, Muslim rule continued for eight hundred years in and around the areas of Delhi. But the Muslim population of that great city, even during the reign of most fanatic last great Mughal Aurangjeb hardly exceeded 15% of the total population. Compared to Delhi, Muslim rule in Bengal lasted not more than five hundred years. But the size of the Muslim population become fifty percent within three centuries.

There had been a host of reasons, behind this dramatic rise of the Muslim population in Bengal. Aryans conquered Bengal after consolidating their position in rest of India. Aryan influence did not go much deep in the society of Bengal. When Lord Buddha first revolted against the Brahmanical order of society, the people of Bengal accepted the message of Buddha at the first chance. Overnight Buddhism became the religion of the land. The Pala Kings who ruled Bengal for more than four hundred years, all of them were devorted Buddhists.

The time when the Palas ruled Bengal is the most glorious period in the history of Bengal. However the Palas could not continue with their kindom for long. Again there was a resurgence of Hinduism. Buddhism had to face serious threat and it was defeated by Hinduism. As a result Buddhism had to leave the land of its birth forever. In this phase of the history of Bengal, a Brahmin dynasty was installed and Brahmanical order was reimposed. Thousands of Buddhists were slaughtered and religious torture threw the people into precarious situations. Naturally they were looking for a way out. At this juncture of history Muslim Conquerors captured the state power. With the Muslim Conquest there started a periad of serious social turmoil. Thousands of Buddhists who were groaning under the harsh subjugation of the caste order, overnight embraced the faith of Islam. This is one reason, why Bengal becames a Muslim majority area, within a couple of centuries.

The other important reason for large scale mass conversion is the silent peaceful preaching of the Muslim saints and Sufis. The call for an egalitarian society instead of caste ridden one, createc' deep impression in the mind of the downtrodden people. It is from the saints and Sufis, most rural people got their faith. and who mostly of them preached Islam in a nonviolent way.

Even today there is a streak of nonviolence visible in the parctice paretise of Bangladeshi Islam. Bangladeshi Muslim inherited this trait from their ancestors partly and partly from the teachings of the Sufis. Also it should be mentioned here Sufism was first developed in Khorarsan. And Khorarsan was a Buddhist centre.

From the very beginning the Muslims of Bengal were an exploited class. They first embraced Buddhism in order to secure

their social emancipation. After a couple of centuries the same oppressed and tortured Buddhists took shelter under the banner of Islam. It is true that Islam offered them a sense of social prestige. But their material condition remained unchanged. Even during the Muslim rule, most of those who collaborated with the outside Muslim ruling elite would come from the higher strata of Hindu society. The Islam of the elite and the Islam of the mass is not the same Islam. The elite Muslims didn't speak the language of the masses. There was always a demarcation line. Apart from religion, they hardly shared any other experiences.

The British took the power of Bengal from the Muslim Nawab. Their defeat inflicted a crushing blow to the Muslim aristocracy. They lost power prestige and influence. Gradually a Hindu middle class emerged and filled the gap. The Hindu middle class and Muslim middle class could not unite themselves towards a single platform against British imperialism. Later there were two states India and Pakistan. Muslim League pioneered the cause of Pakistan. This organisation was formed in Dhaka in 1905. On the eve of the partition of India, the Bengal leadership of Muslim League proposed a united Bengal. Some influential leaders of Bengal Congress also agreed to it. But tooth and nail opposition of the congress leadership foiled the cause. India was divided. Pakistan was created on the basis of two-nation-theory. It was assumed that the Muslim population of India constitute a nation. Between the two wings of Pakistan however there was nothing common, except religion. Within a quarter of a century the theocratic state Pakistan proved inpractile. The new linguistic state of Bangladesh emerged after the liberation struggle of Bengali people in 1971.

Practically speaking, Bangladesh is a linguistic national state. Only a marginal group of people speak their own language and try to adhere to their own culture, Eighty five percent of the population are Muslim, thirteen percent are Hindus, Buddhists and Christins. A small number among them adherents of a religion of nature.

As Bangladesh is a Muslim dominated country, Islam is at times a potential factor, which can become aggressive to the extent

that is curbs the secular character of the state draft. The militant and aggressive Islam is practiced by only a group of people, who have some ulterior political motives. In the main political stream of the country their presence is insignificant. But recently, due to the foolishness of the main political parties and their insatiable hunger for power, the die hard fanatics were brought into lime-light. But this is transitory business.

In Bangladesh, people in general are tolerant and peace loving. Average Muslims dislike those who disturb communal harmony and create religious frenzy among the masses. But those forces who create social discoruption, although their number is few and far between, at times can create social havoc. This happens, because people are submerged in abject poverty. Most of those who control the destiny of these one hundred twenty million people often lack foresight, leadership capacity and meaningful development strategy. In a different situation with honest and effective leadership, miracle could be performed with this people. Although in the name of Islam sometimes fanatics try to frustrate development activities. But theirsway is not extended more than a few pockets. Muslims on the whole are open, tolerant and want to change their fate by honest labour. They feel equal concern for the non-Muslims, as people of their own community.

Sometimes people from interested quarters try to present the Bangladeshi Muslim society as a puritan and fundamentalist one. There in not a shred of truth in it. Bangladesh Muslim society like any other human society of the world has its positive and negative aspects. The most positive aspect of the Bangladeshi Muslims, as to my own estimation, is unlike many other Muslim societies, that they are open and even its women are fast changing their position. They have the potentiality to receive new ideas. They do not feel isolated from the world, nor do they try to keep themselves in isolation.

What I consider the most negative aspect of the Bangladesh. Muslim society : it is still groping in a feudal medieval atmosphere mixed with colonial behaviors. The medieval spirit is controlling its outlook. Absence of proper enlightenment threw the society in a stage, which crippled her to a great extent to play its role in modern history.

সাক্ষাৎকার

ভোটের সময় এলে শহরবাসীর কৃষকের কথা মনে পড়ে

আলতাফ : সাহিত্যের পাশাপাশি ভূমি ও কৃষি প্রশ্নেও একসময় আপনার উৎসাহ ছিল। ভূমি ও কৃষি সংস্কার বিষয়ে আপনার এখনকার ভাবনা সম্পর্কে বলুন।

আহমদ ছফা : সংস্কার শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। সংস্কার হল ময়লার ওপর একটুখানি হোয়াইট ওয়াশ করা। আমি চাই পুনর্গঠন। গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন। আমূল পরিবর্তন এবং বিশেষত টাউন প্ল্যানিংয়ের। ইংল্যান্ডে শিল্প অগ্রগতির মূলে ছিল গ্রাম ও কৃষির পুনর্গঠন। অনেকগুলো জমিকে একত্রিত করে একসঙ্গে চাষাবাদের প্রচলন করে ওরাই। এর ফলে ওদের যে বাড়তি আয় হয়েছিল সেটাই তারা বিনিয়োগ করেছিল শিল্পপ্রযুক্তির বিকাশে, রাজত্ব বিস্তারে। আমরা সেই গোড়ার কাজটি না করেই শিল্প বিকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি তো গড়তে পারছি না। লগ্নি পুঁজি বণিকতন্ত্রের প্রসার ঘটাচ্ছি মাত্র।

আলতাফ : এটাকে কি আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি ত্রুটির দিক বলা যায়?

ছফা : দেখুন, বাংলাদেশে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন পুঁজির বিকাশ ঘটছে না। তার অবস্থা অনেকটা খাটে শুয়ে থাকা লাশের মত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেই বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল নিয়ে চিন্তা করতে পছন্দ করি আমি। সুতরাং আমার বক্তব্যও সেভাবে বিবেচ্য। কমিউনিজমের পরাজয়ের পর পৃথিবী আজ যে নতুন কক্ষপথে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আমি ওই প্যারাডাইমের মধ্যেই নিজের ভবিষ্যত খুঁজতে চাই।

বাংলাদেশের আজ বিস্তর বিদেশি পুঁজি আসছে। বস্তুত এই পুঁজির বিকাশের পথ করে দেয়াটাই এখন জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণও থাকা দরকার। যাতে এ পুঁজি শেকড় গেড়ে বটগাছে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশি পণ্যের আগ্রাসন। প্রতিবেশী ভারত আজ পৃথিবীর নবম শিল্পোন্নত দেশ। আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে চাইছে সে। একই সঙ্গে আবার ভারতে দারিদ্র্যও চরম। পুঁজিবাদের ক্ল্যাসিকাল বিকাশ সেখানে

ঘটেনি, ঘটতে পারছে না। এই বিকলাঙ্গ ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র তার সমাজ ও রাজনীতিকে জাত-পাত ও ভাষার সঙ্কট থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। ফলে সোভিয়েত-বিপর্যয়ের পরই সে আত্মসমর্পণ করেছে পশ্চিমা পুঁজির কাছে। এই প্রেক্ষাপটটি মনে রেখে এবার আসুন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে। ভারত চাইছে বাংলাদেশকে ভৌগোলিকভাবে দখল না করেও তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের একটা পশ্চাৎভূমি হিসেবে একে ব্যবহার করতে। বিশেষত কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিপণনের জন্যে। এর ফলে বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে সুবিধা হয় তার। ভারতীয় ডিজাইন হল এখানে পুঁজির ও শিল্পের বিকাশ ঘটার সুযোগ বন্ধ করে একে একটা বাজার হিসেবে রাখা। এখন প্রশ্ন হল এ অবস্থায় আমাদের দেশকে এগিয়ে নেয়া যায় কিভাবে? আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে যে, কিভাবে চিন্তাচেতনায় আমরা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারি। আর এজন্য শুরুতেই আমাদের একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটাতে হবে।

আলতাফ : এ বিষয়ে আপনার কোন সুনির্দিষ্ট মতামত আছে কি?

ছফা : আমাদের রাজনীতির প্রধান সমস্যা হল তাতে কৃষকদের অনুপস্থিতি। দেশের জনসংখ্যার ৮৫ ভাগ কৃষক। অথচ রাজনীতিতে কোন অবস্থান নেই তাদের। এটা একটা অবাস্তব রাজনীতি। ভারতে দেখুন, কৃষকদের নেতা চরণসিং সেখানে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন। কংগ্রেস সেখানকার কৃষক বুর্জোয়ারই প্রতিষ্ঠান। কৃষকদের চাওয়া-পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সেখানে। অন্যদিকে আমাদের রাজনীতিতে কৃষকদের কথা বলার সুযোগ নেই। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কখনোই তাদের প্রাণবান মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। সমাজে কোন ভূমিকা নেই কৃষকের। তার হাতে নেই কোন উদ্বৃত্তও। অথচ তাদের দেখিয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কর্জ আনি আমরা। আর সেই কর্জের টাকা লুটেপুটে খায় শহরবাসী। আর ভোটের সময় শুধু শহরবাসীর মনে পড়ে কৃষকের কথা।

আলতাফ : এ থেকে উত্তরণের পথ কি?

ছফা : বামপন্থীরা চেষ্টা করছে। ভূমি সংস্কারের দাবিও এনেছিল তারাই। কিন্তু এসব বিষয়ে আমার কিছু ভিন্নমত আছে। যেমন ধরা যাক ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামাঞ্চলে জমির সিলিং বেঁধে দেয়া হয়েছে। অথচ শহরে কোন ধরনের সিলিং নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কয়েক বিঘার ওপর ৪/৫ জন মানুষ থাকার জন্যে গুলশান-বারিধারায় বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এরকম একটি বাড়ি বিক্রি করেই কয়েকটি গ্রাম কিংবা ইউনিয়ন কিনে নেয়া যায়।

এই বিলাসী নতুন ঢাকার বিস্তার ঘটেছে এবং ঘটছে মূলত অসংখ্য কৃষকের জমি দখল করে, তাদের উদ্বাস্তু করে দিয়ে। সাধারণভাবে অন্যান্য দেশে শিল্প সভ্যতার বিকাশের ফলে আক্রান্ত হয় গ্রাম। কিন্তু আমাদের এখানে তা হয়নি। আমরা কৃষকদের উচ্ছেদ করে সেখানে প্রাসাদ গড়ার জন্য কিছু লোককে জমি দিয়েছি। এই কিছু লোক কারা? এরা মূলত লুটেরা রাজনীতিরই উপজাত।

অথচ ২২৫ বর্গকিলোমিটার ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকাতে ১৫ লাখ মানুষ রাস্তায় থাকে। ২০ লাখ মানুষ থাকে বস্তিতে। ৩৮ লাখ কোন রকমের মাথা গোঁজে। ৫৭ শতাংশ ঢাকাবাসীর কোন জমি নেই। যে শহরে এরকম অবস্থা সেখানে এক একরের ওপর ধানমন্ডি, গুলশান, বারিধারায় ৪/৫ জন লোকের থাকার জন্যে বাড়ি তৈরি করা মানে জমি খুন করা। পৃথিবীর কোন আধুনিক শহরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নামে এরকম স্বেচ্ছাচারিতা বরদাশত করা হয় না। ঢাকায় এমনও অনেক দেখেছি বিশাল জায়গায় ছোট এক বাড়ি। বাপ-বেটা তিনজন থাকে। অথচ ওই জায়গাতেই ফ্ল্যাট গড়া হলে ২ হাজার লোকের আবাসন সমস্যা মিটত। পৃথিবীর কোন আধুনিক শহরেই কেউ এভাবে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে পারে না। বামপন্থীদের সমস্যা হল তারা এসব নিয়ে চিন্তা করে না। বাঁধা বুলির মত শুধু গ্রামের ভূমি সংস্কারের কথা বলে। আর শহরে আন্দোলন করে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। বস্তির মানুষদের ঘর দেবার স্বপ্ন দেখায় না তারা। ঢাকার রাস্তায় ঘুমানো ২০ লাখ মানুষকে যদি ছাদের স্বপ্ন দেখানো যেত, সংগঠিত করা যেত তাহলে আমাদের রাজনীতির চেহারাই পাল্টে যেত। সুতরাং পরবর্তীতে আমাদের যে কোন গণআন্দোলনেই শ্লোগান হতে হবে শহরের ভূমি সম্পদের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস। এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই মতিঝিলের কবল থেকে মুক্তি পাবে দেশের রাজনীতি। পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে সে। এখন তো রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে মাথার ওপর। ডাল-ভাতের প্রোগ্রাম দিয়ে ফজলুল হক ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ছাদহীন মানুষদের বাড়ির স্বপ্ন দেখিয়ে নতুন রাজনীতি কয়েক যুগ দেশ শাসন করতে পারে। তাকিয়ে দেখুন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর দিকে। মনে রাখা দরকার যে, আমরা একটা বুর্জোয়া অর্থনীতিতে বাস করছি। যেখানে ঢাকাসহ কয়েকটি শহরের জমির দাম সারাদেশের জমির দামের চেয়ে বেশি হবে। এখানে জমি মানে টাকা, টাকা মানে জমি। এটাই মুখ্য ক্যাপিটাল। এ ক্যাপিটালকে ভাঙচুর না করে গোটা দেশে কিছু করা যাবে না। শহরের গরিবদের নিয়ে শহরের ধনীদের গ্রেফতার করানো না গেলে গ্রামের গরিবেরা দাঁড়াতে পারবে না।

শহরের পুঁজিই এখন দেশের নিয়ামক শক্তি। এ পুঁজি শহরে ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত। এরা দেশের বামপন্থীদের পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। ওকে আঘাত করা দরকার।

আলতাফ : গ্রামীণ ভূমি কাঠামো কিংবা সেখানকার মালিকানার ধরনের পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন না?

ছফা : বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত কম যে, এখানে কার জমি কাকে দেবেন। জোতদারদের সর্বশ্রান্ত করেও পাঁচ লাখ মানুষের ভূমিহীনতা ঘোচানো যাবে না।

মালিকানার এদিক-সেদিক করে খুব বেশি লাভ নেই। গ্রামীণ সমাজের সংস্কার করতে হবে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে। অবকাঠামো তৈরি করে গ্রামে প্রধানত যেটা দরকার, তা হল কর্মসংস্থান। একমাত্র ওভাবেই শহরে গ্রামের মানুষের অত্যধিক আগমনকে নিরুৎসাহিত করা যাবে। এছাড়া একটা ব্যবস্থাও দরকার, যাতে করে জাতীয় কর্মকাণ্ডে সকলে অংশ নিতে পারে। গ্রামেও জমি খুন হচ্ছে। তাবৎ উন্নয়ন কার্যক্রম কমিউনিটিভিত্তিক করা গেলে সেখানেও অনেক জমি পাওয়া যেত। এর জন্যে হয়ত জমির মালিকানার ধরনে পরিবর্তন আনতে হতে পারে।

তবে চূড়ান্তভাবে আমি জোর দেব গ্রামীণ শিল্পকে। বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার দুধ আনে বাংলাদেশ। অথচ মাইলের পর মাইল ডেইরি গড়ে ঠিক উল্টো ঘটানো সম্ভব। কুটির শিল্প এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নযজ্ঞে গ্রামে বিস্তর কর্মসংস্থান ও জীবিকার উৎস তৈরি হতে পারে। সামগ্রিক এসব বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্যে আসুন না মওলানা ভাসানীর সন্তোষে সবাই মিলে একটা কর্মশিবির করি।

আলতাফ : গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবার মত প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন হল পুঁজিবাদের সমর্থক হয়েও আপনি গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র জিইয়ে রাখতেই আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।

ছফা : আমাদের গ্রামে সামন্ততন্ত্র নয়, পুঁজিবাদই চলছে, জমি সেখানে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এটা জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদ। আবদুল হকরা এ গ্রামকে আধা-সামন্ততন্ত্র, আধা-পুঁজিতন্ত্র বলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষতি করে গেছেন। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, পুঁজির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু সেটা সামগ্রিক অচলাবস্থারই অংশ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যেই জাতীয় অগ্রগতির চিন্তা করি। আমাদের এখানে আগামী বিপ্লব হল বুর্জোয়া বিপ্লব। আপাতত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই।

আলতাফ : কিছুক্ষণ আপনি পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর সাফল্যের কথা বলছিলেন—

ছফা : হ্যাঁ বলেছি। নিম্নবিত্ত কৃষকদের সিপিএম উচ্চবিত্ত কৃষকদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। সেখানে এই কৃষেকরাই রাজনীতিতে, ভোটে ফ্যাক্টর। আমাদের এখানে তো তা নয়। এখানে সরকারের পতন ঘটে ছাত্রদের মিছিলে এবং সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক না থাকায় পতন ঘটার পরও সরকারগুলো মরে না। যেমন এরশাদ সদম্ভে বেঁচে আছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি এতটা জনবিচ্ছিন্ন নয়। তবে সিপিএম-এর সামনে বিপদ আছে। শিল্প পুঁজির বিকাশ ঘটাতে পারেনি তারা। শহরের ধনীদের ওপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়েনি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আলতাফ পারভেজ

বাংলাবাজার পত্রিকা
২২ মে, ১৯৯৬

একদিন আহমদ ছফার বাসায় আমরা

[১৯৯৬ সালে এক রাতে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। তখন লেখক আহমদ ছফার বাংলামোটরের চারতলার ভাড়া বাসাটি ছিল তরুণ-প্রবীণ লেখকদের আড্ডাস্থল। ঢাকার শাহবাগের আজিজ মার্কেটের দোতলায় আড্ডা দেওয়ার জন্য ছফা একটি দোকানও ভাড়া করেছিলেন। এর নাম ছিল 'উত্থানপর্ব'। পাশেই তিনি গরিব বাচ্চাদের একটি স্কুলও খুলেছিলেন। বিকেলে ছফা শাহবাগে বসতেন। বিবিধ বন্ধু এবং চাকুরিহীন ও চাকুরি আছে এমন তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা তখন তাঁর কাছে আসতেন। শাহবাগের আড্ডা শেষে প্রায়ই সে আড্ডার কেউ কেউ ছফার সঙ্গে বাসা পর্যন্ত হেঁটে এগিয়ে দিতেন তাঁকে। কোনোদিন তাঁর বাসায়ই আড্ডা বসত। র চা ও পনির দিয়ে আপ্যায়ন করতেন ছফা। আমরা যারা তাঁর একটু ঘনিষ্ঠজন ছিলাম তাদেরকে তিনি কখনো-সখনো তাঁর জার্মান বান্ধবীর কল্যাণে প্রাপ্ত নেপোলিয়ন ব্যবহার করতে দিতেন। র চায়ে দুচামচ ব্র্যান্ডি আর পিরিচে কাটা পনির এটি ছিল সে সময়ের ডেলিক্যাসি। প্রায় সব বিষয়ে ছফা মত দিতেন। সবার সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক বজায় ছিল তাঁর। শোনা যায়, গোপনে কাউকে কাউকে অর্থ সাহায্য করতেন। সাক্ষাৎকারটি শুরু হয় নাট্যকার ও অভিনেতা আশীষ খন্দকারের একটি প্রশ্ন দিয়ে। ক্যাসেটে সে প্রশ্ন ধারণ করা যায় নাই এবং অনেক পরে রেকর্ডার থেকে শুনে শুনে সাক্ষাৎকারটি লেখা হয়েছে বিধায় ছফার কথা দিয়েই সাক্ষাৎকারটি শুরু করা হলো—ব্রাত্য রাইসু, ২/৭/২০০৪]

ছফা : আরে না, আমি মন্ত্রী হয়ে গেছি তো। আমি মন্ত্রী তো, উল্টাপাল্ট প্রশ্নের জবাব দ্যাব না।

আশীষ : ছফা ভাইয়ের ওপর একটা ডকুমেন্টারি করে রাখতে চাই, ফিল্ম ডকুমেন্টারি।

ছফা : কর্নেল ফরহাদের (ফরহাদ মজহার) একটা ডকুমেন্টারি ইউনিট আছে। ফরহাদকে বললে যে কোনদিন... প্রতিদিনই রিকোয়েস্ট করছে আমাকে, ওদের একটা ভিডিও ক্যামেরা আছে, ইত্যাদি আছে... কিন্তু এগুলোর করার একটা বিপদ আছে কী জান, খুব তাড়াতাড়ি বোধহয় মরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আশীষ : এটা করতে গেলে খুব শিল্পসম্মত ডকুমেন্টারি করতে হবে। তথাকথিত যেসব বায়োগ্রাফির ওপর ডকুমেন্টারি হয়, সে ধরনের কাজ না।

ছফা : আমি একটা জিনিস ভয় পাই। ভয় পাই কী জানেন, অর্থাৎ ডকুমেন্টারি করা যায় কেমনে, একজন লেখক কিংবা ক্রিয়েটিভ লেখক আনকনশাসলি করলে ভাল। কিন্তু আমি তো এখন জানতে পারছি সব।

রাসেল : এমনি নরমানি করলে অসুবিধা কী?

ছফা : আমি জানতে পারতেছি তো আমার পাবলিসিটি হচ্ছে! তখন তো এতে কোন মজা নেই আর।

রাইসু : মজা কীসে ছফা ভাই?

ছফা : একটা জিনিস মজা আছে না? এই যে ধর ওই যে ছবিটা, দশ বিশ বছর অজ্ঞাতবাস ছিল...

রাইসু : পাখিঅলা ছবিটা?

ছফা : হ্যাঁ, দু হাজার টাকা দিয়া আদায় করছি। একটা মজা আছে। যেমন ধর কালকে বিটিভি থেকে টেলিফোন, একটা সিরিজ করার প্রস্তাব দিয়েছে, তার একটা মজা আছে না? আমি যে সমস্ত লোক চিনি, তারা ম্যানেজারি করে কাজ করার মধ্যে। একটা ঘৃণা আছে না। এই যে লিখে দেয়া আর কি না, 'আমি অমুক, আমি তমুক, আমি অমুক'—তাহলে লোকে বলবে, হ্যাঁ, লোকটা বেশ কাজের! একজন লেখককে ভালবাসার জন্য একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সেটা আমি নষ্ট করতে চাই না। আমার আবার অটোবায়োগ্রাফি—আবার বায়োগ্রাফি—হুস্স্স্!

রাইসু : শিস দিলেন নিকি ছফা ভাই।

ছফা : এগুলোর কোন দাম নেই। কারণ আমি দেখছি, সবচেয়ে খারাপ লোকেরা সবচেয়ে ভাল বায়োগ্রাফি তৈরি করে।

রাইসু : ইয়াং ছেলেদের ওপর আপনার সাক্ষাৎকারটা আজকে নিতে চাই ছফা ভাই। ইয়াং ছেলেদের আপনারা বেশি পছন্দ করেন।

ছফা : হ্যাঁ, এটার একটা মজা আছে। ও আল্লা, আমি যদি হোমোসেক্সুয়াল হতে পারতাম, আমার অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যেত।

রাইসু : কী কী প্রবলেম সলভ হত ছফা ছাই?

ছফা : মহিলারা এত কষ্ট দিতে পারত না আমারে।

রাইসু : তাহলে আপনে বাই সেক্সুয়াল, মানে দুইটাই।

ছফা : না তা না। আমি হোমোসেক্সুয়াল হতে পারলে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যেত। কিন্তু সেটা সলভ হয়নি। হোমোসেক্সুয়াল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমার নেই। আমার অন্য জায়গায় একটা নালিশ আছে। আল্লাহতালা তো সব জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং এইটা একটা প্রাকৃতির নিয়ম লংঘন করা। আমি মনে করি আমি একটা ধর্মজীবন যাপন করি। যে-কোন খানকি যে-কোন বদমাশ আমার কাছে আসলে তাকে আমি গুড ছেলে কিংবা গুড মহিলায় পরিণত করতে পারি।

রাইসু : আচ্ছা ছফা ভাই, আপনি কি কখনো বেশ্যাগমন করছেন?

ছফা : না আমি যাই নাই, এটা হয় নাই। আমি একবার, ক্লাশ নাইনের যখন ছাত্র, তখন আমার বন্ধুরা বলল, রিয়াজউদ্দিন বাজারে গেলে পরে

মহিলারা নূরজাহানের মত গান করে। দশ টাকা নিয়া তোমাকে স্বর্গে পৌছে দেবে। আমি দশ টাকা নিয়ে, বাড়ি থেকে চুরি করে, বাসে করে রিয়াজউদ্দিন বাজারে আসছি। প্রথম যে অভিজ্ঞতাটা হল : মাগুর মাছেরে ছাই মাখালে যে রকম হয়, কতগুলো মহিলা সারা শরীরে পাউডার মেখে দেখি যে গুয়ের গন্ধ, মুতের গন্ধ, চিকন গলি... আমি দৌড়ে ওইপারে যখন গেছি— দেখি যে আমার পুরুষাঙ্গটা নাই! ভয়ে! দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স ইন ব্রথেল। সেক্স কিনে-বেচে এমন কোন মহিলার সঙ্গে আমার সর্ম্পক হয়নি। আমার এইটা কনসেপ্টে আসে না। কালকে আমি পিকনিকে গেছি আমার বান্ধবীরে অনার করার জন্য। আমার বৌদ্ধমূর্তিটা নিয়ে গেছি তারে দেওয়ার জন্য। কিন্তু লোকজনের সামনে দেওয়া গেল না। আজকে সকালবেলা তার মাকে এই কথাটা বললাম। অর্থাৎ আমার জীবনের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা আছে। এগুলোর কোন স্কোপ নেই।

রাইসু : সেক্সের?

ছফা : সেক্স থাকবে না কেন?

রাইসু : আপনে তো একটু প্লেটোনিক ছফা ভাই।

ছফা : কেন প্লেটোনিক হবে। বাঘ যখন বাঘিনীর সঙ্গে মিশে প্লেটোর চেয়ে বেশি ওরা। ইটস এ পার্ট অফ ইউর এক্সিসটেন্স। এই যে লিঙ্গপূজা করত হিন্দুরা এটার অর্থ আছে। আমি মনে করি আমার জীবনে এই পর্যন্ত যে উপলব্ধিতে এসে পৌছেছি, পুরো সমাজকে আমার দেওয়ার মত কিছু আছে।

রাইসু : আপনি প্রেমট্রেম করছেন কখনো ছফা ভাই?

ছফা : লোকে বলে। আমি তো বুঝতে পারি না।

রাইসু : আপনার প্রথম প্রেম কি অসামাজিক কিছু ছিল?

ছফা : মানুষের ছোটবেলা যেইটা, একটা পশুর ছোটবেলার মত। আমি সেইটা বলার মত মানসিক শক্তি অর্জন করি নাই। ট্রুথ উচ্চারণ করার মত যে শক্তি তা এই মুহূর্তে আমার নেই। মানুষ অটোবায়োগ্রাফি যেগুলো দেয়, এগুলো হচ্ছে হতে-পারত-অটোবায়োগ্রাফি, অর্থাৎ যে মানুষ অনেক কথা অকপটে বলে সে অনেক কথা অকপটে লুকিয়েও রাখে। সুতরাং এই যে লোকে ফ্রাঙ্কনেসের ভান করে... ব্রিডিং সেন্টারে ষাঁড়কে যে কাজে ব্যবহার করা হয়, একজন সফিস্টিকেটেড লোকও নিজের কোয়ালিটি থেকে একটা বৃহত্তর ষাঁড় হওয়ার জন্য তা করে। আমার মনে হয় মানুষ বোধ হয় অন্য কিছু। মানুষ অন্য কিছু। আমার অভিজ্ঞতা যেটা, সেক্স ইজ নট এভরিথিং অফ লাইফ।

রাইসু : যেসব ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করছেন, করছেন তো অবশ্যই...?

ছফা : হ্যাঁ।

রাইসু : আমার মনে হয় এক ধরনের ভক্তিমূলক সম্পর্কের থেকে আপনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়। তাই নয় কি?

ছফা : হ্যাঁ।

রাইসু : ওইখান থিকা, মানে ভক্তি থিকা আপনি যৌন সম্পর্কে কীভাবে যান?

ছফা : ইট ইজ পার্ট অফ দি হোল, এগুলিকে মামুলি সেক্স হিসেবে দেখা ঠিক না। আমি অনেক সময় গ্যেটের জীবনী পড়ে ভাবতাম যে লোকটা আর কোন কাজই করে না, যৌনসঙ্গমই করে। এত যৌনসঙ্গম করে, লোকটা বাঁচে কীভাবে? মামুলি লোক মনে করবে যে, সতীচ্ছেদ করা একটা মস্ত বড় জিনিস। প্রায় কবিদের মধ্যেও আমি এটা দেখেছি। অর্থাৎ কোন মহিলা দেখলেই মরদ আমি... অর্থাৎ ব্রিডিং সেন্টারে ষাঁড় যে পারপাসে ব্যবহার করে, একটা সফিস্টিকেটেড লোকও নিজের কোয়ালিটি দেখায় একটা বৃহত্তর ষাঁড় হওয়ার জন্য। আমার মনে হয় মানুষ বোধহয় অন্য কিছু। আমার অভিজ্ঞতা এইটা, সেক্স ইজ নট এভরিথিং অফ লাইফ। সেক্স হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন, দেয়ার আর মেনি আদার এক্সপ্রেশনস। ইয়ুং-এর অটোবায়োগ্রাফি পড়বে যারা তারা বুঝবে। ফ্রয়েড যেইটা দেখেছে যে মানুষের সব কিছুই যৌন কার্য্যাবলী। যৌন এনটিটির বাইরেও তো মানুষের আর একটা এনটিটি আছে। আমরা যদি পশুজগতে যাই, গাছের জগতে যাই, কিছু গাছ আছে তার অঙ্গ দিয়ে তৈরি করে, কিছু গাছ আছে বীজ থেকে তৈরি করে, কিছু প্রাণী আছে তার সেল থেকে বংশবৃদ্ধি করে। এবং মানুষ তার বংশবৃদ্ধি করে যেটা সেটা হচ্ছে ম্যামাল, স্তন্যপায়ী। আমরা যদি অন্য প্রাণী হতাম, আমরা আমাদের অনুভূতি কীভাবে মূল্যায়ন করতাম...?

রাইসু : কীভাবে করতেন ছফা ভাই?

ছফা : আমি জানি না, অন্যভাবে যদি আবার প্রাণী হিসেবে আমি জন্মাই... আমার একবার টিবি হয়েছিল, আমাকে সেকলুশন করে রাখছিল। একটা বিড়াল ছিল আমার সঙ্গে। এটা ছিল হুলো। দাউ ইট কেম উইথ হিজ গার্ল ফ্রেন্ড। এবং বিড়ালের যে করে বাচ্চা হয়, এবং বাচ্চার প্রতি যে অপত্য স্নেহ—মানুষকে আমার মনে হয়েছে অনেক স্টেজে পশুদের নকল করতে হয়েছে। মানুষের মধ্যে সামথিং এই যে 'গডলি' যেটা কল্পনা করা হয়, মানুষের এই যে সমস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া যাওয়ার ক্ষমতা আছে এইটাই হচ্ছে ঈশ্বরত্ব।

রাইসু : যৌনতা এই ঈশ্বরত্বকে নষ্ট করে না?

ছফা : যৌনতা দিয়ে মানুষ একটা কাজই করে, বংশবিস্তার করে।

রাইসু : না।

ছফা : না, আমাকে বলতে দাও। মানুষের আরো ফ্যাকাল্টি আছে, সমস্ত ফ্যাকাল্টিগুলি যৌনতার অধীন নয়। ইয়ুং এই জায়গায়ই ডিফার করে ফ্রয়েডের সঙ্গে। মানুষের জীবন হচ্ছে সাইকো সোমাটিক ফোর্স। শারীরিক, মনোদৈহিক একটা ব্যাপার।

আশীষ : ইলেক্ট্রনিক বায়োলজিক্যাল সাইকো ফিজিক্যাল ফোর্স।

ছফা : এবং এরই মধ্যে যেগুলি আছে, যেমন রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, আধ্যাত্মিক এক্সপিরিয়েন্স এগুলি এক ধরনের... যেমন বাউলরা প্রেমভাজা খায়, প্রেমভাজা মানে দুইজনের পায়খানা খায়। ফরহাদ তো এগুলি বলে না। এগুলিকে তারা বলে আধ্যাত্মিক এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু এখন বাস্তব জীবনে যেটা দেখা যায়, ফিজিক্সে যদি যাও, তো বস্তু আর ভাবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব পাবে না। হায়ার ফিজিক্সে। বাউলরা যে জীবন যাপন করে, জীবনযাপনটা তারা একটা ধর্ম মনে করে।

রাইসু : আমার মনে হয় ছফা ভাই, এইখানে বাউলরা হইছে সবচেয়ে বড় এলিট।

ছফা : এলিটিজম হচ্ছে একটা জিনিস, যখন একটা অংশে নিজেদের আইডেনটিটি এসার্ট করতে করতে তারা মনে করে যে দে আর স্টে ফর সামথিং। বাউলদের এই যে সেকল্যুড মানসিকতা, এইটা আমি খুব অপছন্দ করি। দেখ, জৈনরা মনে করে সমস্ত বস্তুসত্তার মধ্যে প্রাণ আছে। এই কাঠটার মধ্যেও প্রাণ আছে। প্রাণের যে ভেরিয়েশন, সেটা হচ্ছে ডিগ্রি এবং স্টেজের। সেজন্য উর্দুতে একটা শের আছে : "সে মুক্তাতেই নেই, সে পাথরেও নেই, সে নানা বর্ণে দীপ্ত।"

রাইসু : এটারই উল্টা করে রবীন্দ্রনাথ বলেতেছেন, তোমারই স্পর্শে পান্না হল সবুজ।

ছফা : রবীন্দ্রনাথ এটা গ্যেটের সেকেন্ড পার্ট থেকে চুরি করেছে।

রাইসু : রবীন্দ্রনাথ তো তাইলে তো অত বড় মাপের কিছু ছিল না।

ছফা : এগজাক্টলি, এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে, তালি দেওয়ার যে ক্ষমতা এটাই মানুষকে বড় করে।

রাইসু : এইটা তো দামি কথা বললেন, ছফা ভাই।

ছফা : দামি কথা তো বলি, কিন্তু কারো মাথায় তো সান্ধায় না। আমরা একটা গিভেন পয়েন্ট অফ টাইমে বাস করছি। আজকে যে মানুষের জীবন, পাঁচ হাজার বছর আগের কোন ইতিহাস নেই। পাঁচ হাজার বছর পরেও কোন ইতিহাস থাকবে না।

রাইসু : কেন, পাঁচ হাজার বছর আগে লেখে নাই কেন?

ছফা : লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা ফিল করেনি। ইতিহাস লেখার সঙ্গে একটা সাবজেক্টিভ আইডিয়া যুক্ত আছে। ইতিহাস কথাটা যখনই উচ্চারণ করবা, তখনই তার সঙ্গে একটা সাবজেক্টিভ আইডিয়া যুক্ত আছে।

রাইসু : কী রকম?

ছফা : আমরা অন্যদের চাইতে আলাদা। আমাদের কথা লিখে রাখা লাগবে। এলিটিজমের মধ্যে মানব জাতিটাই নিমজ্জিত। আমরা যে গ্রেকো রোমান হিস্ট্রি বলি এটা হচ্ছে গ্রিক ইগোর ফল। ইতিহাস তখনই লেখে মানুষ... সে রবি ঠাকুর যখন রবি ঠাকুর হয় তখন তার অটোবায়োগ্রাফি লিখতে গেলে তার তের পুরুষের বর্ণনা দেওয়া লাগে। বুঝেছ? যে লোক রবি ঠাকুর হয়নি সে অটোবায়োগ্রাফিও লেখে না, তের পুরুষকেও টেনে আনে না। এই যে সাবজেক্টিভ, এটা হচ্ছে মানুষের একটা স্পেশাল কোয়ালিটি। আমি এইখানে পাঁচতলার থেকে দাঁড়িয়ে যে আকাশ দেখি, তখন আকাশের চারপাশে যতটা গোল দেখি, নিচের তলায় দাঁড়ালে আর কিনা সে গোলটা আরো সঙ্কুচিত হয়ে আসে। একটা বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি আছে, কারণ হচ্ছে তুমি যত উপরে উঠবে তত বলয়টা বাড়বে। তখন প্রশ্নটা, মানুষের জীবনকে ঘিরে চারপাশে কতগুলো আঁধার কতগুলো আলো থাকে। যেখানে আমি নিজের চোখে দেখি না, ফিল করি না, সেইখানে সিভিলাইজেশন নেই।

রাইসু : সিভিলাইজেশনকে ওইভাবে জরুরি মনে করেন?

ছফা : মনে না করার উপায় নাই, সিভিলাইজেশনের একটা অংশ সায়েন্স।

রাইসু : সায়েন্সরে মূল্যবান মনে করেন?

ছফা : কম মূল্যবান মনে করার মত... সিভিলাইজেশন ইজ হোয়াট উই হ্যাভ, কালচার ইজ হোয়াই উই আর। কালচার সিভিলাইজেশন এইগুলি সবই হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের এক্সটেনশন।

আশীষ : আচ্ছা, যে নারী জেনেটিক্যালি তার সেক্সকে চেঞ্জের চিন্তাভাবনা করছে এবং নারী যখন পুরুষ ভাবছে নিজেকে, সে বিষয়টা নিয়ে আপনার কী মত?

ছফা প্যান্ট পরলেই যাবতীয় প্রবলেম সলভ হয়ে যায় না। অনেক কমপ্লেক্স মহিলা আছে যারা শাড়ি পড়ে, অথবা সফিস্টিকেটেড অথবা অভিজাত। মেয়েদের একটা আলাদা এনটিটি হিসেবে দেখা উচিত। একেকটা স্পিসিজের যৌনতারও নিজস্ব একেকটা প্যাটার্ন আছে। যেমন এই যে কেঁচোদের যৌনতা, সাপের যৌনতা একরকম নয়। কেঁচো তার সেল থেকে জন্ম দিতে পারে। সাপ আবার তার আণ্ডা থেকে জন্ম দেয়। পেঙ্গুইন তার দুধ খাওয়ায় বাচ্চারে। এই যে গাছ, কোন গাছ আছে তার

ডাল থেকে তৈরি করা হয়, কোন গাছ বীজ থেকে তৈরি করা হয়। কোন গাছ শিকড় দিয়ে তৈরি হয়। এখন এই যে সমস্ত প্রাণবান সত্তা এগুলোর একটা গতি আছে। এটা কখনো একটা বড় একটা ছোট নয়। সে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে না সেখানে ঘাস গজায় না। ঘাস না গজালে প্রাণও গজাতে পারে না। যেখানে ঘাস গজায় সেখানে জঙ্গলও গজাতে পারে। জঙ্গল গজালে জন্তু থাকতে পারে। যদি হরিণটাও থাকতে পারে, তখন বাঘটাও থাকতে পারে। বাঘটাঘ থাকলে মানুষটাও থাকতে পারে। এই যে লড়াইটা শুরু হয়ে গেল। এই মানুষের জীবনের যে বৈশিষ্ট্য, তার খাদ্যাভ্যাসই তাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। সে মিনারেল খায়, ঘাস মাটি সৈন্ধব লবণ এগুলো খায়। সে বীজ জাতীয় জিনিস খায়। সে জন্তু জাতীয় জিনিস খায়। এই যে খাদ্যাভাসের ভেরিয়েশনের জন্য তার ইতিহাসের মধ্যে হয়ত মাঝে মাঝে তুমি নিরামিষাশী লোক পাবে, কিন্তু নিরামিষাশী লোক প্রমাণ করবে যে অ্যাকসেপশন প্রুভস দ্য রুল। অর্থাৎ কিছু লোক যেহেতু আমিষ খায় কিছু নিরামিষাশী থাকলে একটা ভারসাম্য রক্ষা হয়। তখন যেই জিনিসটা... মানুষরে শুধু যৌনতা হিসেবে দেখা... আমি জানি না অত বেশি। একটা স্ট্রিক্ট সিচ্যুয়েশনে মানুষ কাপড় পরতে শিখেছে। এবং যখন লোম ছিল তখন কাপড় পড়ার দরকার ছিল না। মানুষের শরীরে ঘন লোম ছিল। মানে যখন আর কি গীতিকবিতা লিখত না, গীতিকবিতা যখন তৈরি হয়নি তখন যুধিষ্ঠিরের দুঃখের মধ্যে সকলে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করত। হিস্টিরিক এক্সপিরিয়েন্সগুলি বাইপাস করে মৌলিক অভিজ্ঞতায় ফেরত যাওয়া যায় না। মানুষ সকলে সমান বয়সের, কিন্তু আসলে মানুষ সমান না। একইভাবে জন্মাইছি, কিন্তু মানুষের ফ্যাকাল্টি এক রকম নয়। এবং প্রতিটা কথার যেভাবে আমরা টটোলজি শিখছি এবং বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত অর্থাৎ এক মায়ের যন্ত্রণার মধ্যে আরেক মাকে ফিল কর এগুলো আমাদের সো কল্ড সাহিত্যিকরা কষ্টকল্পনা করে এ সমস্ত ফিলিংসগুলো সবার মধ্যে চালু করেছে। এবং চালু করেছে বলে আমাদের মধ্যে যখন একটা গর্ব হচ্ছে, তখন উই ফিল ভেরি... আমরা তখন তার প্রতি খুব কোমল হয়ে যাই। আর এইগুলি তৈরি করেছে ভাষা।

আশীষ : আপনি কখনো ন্যাংটা মেলায় গেছেন?

ছফা : ন্যাংটা মেলায় যাইনি আমি, ন্যাংটা থাকি বাড়িতে। ভাইয়ের ছেলেটাকে হোস্টেলে পাঠাইতে চেষ্টা করতেছি অথবা বলছি অন্য কোনো জায়গা দেখতে... রাত্রিবেলা আমি হোস্টেলে থাকার সময়...

আশীষ : ন্যাংটা থাকতেন?

ছফা : একদম।

রাইসু : কেন?

ছফা : আই ইউজড টু ফিল ফ্রি। আমি মনে করতাম যে আমি খুব লিবারেটেড সোল, কাপড়-চোপরের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। লোকজনের সামনে তো পারি না। এমনকি আমি আমার বান্ধবীদেরও একটু ইন্সপায়ার করতে চেষ্টা করেছিলাম, এটা বাঙালি মহিলাদেরই করা অসম্ভব।

রাইসু : ইউরোপিয়ানদের পারছেন?

ছফা : অলমোস্ট।

রাইসু : তারা থাকছে?

ছফা : থাকছে। বাঙালি মহিলারা না, তারা মনে করে যৌন অঙ্গটা তাদের সোনার খনি। ইউরোপিয়ানরা মনে করে যে এটা পার্টঅফ দেয়ার বডি। আর এইখানে যারা লেখে না শরীর-টরির নিয়ে দে আর নট ক্লিয়ার।

রাইসু : ইমদাদুল হক মিলন?

ছফা : ইমদাদুল হক মিলন তো আর পড়ি নাই। আমি তো সব লেখা পড়ি। আমি লেখা পড়ি প্রাণের বিকাশ দেখার জন্য।

রাইসু : কী দেখেন?

ছফা : এরা তো এখনও পাথর যুগেই আছে। মানুষের ভাষা পায়নি আজো। পাথর যুগে মানে ইন এ সেন্স, তারা যে ভাষাটা ব্যবহার করছে এটা প্রিমিটিভ। এখন প্রতিটা ব্যক্তি-মানুষ জীবন্ত মানুষ। প্রতি মুহূর্তে তার যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে...এই যে ধাবমান পরিবর্তনের মাঝখানে মানুষের কনটেক্সটে মানুষের চরিত্র যদি তুমি স্থাপন না কর তখন মানুষ সম্পর্কে তোমার কতগুলো টাইপড ধারণা প্রোজেক্ট ধারণা... এগুলো সাহিত্যের কিতাবের মধ্যে আছে। মেয়েরা ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া ভাত খাইত। সাফার করতে পছন্দ করত। এটা আসল ব্যাপার না, এটা এক ধরনের লিটারেরারি কনসেপ্ট। আসলে মেয়েরা যেটা চায়, তাদের ওপর সুবিচার চায়। বেশির ভাগ পুরুষ মানুষ মেয়েদের সুবিচার করে না। এমনকি যারা নারীবাদী তারাও না। নারীবাদ পুরুষের এগেনস্টে মেয়েদের দাঁড় করাচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে তারা যে রজস্বলা হয়, তারা যে গর্ভ ধারণ করে, এরই মধ্যে যে একটা মহত্ব আছে, এরই মধ্যে যে একটা রহস্য আছে এটা যদি কেউ আবিষ্কার করে... একবার এক বাড়িতে এক মহিলাকে আমি প্রেমের কথা বললাম। আমি শুধু স্টিক করতে থাকলাম, ইফ আই ডু নট লাভ ইউ, হোয়াট শুড আই টক টু ইউ। পরে দেখা গেল, আমি যখন

চলে আসছি বার্লিন থেকে... সেই যে ইউরোপিয়ান মহিলা সে হু হু করে কাঁদছে। অর্থাৎ যেই কনসেপ্টগুলো ছিল আগে মানুষের— প্রেম— আমরা এখন পাই না ব্যক্তিগত জীবনে, এটাকে ক্ষুধা মনে করছি।

রাইসু : আচ্ছা ছফা ভাই, এটা শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই কেন সাফারিংসটা দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে কেন যায় না?

ছফা : আমার তো মনে হয় না।

রাইসু : দেখেন আপনি?

ছফা : অবশ্যই দেখি।

রাসেল : কী রকম ছফা ভাই?

ছফা : একটা মেয়েকে হয়ত দেখেছি খুবই ছোটবেলায়, সে যে আমাকে রিফিউজ করছে এই ব্যথাটা যদি আমি ফিল করি, আমি তো কাঁদি। দুটো প্রবলেম আছে। জার্মানরা চমৎকার একটা কথা বলে। পুরুষ আর মেয়ের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে কাচির মত। কাচির দুটা হোলের মত। ওরা নিজেরা ঝগড়া করবে কিন্তু তৃতীয় জিনিস আসলে এটা হচ্ছে অনধিকার চর্চা।

রাইসু : আপনি কি মাস্টারবেশান করছেন কখনো?

ছফা : অনেকদিন করেছি। মাস্টারবেশান করতে গিয়ে একটা সময় ফিল করলাম, মাস্টারবেশান যদি আমি করি, আমার ভার্জিনিটি আমি নষ্ট করব, অর্থাৎ আমি লেখক হতে পারব না। আমার জীবন খুব কষ্টের ভাঙাচোরা জীবন। মাঝে মাঝে আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি। আমি সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাই। আমি একটা প্রাকৃতিক এনটিটি। কিছুদিন বাদেই আমি নিরস্তিত্ব হয়ে পড়ব। আমার *পুষ্প বৃক্ষ বিহঙ্গ পুরাণের* কনক্লুডিং চ্যাপ্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং। অর্থাৎ আমি তো পাখির জগতে অবস্থান করলে পারতাম। কিন্তু মানুষের জীবনের করুণ রঙ্গভূমি, এখানে থাকা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। কিন্তু পাখিদের গাছদের সঙ্গে আমি এ কারণে নেই যে মানুষের জীবন শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর যে জোড়া—পাখির সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, নক্ষত্রের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে এ জীবনের যে বিস্তার, যাকে বলে অধিকারবোধ— এটা আমি পাখিদের সঙ্গে না মিশলে জানতাম না। যেমন ধর গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তুমি চলছ—চলার মধ্যে দিয়ে যে চলছে না তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। উপনিষদ-এ চমৎকার একটা কথা আছে : ঈশ্বরের যে কনসেপ্ট, হয়ত নাই। কিন্তু এই যে আকাশের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বৃক্ষের মত কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছেন, এইটা হয়ত সত্যি নয়, এইটা হয়ত নাস্তিকেরা বলবে যে সত্যি নয়—কিন্তু আমার তো নাস্তিকতা দিয়ে চলে না। আমার নাস্তিকতা কোন কাজে আইয়ে না।

আমি ছোটবেলা থেকে একটা আস্তিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়েছি। এবং স্নেহের মধ্যে বড় হয়েছি। স্নেহটার যেখানে অ্যাবসেন্স...। আমারে যেটা টানে সেটা হল গিয়ে মানুষের বর্তমান যে অস্তিত্ব, এরই মধ্যে ঈশ্বর আছে, এরই মধ্যে স্বর্গ আছে, এরই মধ্যে নরক আছে এটা ফিল করার ক্ষমতা...। আর আমি তো কামেল লোক নই। কামেল লোক হইলে অত কথা কইতাম কেন? আমি জঙ্গলে থাকতাম, বনের বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ এরা আমার সাগরেদ হইয়া যাইত। এই কামালিয়াত নাই বইলাই তোমাগো লগে কতা কইতে... ডায়লগ করতে চাই।

আশীষ : কিন্তু আপনার পৃথিবীতে তো তারা আপনার সাথেই আছে।

ছফা : আপনারা কি নেই? সেটা তো, আপনারা তো বাইরে নন। গানের মধ্যে বিশ রকম কোয়ালিটি আছে। রক্তগুণ, মাংসগুণ, এইডা গুণ, ওইডা গুণ—সংস্কৃতে কত নাম যে দিছে! তখন প্রশ্নটা, এই যে ইতিহাসের যুগে তার আগে পঞ্চাশ হাজার বছর মানুষ সুপ্ত ছিল। মানুষের অবস্থা সুপ্ত ছিল, অন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল। আস্তে আস্তে সে যখন বিশিষ্ট হয়ে উঠছে তার মধ্যে একটা বিশিষ্ট... রকম চিন্তা জাগছে। সে একটা পর্যায়ে এসে আল্লা আবিষ্কার কইরা ফেলাইছে। একটা পর্যায়ে এসে তাদের মধ্যে পয়গম্বর বানিয়ে ফেলেছে। এখন যখন মানুষকে আপনি টোটালি দেখবেন, এই অভিজ্ঞতাগুলিকে আপনি মূল্য দেবেন। সঙ্গীতটাই নেন না কেন? সে 'সা' শব্দ আনছে গাধার আওয়াজ থেকে, 'মা' শব্দ হচ্ছে ছাগল। সঙ্গীতটা যখন হয় তখন এইটা ছাগলও হয় না, গাধাও হয় না, কাকও হয় না, কোকিলও হয় না। তখন এর একটা নিজস্ব এনটিটি হয়ে যায়। এবং যে জিনিসগুলি মানুষের ভেতরে আছে, মানুষের ভেতরে আছে সে আগুন যাকে বলা যায় প্রমিথিয়ান ফায়ার, সে সব সময় তার অতীতকে অস্বীকার করে। এবং অতীতের যা কিছু কোয়ালিটি সেটা সে লেখ্য বর্ণমালার মাধ্যমে সামনে প্রবাহিত করে দেয়। সো, মানুষ তো শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। মানুষ তো ক্রমাগত চলছে। তার অভিজ্ঞতাগুলো চলছে। তার গবেষণাগুলো চলছে। আমেরিকা আর ফ্রান্স এইডস-এর ঔষধ কে আগে আবিষ্কার করবে তার প্রতিযোগিতা তারা করলো। মানুষ হয়ত ঈশ্বর-ঘেরা রইছে। এই যে গান আছে : 'চিনতে পার নাকি রে মন বুঝতে পার নাকি/খাঁচার পিঞ্জিরায় থাকে অচেনা এক পাখি' এই যে মানুষ, তার ক্লান্ত প্রাণ বুকের তলায়, চব্বিশ ঘণ্টা দুঃখে দুঃখে থাকে, কোথায় কালকে পয়সা পাবে, কোথায় কালকে খাবারটা হবে... তখন এই যে মানুষ, এই ভাঙাচোরা মানুষ তার জ্ঞানের জন্যে কোথায় যাবে, সমুদ্র লংঘন করে, গিরি লংঘন করে, পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে মানুষ তার কাছে ছুটে যায়। মানুষ কে... মানুষ ঈশ্বর-ঘেরা.. আমি বোঝাতে পারব না।

আশীষ : যা দেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে যে তাহলে এ চিরায়তের সংজ্ঞা কী হবে?

ছফা : চিরায়তের কোন সংজ্ঞাই নেই।

আশীষ : তাহলে কী হবে, সেটা কী?

ছফা : প্রকৃতি হচ্ছে গাছকে যদি ধরেন, গাছের যে ডাল, এটা কিন্তু গাছের বোঝা বওয়ার জন্য, গাছের প্রাণকে হেফ করে না। গাছের প্রাণকে হেফ করে বাকল। তখন এই অবস্থাটা হচ্ছে এই জায়গায়... আমার ঘুম পেয়ে গেছে... এই অবস্থায় গাছের যে ডালটা এইটা কিন্তু ওজন বইবার জন্য।

রাসেল : অনেক গাছ যে বাকলটা ছেড়ে দেয়?

ছফা : আলাদা গাছ। তখন যেটা, গাছের বাকলটা হল গাছের প্রাণশক্তির উৎস। কাণ্ডটা না। তখন সিভিলাইজেশন বলে যে বস্তুটা বুঝি, মানুষের ইনস্টিটিউশনাল উদ্যোগ ধরে ধরে সিভিলাইজেশন তৈরি হয়। যেমন এই যে কোরাল, প্রবাল দ্বীপের সিভিলাইজেশন এইটা মরা সিভিলাইজেশন। তখন মানুষের যে বিহেভিয়ার, এক্সপ্রেশন— কোন কনটেক্সটে কোথায় এক্সপ্রেস করবে এটা তার অরগ্যান, অরগানোগ্রাম ঠিক করে দেয়। আনফরচুনেটলি আমাদের তরুণ ছেলেরা যেটা বুঝতে চাইছেন না, একটা কাজের জন্যে একটা সাধনা দরকার। একটা অন্যরকম... পুরাপুরি না হলেও এক ধরনের আইসোলেশন দরকার।

আশীষ : আইসোলেশন ফ্রম?

ছফা : ফ্রম দি ক্রাউড।

রাইসু : আচ্ছা ছফা ভাই, একটা কথা জিগোস করি, আপনি এখনো জীবন ধারণ করে আছেন কেন, আত্মহত্যা করেন নাই কেন?

ছফা : আত্মহত্যা করার আমার ইনস্টিংক্ট ছিল খুব প্রবল। আমার মারে কীভাবে কাঁদাব, বাপরে কীভাবে কাঁদাব... আমি যদি মারা যাই ওরা কীভাবে কাঁদবে খুব দেখার ইচ্ছা আর কি। এই উপলব্ধিটা তো অনেক পরের। আমি ক্রমাগত জ্বর দেখাতাম, ট্রেনের গোড়ায় গোড়ায় বসে থাকতাম। টাকার জন্য, পয়সার জন্য।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন :

[illegible] ঢাকা, ১৯৯৬ — *আশীষ খন্দকার, ব্রাত্য রাইসু, শাহরীয়ার রাসেল*

কবিতা

রক্তের স্মারকলিপি

অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আজ
মহ একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার কোরকে
ফুটে উঠুক।
মাটির রসে বেড়ে ওঠা দীর্ঘ সবল
তাল-তমাল-শাল-জারুলের পত্রপল্লবে
উতলা বাতাসের শ্বাসে যে ধ্বনি বেজে ওঠে
দোয়েল কোকিলের কণ্ঠে যা সুমধুর গান,
তা নিরবধি কাল থেকে অগুণতি মানুষের
মর্মফলকে
রক্তময় ধারায়
বয়ে গেছে অন্তরের কন্দরে বন্দরে
পয়মন্ত দুগ্ধধারায় মুখে মুখে
পিতৃপুরুষের ভাষা হয়ে।

মুখের ভাষা দীর্ঘ-দিনের বাঁচার,
মুখের ভাষা অগুনতি মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতীক
মাটিতে অমরাবতী রচনার স্মারক অঙ্গুরীয়
যখন কেড়ে নিতে চাইল
যখন চোখের সামনে মেলে ধরল কবরের বিবর্ণ কাফন
যখন উজ্জ্বল দিনের বদলে নিশুতিকে রেখে বলল
তোমরা এরি বোরকায় ঢাকো
আশা, ভাষা, বীর্য, ব্যঞ্জনা সব
আর নিজেরাও থাক নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে শুয়ে?
তখন জবাবে কামানের মত
গর্জন করে উঠল জনতা না, না
শুধু অন্ধকারকে সাথী করে বাঁচব না
আমরা,

আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম ভালবাসার বীজও
মাটিতে বপন করে অঙ্কুরিত করে তুলব।

নদ-নদী, হাট-ঘাট, নগর-বন্দর জোয়ারের উচ্ছ্বাসে
ভেঙ্গে পড়ল—
তখনই এল পুলিশ, শাসকের প্রজ্জ্বলিত
হিংসার কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ, বুলেটের আকারে
কয়েকখানি আশাভরা বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল।
গড়িয়ে পড়ল ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত।
সেদিনেই লিখা হল স্মারকলিপি
রক্তের আখরে
সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারি।

কিন্তু মিছিল তো থামল না
এগিয়ে গেল ধাপে ধাপে মরণের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে
প্রগতির পথে রক্তস্রোতে মৃত্যুস্রোতে
স্বর্ণচঞ্চু ঈগলের দুঃসাহসী ডানা মেলে
জীবনের জ্বালা পথে
সংগ্রামী চেতনা বয়ে
দুর্জয় প্রত্যয়ে।

সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫

বেতারে খবর ঝরে

বেতারে খবর ঝরে,
তাজা খুন; কাঁচা প্রাণ ঝরে
ভিয়েৎনামে; পথে পথে
নগরে-বন্দরে, বনে-বনান্তরে
রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে
তপ্ত রক্ত ঝরে।

জিঘাংসার জটামুক্ত সাগ্নিক নিঃশ্বাসে মূর্ত
মমচেরা কামনার বেশুমার নিহত মুহূর্ত;
অকস্মাৎ আগ্নেয় ঝলকে
দুর্মর চেতনারশ্মি দুর্জয় প্রত্যয়ে ফুঁসে
তুলি লক্ষ গোখরার ফণা
দুরন্ত মাভৈঃ সুরে সবল দরাজ কণ্ঠে উদাত্ত ঘোষণা
মার্কিনির বর্বরতা ক্ষমা করিব না।
জন্মে জন্মে যুগে যুগে ক্ষমা করিব না
কোটি কণ্ঠে নৃশংস ঘোষণা।
আত্মারে গচ্ছিত রেখে পাপের হারমে
জোব্বা পরা লম্পটেরা;
নারীর সতীত্ব লুটে বীরত্বের দর্প করে যারা
যারা দুর্নিবার লোভে সত্যসন্ধ মানুষের বেচাকেনা করে,
যাদের পাশব শৌর্যে মানবতা মাথাকুটে মরে,
যাদের নাপাং বোমা ফুলের ফাগুনভরা
সবুজপোয়াতী ক্ষেতে আগুন লাগায়,
যাদের জীবাণু অস্ত্রে শিশুরা মাছের মত ধুঁকে ধুঁকে মরে,
যাদের রকেট ঘাঁটি ঘুমন্ত চোখের কোণে
বিভীষিকা আনে,

যাদের হিংসার শরে নিগারেরা নিত্য বিদ্ধ হয়,
যাদের বেনিয়াবুদ্ধি পৃথিবীর উর্বরতা ক্ষুণ্ন করে,
যারা রাখে সংখ্যাতীত জারজের রক্ত মাংসে
কলুষিত কামনার বীজ;

—সেই ঘৃণ্য দানবের নগ্ন বর্বরতা
ভিয়েতনাম সইবে না, সইবে না দুনিয়ার সংগ্রামী সেনানী।
আফ্রো'শিয়ার গহীন গহণবন, ফেনিল সমুদ্রতীরে।
মরুভূর বুক কুঁড়ে অযুত নিযুত কণ্ঠ
বাতাসের হৃদপিণ্ড চিরে চিরে কয়,
—আদিম বর্বর তেজ বলদৃপ্ত অহিংস হৃদয়
হিংসায় হিংসায় আজ নব পরিচয়।
তাই ধমনীর শেষ লালে, লিখে যাব
সংগ্রামের রক্তাক্ত আখর।

সংবাদ, ৪ জুলাই, ১৯৬৫

An elegy for a cow

I mourn for the cow. For she is killed in the university campus. I pondered much over the issue, whether this poor helpless creature could be honoured as martyr. I am yet to reach any conclusion and remained hesitatant till the last. well, it is no denying of the fact that the word martyr contains some poignant element, which pierces the very core of the heart. Of late, the word's cutting edge is dulled by the misuse and overuse. And the word 'shaheed' lost much of its pristine purity. The departed cow is really unfortunate, the term martyr could not be attached to it.

One can guess easily about the open crime committed by the cow. If she was responsible for any secret crime, well I have had no knowledge about that. The cow intruded into the knowledge manufacturing factiory, it is clear. On the other hand if one intends to stand for the cow, there could be many relevant arguments in favour of the cow. It could be argued, both the parents of the cow are Australian citizens and the girl child was brought to Bangladesh. So it is quite likely that she had no prior idea about the do's and donot's of Bangladesh. If she committed any crime at all, that was done out of ignorance. However, the crime of ignorance is also crime and liable for punishment. But the fact is, before the case is properly argued, the judgement was passed, and executed, the poor cow had to leave its ghost. Now it is pointless whether the cow was fully or partially guilty. Hardly any chance left for verification. The cow killed, will not come to life again. A fresh trial could be started for the case, which has already been tried. I should not pray for the peace of the soul of the cow. Sacred sciptures do not show any indication that a cow can posses a soul.

Still, there left some scope for consideration. What emboldened the cow to take her stand in between the two groups of feuding armed cadres? Who were the elements inspired the cow to make such a fatal step? Was it the personal decision of the cow? what prompted her to run towards the execution ground? Was it her death wish? Did she feel concerned about the unborn calf of the womb? Or personal security got top priority in her mind? Who knows? Might be that she was carrying some message from the international cow society to the leaders of the feuding armed cadres. Nothing could be known. What exactly prompted her to run headlong in the midst of two feuding armed groups? The reporters did not misss this delicious news item. But what they printed is the outer shell of the real event. News papers showing tendency to support different political parties, printed the coloured photograph of the killed cow, swelled up belly with unborn child in their front page.

I mourn for the dead cow. And I feel it became important for all to moun for dead cow, beheaded goat, pest ridden fowl, caracas of stray dog or runaway cat. Even if it is the trampled rat of the poet Jivananda Das, also it would serve the purpose. Whatever wisdom human being might have amassed in the meantime and whatever may be the splendour of his technological superiority, to my mind it is sheer waste of breath to mourn for human being. Even with passionate slogans, when the cadres of the contending political parties claim, dead persons of their own party only have the right to be honoured with the title martyr. I shall never have the slightlest consideration for any such bogus claim. Who is real martyr? Who is fake? Hardly one can distinguish. The sad granndeur of the word martyr no longer stirrs my soul. To my estimation, a martyr is also a dead person. It this small country of ours, if we continue ot make rooms for dead, where the living persons will go?

The word mourning contains some element of natural truth. Sanskrit sloka had its origin in the death pang of a copulating crane. The word mourning is quite akin to the sloka. The pathos of

the mourning is the very soul of literature and music. In swift streaming the flow of life in the veins of nature, mourning plays a vital role. Any event, whatever insignificant it may be, when gets the touch of mourning acquires a new dimension. At some particular point of time and space the word mourning gets congealed and hardened like a solid black diamond.

The irony is, human being is no longer in a position to own and carry this most precious jewel. But the truth is, if the concept of mourning is not kept following over the generation like the black thread, art and literature will cease to exsist. There shall not be any charm left for poetry, no pathos in music. It became imperative for those, who claims that they are the conscience keeper, that they have to keep alive the concept of mourning. This is only possible by mourning for dead cows, beheaded goats, caracas of stray dogs or cats trampled rats and the uprooted plants.

Death is more important than mourning. For death creates space for life. Death cleanse the foul portion of the created beings. Death purifies life. To keep the idea of death brith by polishing constantly, is important for all. In the silent grandeur of death we get hint of the ultimate distiny of life. Human being is so foul, so useless, so fragile, so pretentious no longer he is capable to carry the burden of these two concepts mourning and death.

This is the reasons, I am mouring for the cow killed in the University campus and its unborn calf.*

---

* এটি আহমদ ছফার 'গাভীর জন্য শোক প্রস্তাব' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। কবিতাটি 'লেনিন ঘুমাবে এবার' কাব্যগ্রন্থের একটি।—নূ. আ.

